সূচীপত্র

কুরআন ও সুন্নাহর পতাকা তলে
ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন আমাদের নিরন্তর প্রয়াস

১১তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৫

স্মরনিকা

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ
جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

info.shubbanbd@gmail.com
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
www.shubbanbd.org

২০০৭ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্ন হজ ও ওমরা সেবায়
বিশ্বস্ত একটি নাম,আমরা আছি আপনার পাশে
২০২৬ সালের
হজ্জ
বুকিং চলছে
সহী সুন্নাহ পদ্ধতিতে হজ্বের সফরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।
সহী সুন্নাহভিত্তিক পূর্ণ হজ্জ কার্যক্রম পরিচালনা।
হজ্জ ফ্লাইট চালুর প্রথম ২/৩ দিনের মধ্যেই ফ্লাইট প্রদানের নিশ্চয়তা।
হজ্জ সফরে একাধিক অভিজ্ঞ আলেমের সরাসরি তত্ত্বাবধানে মাসআলা প্রদান।
সালামত হজ্জ ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস
সরকার অনুমোদিত হজ্জ ওমরা ও ট্রাভেলস এজেন্ট
হজ্জ লাইসেন্স নং: ১১৫৫
সত্বাধিকারী: মোঃ আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী
ATAB
যেকোন প্রয়োজনে কল করুন
01713 495348
অফিস: সুইট ৩০৫/বি, ৪৮ এবি, পুরানা পল্টন
বাইতুল খায়ের (৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০

সূচীপত্র ১

কুরআন ও সুন্নাহর পতাকা তলে
ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন আমাদের নিরন্তর প্রয়াস

১১তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৫

স্মরনিকা

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

JAMIYAT SUBBANE AHL-AL HADITH BANGLADESH

স্মারনিকা

১১তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৫

উপদেষ্টা:
মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছ

সম্পাদক:
তানযীল আহমাদ

সম্পাদনা সহকারী:
রায়হান উদ্দীন মাদানী
মোঃ আব্দুল্লাহীল হাদী
মোঃ আব্দুল মতিন
ইমাম হাসান মাদানী

অর্থ ব্যবস্থাপনা:
হাফেয আশিক বিন আশরাফ
হাফেয মাহদী হাসান মাদানী

প্রকাশনায়:
প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

প্রকাশকাল:
৭ সফর, ১৪৪৭ হিজরি
২ আগস্ট, ২০২৫
১৮ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

অঙ্গসজ্জা:
মো: আনোয়ার হোসাইন (শুব্বান কার্যালয়)

মুদ্রণ:
পিক্সেল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টার্স
৫১/৫১/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা

সূচিপত্র

সূচিপত্র

- বাণী ৪
- সম্পাদকীয় ৮
- দারসুল কুরআন ৯
- দারসুল হাদীস ১৬
- প্রবন্ধ ▸
  - শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছের রাজনৈতিক জীবনের একটি অধ্যায় ২৫
    আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী রহ.
  - জাগো, হে নয়া জামানার শার্দূল! ৩২
    অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম
  - দেশ জাতি গঠনে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর করণীয় ৩৫
    ড. আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকি
  - The power of youth: A few words ৩৮
    Dr. Md Osman Ghani
  - দ্বীন কায়েমের সংস্কৃতি: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ৪২
    ইহতিশামুল আলম মারুফ
  - দাঈর মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা ৪৫
    তানযীল আহমাদ
  - পথভ্রষ্ট সুন্নাহ অস্বীকারকারীদের ইতিহাস ও আল-কুরআনের দর্পণে সুন্নাহর প্রামাণিকতা ৫৪
    শাইখ রায়হান উদ্দীন মাদানী
  - বিশ্বনেতাদের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতি পত্র : কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ৬৪
    ড. মো. হাবিবুল্লাহ
  - التوحيد أولا তাওহীদ দিয়েই শুরু ৭৩
    শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী
  - দক্ষ নেতৃত্ব, প্রশিক্ষিত কর্মী ও সুসংগঠিত কাঠামো : শুব্বানের উত্তরণের পথ ৮০
    মোঃ রেজাউল ইসলাম
  - মব সন্ত্রাস: ইসলামের দৃষ্টিতে এর কারণ ও প্রতিকার ৮৩
    প্রফেসর ড. মো. লোকমান হোসেন
  - তথ্যপ্রযুক্তির যুগে দাওয়াহ: তরুণদের সম্ভাবনা ও ঝুঁকি ৮৭
    মুস্তাফিজুর রহমান
  - বনু ইসরাঈল ও জায়নবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৯৩
    হাসিবুল আলম
  - সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর রাষ্ট্র দর্শন ও বিশ্লেষণ ১০২
    আহমাদ বিন আব্দুস সালাম
  - আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় : জ্ঞানের প্রাচীনতম বাতিঘর ১১০
    আব্দুল্লাহ মাহমুদ আযহারী
- জেলা দায়িত্বশীলদের নাম ও তথ্য ১১৪
- মজলিসে আমের ১০ম সেশনের বিদায়ী তালিকা (২০২৩-২০২৫) ১১৬
- সাংগঠনিক প্রতিবেদন ১১৭
- প্রস্তাবনা ১২৬

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতির বাণী

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ومنه تتنزل الخيرات والبركات والصلاة والسلام على نبينا محمد البالغ بفضله تعالى منتهى الدرجات أما بعد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহ ও কৃপায় আমরা উপস্থিত হয়েছি জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর সেই মহতি কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কনফারেন্সে, যেখানে তাওহীদের দীপ্ত আলোয় উদ্ভাসিত একঝাঁক তরুণ তাদের ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে নবুওয়তের উত্তরাধিকার রক্ষায় নিজেদের আত্মনিবেদন করছে নিরবে-নিভৃতে, নিষ্ঠায় ও বিশ্বস্ততায়।

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর দ্বিবার্ষিক এই কেন্দ্রীয় সম্মেলন যেন এক আত্মশুদ্ধির উৎসব, একটি নেতৃত্ব নির্মাণের শৈল্পিক কর্মশালা এবং ঈমানি চেতনায় ঝলমল এক দ্বীনি সমাবেশ। শুব্বানের প্রতিটি কর্মীর প্রাণে যে জাগরণ, হৃদয়ে যে নিষ্ঠা এবং আচরণে যে ঐকান্তিকতা আমরা দেখতে পাচ্ছি-তা নিঃসন্দেহে আমাদের সমাজে এক আশার দীপ জ্বেলে দেয়।

এই সম্মেলন ঘিরে কর্মীদের মাঝে যে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে, তা কেবল কর্মপরিকল্পনার নয়-বরং এটি নৈতিক চরিত্র, দায়িত্ববোধ ও আখিরাত-সচেতন নেতৃত্বের ভিত্তি গড়ে তোলার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যেখানে নেই কোনো কৃত্রিমতা; আছে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও উম্মাহর কল্যাণে নিবেদিত অঙ্গীকার।
নেতৃত্ব নির্বাচনের যে প্রক্রিয়া শুব্বান ধারণ করেছে, তা আমাদের সময়ের জন্য এক নিখুঁত পথনির্দেশ। এখানে চারটি কাঠামোবদ্ধ ধাপ পেরিয়ে একজন কর্মী নিজেকে 'সালেহ' হিসেবে প্রমাণ করে, দায়িত্বের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। এই পথচলায় একজন কর্মী শুধু সিলেবাস শেষ করে না, বরং দাওয়াহর প্রতি নিজের মেধা, মনন ও মনোভাবকে গড়ে তোলে এক নিরেট ভিত্তির ওপর।

এই সম্মেলন উপলক্ষে শুব্বানের সৃজনশীল তরুণদের হাত দিয়ে যে স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে, তা নিছক একটি প্রকাশনা নয়-এটি ইতিহাসের স্বাক্ষর, কালের গর্ভে লেখা এক দীপ্ত অধ্যায়। এখানে উঠে এসেছে বিগত দিনের অর্জন, ভবিষ্যতের স্বপ্ন এবং তাওহীদ-সুন্নাহর প্রতি নিষ্ঠার অনন্য দলিল। আমি বিশ্বাস করি, এই স্মরণিকা নবীনদের প্রেরণা দেবে, সাহস জোগাবে, নেতৃত্বের অনুপ্রেরণা ছড়িয়ে দেবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, ইনশা-আল্লাহ। মহান আল্লাহর নিকট দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাশা করি ও দোয়া করি যেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর আগামী নেতৃত্ব এখান হতেই তৈরি হয়।

আমার হৃদয়ের গভীরতা থেকে তাদের জন্য রইল ভালোবাসা, শুভকামনা ও আন্তরিক দু'আ। মহান আল্লাহ যেন এই সম্মেলন ও নবনির্বাচিত নেতৃত্বকে কবুল করেন, এবং দ্বীনের পথে চলতে সকলকে তাওফীক দান করেন-আমীন।

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
সভাপতি
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

মাননীয় উদ্বোধকের বাণী

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'য়ালার। শান্তির ধারা বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারসহ সকল সাহাবায়ে কেরামের উপর।

শুব্বান তথা তরুণ ও যুবকরাই দেশের সম্পদ, জাতির কর্ণধার, আমাদের শক্তির অন্যতম উৎস। তারাই তো গত ৫ আগস্ট দেখিয়ে দিল তারুণ্যের শক্তির ক্ষমতা। তারা সঠিক পথে পরিচালিত হলে দেশও সঠিক পথে পরিচালিত হয়। তাদের পদস্খলন হলে দেশ ও জাতিরও পদস্খলন ঘটে। আর এ তরুণ শক্তিকে সঠিক দিকনির্দেশনায় পরিচালনা করতে, তাদের মাঝে বিশুদ্ধ ইসলামের বীজ বপন করতে আমার প্রিয় সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রত্যেক নেতৃত্বের নির্দিষ্ট সময়ে পালাবদল ঘটে। নতুন নেতৃত্ব আসে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের গতিকে আরো তরান্বিত করতে। এমনই এক উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে আজ শুব্বানের একাদশ কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমি আগত নতুন কমিটিকে জানাই আন্তরিক ও প্রাণঢালা অভিনন্দন। আশা করব, সামনের দিনে সকল বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে তাওহীদ ও সুন্নাহর দীপ্ত মশাল নিয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে যাবে নির্ভিকচিত্তে। দেশের ছাত্র ও যুব সমাজের মাঝে ইসলামের সুমহান আদর্শ ছড়িয়ে দিতে তোমাদের পথচলা হোক সুগম ও মসৃণ। আমি একাদশ কেন্দ্রীয় সম্মেলনের সফলতা কামনা করছি।

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, এ সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি মূল্যবান স্মরণিকা প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। এ স্মরণিকাটি প্রকাশে যারা সময়, চেষ্টা ও শ্রম দিয়েছেন তাদের প্রয়াস সফল ও সার্থক হোক এবং মহান আল্লাহ তাদের এই খেদমত করুন- আমীন।

আলহাজ্জ এম. এ. সবুর
উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ও চেয়ারম্যান, মাসকো গ্রুপ।

জমঈয়ত সেক্রেটারি জেনারেলের বাণী

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর একমাত্র অঙ্গ সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ। আগামী ২রা আগস্ট ২০২৫ তারিখে হতে যাচ্ছে শুব্বানের ১১তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে নানা কর্মসূচী। তন্মধ্যে অন্যতম হলো স্মরণিকা প্রকাশ। এ স্মরণিকা স্মরণ করে দেবে শুব্বান কারা, কী লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং কী কর্মসূচী?

নতুন প্রজন্ম ধাবিত হচ্ছে নাস্তিকতা, দ্বীনহীনতা এমনকি আদর্শহীন চেতনার প্রতি। শিক্ষার নামে অপসংস্কৃতি, আধুনিকতার নামে অসভ্যতাই এখন যুবসমাজের বাসনা। এযুবসমাজকে আদর্শ, সফল, সার্থক ও দেশের ভবিষ্যৎ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজন একটি সুন্দর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আলোকিত কর্মসূচী। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি জমঈয়ত শুব্বানই দিতে পারে সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ‘কালেমা তাইয়্যেবা’ কে যথাযথ উপলব্ধি করত: জীবনের সর্বস্তরে কুরআন ও সুন্নাহর বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আক্বিদাহ-সংশোধন, আহ্বান ও প্রচার, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, সমাজ সংস্কার-কর্মসূচী নতুন প্রজন্ম বিশেষভাবে যুবসমাজকে করতে পারে সুপ্রতিষ্ঠিত, পৌঁছাতে পারে কাঙ্খিত লক্ষ্যে এবং দেশের উন্নত ভবিষ্যতে। সফল হবে উভয় জগতে। লাভ করবে-

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

হে যুবক, মনে রাখতে হবে আব্রাহাম লিংকন নয়, তোমরা ইবনু ওমার, ইবনু আব্বাস ও হাসান-হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এর উত্তরসূরী। আজ তোমরা শুব্বান, আগামীতে তোমরাই জমঈয়ত। আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফি আল কোরাইশী রহ. ও আল্লামা প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল বারী রহ.-এর রেখে যাওয়া সালাফী দাওয়াতের আমানত রক্ষায় তোমাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। হোক এ সম্মেলনে সেই প্রতিজ্ঞা। এ আহ্বান রেখে ১১তম সম্মেলনের সফলতা ও শুব্বানের উজ্জল ভবিষ্যৎ কামনা করে মহান রবের তাওফীক চেয়ে শেষ করছি।

কল্যাণ কামনায়-

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
সেক্রেটারি জেনারেল
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

শুব্বান সভাপতির বাণী

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، اما بعد؛

তাওহীদী ছাত্র ও যুবকাফেলা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর ১১তম কেন্দ্রীয় সম্মেলনের এই শুভক্ষণে আমি মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা পেশ করছি। এই সম্মেলনকে ঘিরে দেশব্যাপী শুব্বান কর্মীদের মাঝে যে তৎপরতা ও আনন্দঘন পরিবেশ আমরা লক্ষ্য করছি তা অনন্য ও অনুসরণীয়। এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখলে শুব্বান অনেকটা পথ এগিয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ। আপনারা অবগত আছেন, গঠনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আগামী সেশনের জন্য নেতৃত্ব নির্বাচনে শুব্বানের সর্বোচ্চ পরিষদ মজলিসে আম-এর সদস্যগণ নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি, যারা ১১তম মজলিসে কারারের দায়িত্বশীল হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন নিঃসন্দেহে তারা নেতৃত্বের প্রতি নির্মোহ; তবে সাংগঠনিকভাবে যোগ্য ও দক্ষ। তারা সবাই নিবেদিত, নিষ্ঠাবান।

اللَّهُمَّ اجعل أعمالنا خالصةً لوجهك الكريم ووفّقنا لما تحبّ وترضى.

প্রিয় কাফেলার অতন্দ্র প্রহরী দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ, আপনারা জানেন যে, নেতৃত্ব একটি আমানত। আর এই আমানত রক্ষা করা ঈমানী দায়িত্ব। আমি মনে করি, শুব্বানের প্রত্যেক কর্মী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় শুব্বানের এ দাওয়াতী কাজকে ইবাদত মনে করুন। এর মাধ্যমে পরকালীন মুক্তির জন্য কাজ করুন। এমন কাজ করবো না যাতে আখিরাতে আমাদের জবাবদিহিতার মুখোমুখী হতে হয়। নিজের কাজটি যথাযথভাবে করুন। নিজ থেকেই করুন। কেউ আপনাকে স্মরণ না করালেও করুন। কারো অপেক্ষায় থাকবেন না।

কেন্দ্রীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে এবারও শুব্বানের মেধাবী তরুণ নেতৃত্বের সৃষ্টিশীল প্রয়াসে জ্ঞান-অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে। একটি স্মরণিকা সংগঠনের মুখচ্ছবি। আমি বিশ্বাস করি, কর্মীরা এর প্রতিটি পাতা থেকে উপকৃত হবেন ইন শা আল্লাহ।

আসুন, আমরা সম্মিলিত প্রয়াসে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক বিশুদ্ধ আকীদাহ ও মানহাজে জীবন গড়ি এবং ছাত্র ও যুবসমাজকে বিভ্রান্তির অমানিশা থেকে হিদায়েতের আলোয় ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে সম্পৃক্ত হই।

পরিশেষে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য ও প্রত্যেকের কর্মের উত্তম বিনিময়ের জন্য দু'আ করি।

اللَّهُمَّ بارك هذا المؤتمر، واجعله خطوةً مباركة في سبيل إعلاء كلمتك، وانفع به شباب الأمة، ووفّقنا جميعاً لما تحبّ وترضى.

اللَّهُمَّ اجعل هذا الجمع جمعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا تجعل فينا ولا منا شقياً ولا محروماً.

মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
সভাপতি
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

সম্পাদকীয়

তানযীল আহমাদ
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

তাওহীদী কাফেলা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর ১১তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে পেরে রব্বে কারীমের পাক বারগাহে সকল প্রশংসা নিবেদন করছি-আলহামদুলিল্লাহ। অজস্র সালাত ও সালামের ফল্গুধারা অবারিতভাবে বর্ষিত হোক মানবমুক্তির কান্ডারী, জাহেলিয়াতের বুনিয়াদ বিনষ্টকারী মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। স্মরণিকা একটি সংগঠনের মুখচ্ছবি। এর মাধ্যমে সংগঠন তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কর্মসূচি সম্পর্কে সাধারণভাবে সবাইকে এবং বিশেষভাবে কর্মী ও দায়িত্বশীলদেরকে অবহিত করে, স্মরণ করিয়ে দেয়। কর্মী ও দায়িত্বশীলদেরকে সচেতন করা, তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে জ্ঞানের পরিধিকে সমৃদ্ধ করা, সংগঠনের বিগত সেশনের প্রতিবেদন জানিয়ে দেয়া স্মরণিকার বিশেষ উদ্দেশ্যে। আলহামদুলিল্লাহ-এবারের স্মরণিকায় সেসব বিষয় স্থান পেয়েছে, সেইসাথে কয়েকজন ঋদ্ধ গবেষক ও নবীন লেখককের সেতুবন্ধনে এবারের স্মরণিকা হয়েছে সমৃদ্ধ।

স্মরণিকা প্রকাশের উপলক্ষ্য হলো জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর ১১তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন। দেশের পরিবর্তিত পট পরিবর্তনের এই যুগ সন্ধিক্ষণে নতুন কমিটির দায়িত্বশীল ভূমিকা আরো বেড়ে গেল। তারুণ্যের যে দুর্দমনীয় সাহস, যে স্বপ্নে তারুণ্য বিভোর, এই দ্বীন, এই যমিনের যে চিত্র আমরা আঁকি, সেজন্য আমাদের সকল সাহস, শক্তি, জ্ঞান ও বুদ্ধি একত্রিত করে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কারণ একদিকে যেমন প্রচলিত রাজনীতির নামে ক্ষমতা দখলের অসাধু লড়াই, অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা, বিশেষ করে ইসলাম বিরোধী অপশক্তির অপতৎপরতা বেড়েই চলেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী পেড়িয়ে গেলেও ইসলামপন্থীদের যে অবমূল্যায়ন ও বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে তার মূল কারণ হলো আমাদের এই ভূখণ্ড যে মৌলিক আদর্শের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে অর্জিত হয়েছে তা কোনো সরকার গুরুত্ব দেয়নি, শিক্ষা সিলেবাসেও তা স্থান পায়নি, বরং সুকৌশলে সেই রক্তাক্ত ইতিহাস ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি জুলাই সনদেও তা স্থান পায়নি। অর্থাৎ ইসলামপন্থীদের আশা আকাঙ্ক্ষা অধরাই থেকে যাচ্ছে। এই বাস্তবতায় আমাদের নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। যদিও জুলাই বিপ্লবের মূল নায়ক ছিলেন দেশপ্রেমিক ও ইসলামী মূল্যবোধের অধিকারী মুসলিম ছাত্র জনতা। কিন্তু ইসলামপন্থীদের মধ্যকার পারস্পরিক বোঝাপড়া শক্ত পোক্ত না হওয়ায় অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে তাদের অবস্থান কতটুকু সুদৃঢ় হবে তা ভাববার বিষয়। তবে আমরা অবশ্যই চাইব, ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী, ইসলামী শরীআহকে মনে প্রাণে বিশ্বাসকারী, দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অগ্রগামী শক্তিই যেন চালকের আসনে বসতে পারে। ইসলামী দলগুলোর প্রতি আমাদের সেই আহ্বান থাকবে যা আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী রহ. করেছিলেন। আমরা চাই, পবিত্র কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহর আলোকে ইসলামী দলগুলো একত্রিত হোক, পারস্পরিক সম্পর্ক ও আস্থা বৃদ্ধি পাক। শুব্বানে আহলে হাদীস ইসলাম ও দেশের জন্য নিঃস্বার্থ কাজ করে যাবে ইনশাআল্লাহ। যোগ্য, দক্ষ ও নিঃস্বার্থ নেতৃত্বের মাধ্যমে শুব্বান এগিয়ে যাবে অনেকদূর। আসুন, ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দ্বীনের জন্য, দেশের জন্য, উম্মাহর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ি।

শাইখ আল আমিন মাদানী
উপাধ্যক্ষ, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা ও সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ।

দারসুল কুরআন

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ
الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

সরল অনুবাদ :

"তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনিই তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত। তিনিই তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' পূর্বের কিতাবে এবং এ কিতাবেও; যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন এবং তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হও। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো। তিনিই তোমাদের অভিভাবক এবং কতই না উত্তম অভিভাবক ও কতই না উত্তম সাহায্যকারী!"[১]

আলোচ্য বিষয় : সূরা আল হজ্জের ৭৮ নম্বর এই আয়াতটি মুসলিমদের জন্য একটি ব্যাপক দিকনির্দেশনা, যা তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব, সামাজিক ভূমিকা এবং আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ককে সুস্পষ্ট করে। আয়াতটি মাদানী যুগের মুসলিমদের আত্মপরিচয়, দায়িত্ব, জিহাদের ব্যাপকতা, ইসলামের সহজতা এবং আল্লাহর উপর ভরসার গুরুত্বকে তুলে ধরে, যা সেই সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের জন্য একটি দিকনির্দেশনা ও মানসিক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল।

বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা : এই আয়াতটি মুসলিম উম্মাহর একটি পরিচয়পত্র (Identity card), একটি কর্মপরিকল্পনা (Action plan), এবং একটি আশ্বাসপত্র (Assurance)। এটি মুসলিমদেরকে তাদের অতীত ঐতিহ্য, বর্তমানের দায়িত্ব এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়। আয়াতটি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং চরম বিশ্বাস ও ভরসার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এটি মুসলিমদেরকে একটি শক্তিশালী, আত্মবিশ্বাসী এবং আল্লাহর উপর নির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য অনুপ্রাণিত করে। চলুন, এই আয়াতটির প্রতিটি অংশকে বিশ্লেষণ করে দেখি:

১. "وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ" (তোমরা আল্লাহর পথে যথাযথভাবে জিহাদ করো): এই অংশটি জিহাদের একটি ব্যাপক এবং সর্বাঙ্গীণ ধারণা পেশ করে। এখানে জিহাদ কেবল সশস্ত্র সংগ্রামকে বোঝায় না, বরং এর ব্যাপক অর্থ হলো,

ক. নফসের জিহাদ (জিহাদুন নাফস): নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা এবং মন্দ থেকে বিরত থাকা। এটি সবচেয়ে বড় জিহাদ।

১. *সূরা হজ্জ, ২২:৭৮*

খ. দাওয়াত ও তাবলীগের জিহাদঃ আল্লাহর দ্বীনকে দলিল, যুক্তি, প্রজ্ঞা ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

গ. জ্ঞান অন্বেষণ ও প্রচারের জিহাদঃ ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া।

ঘ. আর্থিক জিহাদঃ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা।

ঙ. সশস্ত্র জিহাদঃ প্রয়োজনে ইসলামের প্রতিরক্ষা এবং সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ করা।

এই আয়াতটি মুসলিমদেরকে অলস না থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানোর নির্দেশ দেয়। এটি বোঝায় যে, একজন মুসলিমের জীবন কেবল ব্যক্তিগত ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা সমাজ ও বিশ্বেও প্রভাব বিস্তার করবে। 'হাক্কা জিহাদিহি' (যেমন জিহাদ করা উচিত) শব্দগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, এই সংগ্রাম যেন পূর্ণ একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী হয়।

২. هُوَاجْتَبَاكُم (তিনিই তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন): এই বাক্যটি মুসলিম উম্মাহর বিশেষ মর্যাদা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের কথা তুলে ধরে।
আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে পূর্ববর্তী উম্মতদের চেয়ে বিশেষভাবে মর্যাদাবান করেছেন। এই মর্যাদা একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এটি মুসলিমদের জন্য আত্মমর্যাদা ও দায়বদ্ধতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে যে, তারা একটি বিশেষ জাতি, যাদের একটি মহৎ ভূমিকা থাকা চাই।

৩. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর তিনি কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি): এই অংশটি ইসলামের সহজ প্রকৃতির উপর জোর দেয়। 'হারাজ' শব্দের অর্থ হলো কঠোরতা, অসুবিধা বা সংকীর্ণতা। ইসলাম এমন কোনো বিধান চাপিয়ে দেয় না যা মানুষের জন্য অসহনীয় বা অতিরিক্ত কঠিন। এটি একটি মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী জীবনবিধান। উদাহরণস্বরূপ, অসুস্থ বা মুসাফির ব্যক্তির জন্য সালাত ও রোজার ক্ষেত্রে সহজতা, পবিত্রতার জন্য তায়াম্মুমের বিধান, এবং ঋণের ক্ষেত্রে নমনীয়তা এগুলো সবই ইসলামের সহজতার প্রমাণ।

৪. مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيم (এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত): এই বাক্যটি মুসলিম উম্মাহকে তাদের আধ্যাত্মিক পূর্বপুরুষ, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে সংযুক্ত করে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, ইসলাম কোনো নতুন ধর্ম নয়, বরং এটি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একত্ববাদের (তাওহীদ) ধারাবাহিকতা। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ছিলেন একনিষ্ঠ তাওহীদবাদী এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী। মুসলিমদেরকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে এবং তাঁর মতো ইখলাস ও আত্মসমর্পণের মনোভাব ধারণ করতে উৎসাহিত করা হয়। এটি মুসলিমদের জন্য একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় ভিত্তি তৈরি করে, যা অন্যান্য আসমানী কিতাবের অনুসারীদের সাথেও তাদের একটি সম্পর্ক স্থাপন করে।

৫. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا (তিনিই তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম পূর্বের কিতাবে এবং এ কিতাবেও): এই অংশটি মুসলিম নামের উৎস এবং তাৎপর্য তুলে ধরে। মুসলিম অর্থ হলো আত্মসমর্পণকারী বা আনুগত্যকারী এই নামটি মানবসৃষ্ট নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত। তাওরাত, ইঞ্জিলসহ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও এর উল্লেখ ছিল এবং কুরআনেও এটিকে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি মুসলিমদের পরিচয় এবং আল্লাহর প্রতি তাদের পূর্ণ আনুগত্যের প্রতীক। এই নামকরণ মুসলিমদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে, তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দেওয়া।

৬. لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ **(যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন এবং তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হও):** এই অংশটি মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা বলে। কিয়ামতের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন যে, তিনি আল্লাহর বার্তা যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছিলেন। আর এই মুসলিম উম্মাহ পূর্ববর্তী জাতিসমূহের জন্য সাক্ষী হবে যে, তাদের কাছেও আল্লাহ রাসূলগণ এসেছিলেন এবং তারা তাদের কাছে আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন। এই সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব পালনের জন্য মুসলিমদের উচিত সত্যের উপর অটল থাকা, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিশ্বের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা। এটি মুসলিমদেরকে শুধু ব্যক্তিগত ধর্মীয় অনুশীলনে সীমাবদ্ধ না থেকে দাওয়াত ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করে।

৭. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ **(সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো):** এই অংশটি মুসলিম জীবনের তিনটি মূল স্তম্ভ ও করণীয় নির্দেশ করে।

ক. সালাত কায়েম: শুধু সালাত পড়া নয়, বরং তার সকল রোকন, আদব ও খুশু-খুযুর সাথে নিয়মিতভাবে সালাত আদায় করা। সালাত আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ককে দৃঢ় করে।

খ. যাকাত প্রদান: ধনীদের সম্পদ থেকে নির্ধারিত অংশ দরিদ্র ও অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করা। এটি সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে এবং সম্পদ বন্টনে সাহায্য করে।

গ. আল্লাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা: এর অর্থ হলো আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করা, তাঁর নির্দেশ মেনে চলা, তাঁরই সাহায্য চাওয়া এবং বিপদে তাঁর কাছেই ফিরে যাওয়া। এই তিনটি নির্দেশ ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতা (সালাত), সামাজিক দায়বদ্ধতা (যাকাত) এবং আল্লাহর উপর নির্ভরতা (আল্লাহকে আঁকড়ে ধরা)-এর মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনধারার চিত্র তুলে ধরে। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম শুধু আনুষ্ঠানিক ইবাদত নয়, বরং এটি একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান।

৮. هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ **(তিনিই তোমাদের অভিভাবক এবং কত উত্তম অভিভাবক ও কত উত্তম সাহায্যকারী!):** আয়াতের শেষ এই অংশটি মুসলিমদের জন্য একটি বিশাল আশ্বাস, সাহস এবং মানসিক শক্তির উৎস। 'মাওলা' অর্থ অভিভাবক, প্রভু, রক্ষক এবং 'নাসীর' অর্থ সাহায্যকারী। যখন মুসলিমরা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে এবং তাঁর উপর ভরসা করে, তখন আল্লাহ নিজেই তাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাদের সকল বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন এবং কঠিনতম সময়েও তাদের সাহায্য করেন। এই বাক্যটি মুসলিমদেরকে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও ভালোবাসার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে যে, পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাদের ক্ষতি করতে পারবে না যদি আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন। এটি মুসলিমদেরকে কোনো পরিস্থিতিতে হতাশ না হয়ে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে অনুপ্রাণিত করে।

উক্ত আয়াতের আলোকে ইসলামী শরীআহর কয়েকটি মূলনীতি: সূরা হজ্জের ৭৮ নম্বর আয়াতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফিকহি মাসআলা বা শরীয়তের বিধান ও নির্দেশনার ইঙ্গিত রয়েছে। যদিও এই আয়াতটি সরাসরি ফিকহের বিস্তারিত বিধি-বিধান উল্লেখ করে না, তবে এটি ফিকহের মূলনীতি এবং অনেক মাসআলার ভিত্তি প্রদান করে। নিচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ফিকহি মাসআলা বিশ্লেষণ করা হলো:

১. الجهاد في سبيل الله -জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর পথে সংগ্রাম) ও এর প্রকারভেদ: আয়াতে "তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যেমন জিহাদ করা উচিত" বাক্যটি জিহাদের ব্যাপকতাকে তুলে ধরে। ফিকহের দৃষ্টিতে জিহাদ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, যেমন:

ক. الجهاد بالقتال -জিহাদ বিল-ক্বিতাল (সশস্ত্র যুদ্ধ),

খ. الجهاد بالعلم -জিহাদ বিল-ইলম (জ্ঞানের মাধ্যমে জিহাদ),

গ. الجهاد بالمال-জিহাদ বিল-মাল (সম্পদের মাধ্যমে জিহাদ),

ঘ. الجهاد بالنفس -জিহাদ বিন-নফস (আত্মশুদ্ধির জিহাদ),

ঙ. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-আমর বিল-মা'রুফ ওয়া নাহয়ি আনিল মুনকার (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ): সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

২. التخفيف (তাখফীফ) দ্বীনের সহজতা ও কঠোরতা না থাকা: "দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি।" এই আয়াতটি ইসলামের একটি মৌলিক ফিকহি মূলনীতি: الحرج مرفوع -কঠোরতা বা কষ্ট উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।

ক. التخفيف তাখফীফ (নমনীয়তা/সহজতা): এই মূলনীতি অনুসারে, যদি কোনো শরীয়তের বিধান পালনে অতিরিক্ত কষ্ট বা অসুবিধা হয়, তবে ইসলাম সেখানে সহজতা ও ছাড় প্রদান করে। উদাহরণ: পানির অভাবে বা পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কায় ওযুর পরিবর্তে তায়াম্মুমের অনুমতি, কসর ও জমআ সলাত: সফরে সালাত কসর (সংক্ষিপ্ত) করা এবং দুই ওয়াক্তের সালাত এক সাথে আদায় করা, রোজার ক্বাযা: অসুস্থ বা মুসাফির ব্যক্তির জন্য রোজা না রেখে পরে ক্বাযা করার অনুমতি, ইক্বরাহ (বাধ্যবাধকতা): জোরপূর্বক বা প্রাণনাশের হুমকির মুখে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করা জায়েয, যদি অন্তর ঈমানের উপর স্থির থাকে।

ফিকহি মূলনীতি: এই আয়াতটি ফিকহে تكليف ما لا يطاق-অসাধ্যের বোঝা চাপানো হয় না এবং العسر يجلب التيسير -কঠিনতা সহজতা নিয়ে আসে- এই মূলনীতিগুলোর ভিত্তি। এটি মুসলিমদের জন্য ফিকহি বিধান পালনে একটি স্বস্তি ও নমনীয়তা নির্দেশ করে।

আক্বীদাহ বা বিশ্বাসগত ভাবে উক্ত আয়াতের ভূমিকা: সূরা হজ্জের ৭৮ নম্বর আয়াতটি (২২:৭৮) মুসলিমদের বিশ্বাস বা আক্বীদার ক্ষেত্রে এক গভীর এবং মৌলিক ভূমিকা পালন করে। এটি কেবল কিছু নির্দেশনার সমষ্টি নয়, বরং এমন কিছু বিশ্বাসের মূল ভিত্তি স্থাপন করে যা একজন মুসলিমের ঈমানকে সুদৃঢ় করে এবং তার জীবনকে একটি সুনির্দিষ্ট দিকে পরিচালিত করে।

যেমন,

১. التوحيد (তাওহীদ) আল্লাহর একক সত্তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও স্বীকৃতি: আয়াতটির প্রতিটি অংশেই আল্লাহর একক সত্তা, তাঁর ক্ষমতা এবং তাঁর কর্তৃত্বের উপর বিশ্বাসকে জোর দেওয়া হয়েছে। যেমন, "তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো" "তিনিই তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন," "দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি", "তিনিই তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম", এবং "তিনিই তোমাদের অভিভাবক"। এই প্রতিটি বাক্যে আল্লাহকে একচ্ছত্র কর্তা, দাতা, বিধানদাতা ও রক্ষাকর্তা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিশ্বাসগত ভূমিকা: এই আয়াত মুসলিমদের তাওহীদ বা একত্ববাদের বিশ্বাসকে আরও মজবুত করে। এটি শেখায় যে, সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহরই। তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা রাখা, তাঁরই ইবাদত করা এবং তাঁর ছাড়া আর কারো কাছে সাহায্য না চাওয়াও এই বিশ্বাসটি মুসলিমদের ঈমানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

২. النبوة والرسالة **(নবুয়াত ও কিতাব) রিসালাতের উপর বিশ্বাস:** আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে: "যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন"। এটি নবীর প্রতি ঈমান এবং তাঁর মাধ্যমে প্রেরিত ঐশী কিতাবের সত্যতার উপর বিশ্বাসের গুরুত্ব তুলে ধরে।

বিশ্বাসগত ভূমিকা: মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে মানবজাতির জন্য হেদায়েতে পাঠিয়েছন। এই আয়াত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের সত্যতা এবং তাঁর আদর্শের অনুসরণকে একটি অবিচ্ছেদ্য বিশ্বাস হিসেবে স্থাপন করে। এটি মুসলিমদেরকে আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং রাসূলের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার প্রেরণা যোগায়, যা বিশ্বাসগতভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩. يوم الآخرة **(পরকাল দিবস) আখিরাতের উপর বিশ্বাস:** "যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন এবং তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হও" অংশটি পরকালের জবাবদিহিতা এবং কিয়ামতের দিনের প্রতিদান ব্যবস্থার উপর বিশ্বাসকে ইঙ্গিত করে। এখানে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যা কিয়ামতের দিনের হিসাব-নিকাশের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

বিশ্বাসগত ভূমিকা: এই আয়াত মুসলিমদেরকে আখিরাত বা পরকালের জীবনের প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাসী করে তোলে। তারা বিশ্বাস করে যে, দুনিয়ার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথা, এমনকি তাদের বিশ্বাসও কিয়ামতের দিন হিসাবের আওতায় আসবে। এই বিশ্বাস একজন মুসলিমকে দুনিয়াতে সৎকাজে উৎসাহিত করে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, কারণ তারা জানে যে তাদের প্রত্যেকটি কাজের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

৪. তাক্বদীর বা আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর বিশ্বাস: যখন বলা হয় "তিনিই তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন"- এর মধ্যে আল্লাহর অনাদি জ্ঞান এবং তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

বিশ্বাসগত ভূমিকা: যদিও আয়াতটি সরাসরি তাক্বদীরের কথা উল্লেখ করে না, তবে এর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো, মুসলিম উম্মাহর নির্বাচন আল্লাহর পূর্বনির্ধারিত ইচ্ছারই অংশ। এটি মুসলিমদেরকে আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকতে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে তাঁর উপর ভরসা রাখতে শেখায়, যা তাক্বদীরের উপর বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

৫. আল্লাহর গুণাবলী (সিফাত) সম্পর্কে বিশ্বাস: "তিনিই তোমাদের অভিভাবক এবং কত উত্তম অভিভাবক ও কত উত্তম সাহায্যকারী!" - এই বাক্যটি আল্লাহর সিফাত (গুণাবলী) যেমন- আল-মাওলা (অভিভাবক/প্রভু) এবং আন-নাসীর (সাহায্যকারী) এর উপর বিশ্বাসকে জোর দেয়।

বিশ্বাসগত ভূমিকা: মুসলিমরা আল্লাহর এই গুণাবলীসমূহে বিশ্বাস করে। তারা জানে যে আল্লাহই তাদের একমাত্র অভিভাবক এবং তিনিই সকল প্রকার সাহায্য ও ক্ষমতার উৎস। এই বিশ্বাস একজন মুসলিমকে চরম হতাশায়ও আশাবাদী রাখে এবং তাকে সকল বিষয়ে আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরতা (তাওয়াক্কুল) শেখায়।

৬. দ্বীনের সহজতা ও পূর্ণতার উপর বিশ্বাস: "দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি" - এটি মুসলিমদেরকে এই বিশ্বাস প্রদান করে যে, ইসলাম একটি সহজ, ভারসাম্যপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান।

বিশ্বাসগত ভূমিকা: এই আয়াত মুসলিমদেরকে ইসলামের উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে শেখায়। তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য যা কিছু বিধান করেছেন, তা তাদের সাধ্যের মধ্যে এবং এতে কোনো অস্বাভাবিক কঠিনতা নেই। এই বিশ্বাস তাদের মন থেকে ধর্ম পালনের কঠিনতা সম্পর্কিত যেকোনো সংশয় দূর করে এবং তাদের ঈমানকে আরও দৃঢ় করে।

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে উক্ত আয়াতের ভূমিকা:

১. ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা: আয়াতের শুরুতেই "তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যেমন জিহাদ করা উচিত" বলে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তা সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে এক বিশাল ভূমিকা রাখে। এই জিহাদ কেবল যুদ্ধের ময়দানে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সমাজ থেকে অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। যখন সমাজের প্রতিটি সদস্য সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থাকে, তখন একটি সুষম ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এই আয়াত মুসলিমদেরকে সমাজের সকল স্তরে ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং জুলুম প্রতিরোধের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করে। এ ছাড়াও একটি ইসলামী রাষ্ট্র শুধু সামরিক জিহাদের জন্য নয়, বরং এর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নীতিমালায় সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অন্যায় প্রতিরোধ এবং আল্লাহর আইন সমুন্নত রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে।
এর অর্থ:

ক. সুশাসন ও দুর্নীতি দমন: রাষ্ট্রীয়ভাবে দুর্নীতি, অবিচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেওয়া।
খ. আইনের শাসন: সকল নাগরিকের জন্য আইনের সমান প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
গ. প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা: রাষ্ট্রের সীমানা রক্ষা এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
ঘ. দাওয়াহ ও শিক্ষার প্রসার: ইসলামি মূল্যবোধ ও জ্ঞান বিস্তারের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেওয়া।

২. সহজ, ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা প্রবর্তন ও জনকল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থা: "দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি" - এই অংশটি ইসলামী রাষ্ট্রের শাসননীতিতে নমনীয়তা, সহজতা এবং জনকল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণের নির্দেশনা দেয়। একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের আইন-কানুন ও নীতি এমন হবে যা নাগরিকদের জন্য অসহনীয় বোঝা সৃষ্টি করবে না। এর মাধ্যমে:

জনগণের কল্যাণ অগ্রাধিকার: রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়নে জনগণের সুবিধা, প্রয়োজন এবং কল্যাণের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
কঠোরতা পরিহার: অনর্থক বা অপ্রয়োজনীয় কঠিন আইন প্রয়োগ থেকে বিরত থাকা।
নমনীয়তা ও ছাড়: বিশেষ পরিস্থিতিতে বা জরুরি অবস্থায় ফিকহি নমনীয়তাকে (যেমন, মুসাফির ও রোগীর জন্য সালাতে সহজতা) রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও বিবেচনায় আনা হবে। এর ফলে সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে এবং কোনো প্রকার উগ্রতা বা বাড়াবাড়ির সুযোগ থাকে না এবং রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে এক আস্থা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে উঠবে, যা সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য।

৩. মুসলিম উম্মাহর সুদৃঢ় আত্মপরিচয় ও ঐক্য: আয়াতে মুসলিমদেরকে "তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত" হিসেবে উল্লেখ করা এবং স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক মুসলিম নামকরণ করা মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য এক শক্তিশালী আত্মপরিচয় ও ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন করে। এই অভিন্ন পরিচয় মুসলিমদেরকে ভৌগোলিক, ভাষাগত বা জাতিগত ভেদাভেদ ভুলে এক জাতিতে পরিণত করে। সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে এই ঐক্য অপরিহার্য, কারণ এটি পারস্পরিক সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি বৃদ্ধি করে। একটি সুসংহত মুসলিম সমাজ বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অধিক সক্ষম হয়। একটি ইসলামী রাষ্ট্র এই ঐক্যের প্রতীক হিসেবে কাজ করে।

জাতীয় ঐক্য ও সংহতি: রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সকল মুসলমানকে এক উম্মাহর সদস্য হিসেবে গণ্য করা এবং জাতিগত, ভাষাগত বা আঞ্চলিক ভেদাভেদ দূর করে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করা।

মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব: বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহর অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং মুসলিম বিশ্বের সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখা।
আয়াতটি ইসলামী রাষ্ট্রকে শুধু একটি ভূখন্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখতে উৎসাহিত করে।

৪. বিশ্বব্যাপী দাওয়াতি ও আদর্শিক নেতৃত্ব: "যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন এবং তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হও"- এই অংশটি মুসলিম সমাজের বৈশ্বিক দায়িত্বের কথা বলে। ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশ্বিক দায়িত্ব ও আদর্শিক নেতৃত্বের ভূমিকাকে স্পষ্ট করে। মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র কেবল নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এটি সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি আদর্শ মডেল হিসেবে কাজ করে। সমাজের সদস্যরা তাদের আচার-আচরণ, লেনদেন, নৈতিকতা এবং সামগ্রিক জীবনযাপনের মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য ও সত্যতা তুলে ধরে। এই সাক্ষ্যদানের ভূমিকা মুসলিম সমাজকে দাওয়াতি কার্যক্রম এবং মানবকল্যাণমূলক কাজে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকতে অনুপ্রাণিত করে, যা বিশ্বব্যাপী শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেয়।
এটি ইসলামী রাষ্ট্রকে কেবল একটি রাজনৈতিক সত্তা নয়, বরং একটি আদর্শিক শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার প্রেরণা যোগায়।

৫. ইবাদতভিত্তিক ও নৈতিক সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি:
"সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো" - এই নির্দেশগুলো একটি আদর্শ সমাজের মূল ভিত্তি স্থাপন করে।
সালাত প্রতিষ্ঠা: নিয়মিত সালাত সমাজের প্রতিটি সদস্যকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত রাখে এবং তাদের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে। সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, যা একটি অপরাধমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক।

যাকাত প্রদান: যাকাত সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে এবং সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করে। এটি ধনী-গরীবের মধ্যে সেতু বন্ধন তৈরি করে ও দারিদ্র্য হ্রাস করে। একটি যাকাতভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

আল্লাহর উপর নির্ভরতা ও তাঁর আইন প্রয়োগ: সমাজের প্রতিটি সদস্য যখন আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখে এবং তাঁর বিধান মেনে চলে, তখন সমাজে ও রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা, বিশ্বাস ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় । এই দৃঢ় সম্পর্ক সমাজের নৈতিক ভিত্তি মজবুত করে এবং যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সমাজক ও রাষ্ট্রকে অবিচল থাকতে শেখায়।

৬. আল্লাহর সাহায্য ও অভিভাবকত্বের নিশ্চয়তা: আয়াতের শেষ অংশ "তিনিই তোমাদের অভিভাবক এবং কত উত্তম অভিভাবক ও কত উত্তম সাহায্যকারী!" মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রকে এক বিশাল অনুপ্রেরণা ও আশ্বাস প্রদান করে। যখন একটি সমাজ ও রাষ্ট্র আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে, তখন আল্লাহ নিজেই সেই সমাজ ও রাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন এবং তাদের সকল কাজে সাহায্য করেন। এই বিশ্বাস সমাজ ও রাষ্ট্রে আত্মবিশ্বাস, সাহস এবং প্রতিকূলতা মোকাবিলার শক্তি জোগায়, যা একটি গতিশীল ও শক্তিশালী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে অপরিহার্য।

উপসংহারে বলা যায়, সূরা হজ্জের ৭৮ নম্বর আয়াতটি মুসলিম সমাজকে একটি আদর্শ, ন্যায়পরায়ণ, ঐক্যবদ্ধ এবং আল্লাহর উপর নির্ভরশীল জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একটি বিস্তারিত রোডম্যাপ প্রদান করে। এই আয়াতের শিক্ষাগুলো অনুসরণ করে একটি মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রে শুধু নিজেদের কল্যাণই নিশ্চিত করে না, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী
সহ-সভাপতি
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

দারসুল হাদীস

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ الْحَارِثَ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ: السَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ، وَالْجِهَادُ، وَالْهِجْرَةُ، وَالْجَمَاعَةُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ ؟ قَالَ : «وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ، عِبَادَ اللَّهِ».

সরল অনুবাদ:
হারিস আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যেগুলো প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন।

১. শুনবে ২. আনুগত্য করবে ৩. জিহাদ করবে ৪, হিজরত করবে এবং ৫. জামা'আতবদ্ধ হয়ে থাকবে। যে জামাআত হতে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হল সে ইসলামের বন্ধন তার ঘাড় হতে ফেলে দিল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে জাহিলিয়াত আমলের রীতি-নীতির দিকে আহবান করে সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত। জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, সে সালাত আদায় করলেও, সওম রাখলেও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে সালাত-সওম করলেও। সুতরাং তোমরা সেই আল্লাহ তা'আলার ডাকেই নিজেদেরকে ডাকবে যিনি তোমাদেরকে মুসলিম, মু'মিন ও আল্লাহর বান্দা নাম রেখেছেন।[১]

হাদীসটির মান: হাদীসটা বিশুদ্ধ বা সহীহ হওয়া নিয়ে আলেমদের মাঝে কোনো মতানৈক্য নেই, এমনকি ইমাম দারাকুতনী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল ইলযামাত' এ উক্ত হাদীসটিকে সহীহ মুসলিমে বর্ণনা না করার কারণে ইমাম মুসলিমের সমালোচনা করেছেন।[২]

সংক্ষিপ্ত রাবি পরিচিতি:
ইমাম তিরমিযী : বিশ্ববিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সুনানুত তিরমিযী বা জামিউত তিরমিযীর লেখক "আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা ইবনু সাওরাহ ইবনু মূসা ইবনু আদ-যাহহাক আত-তিরমিযী।" তিনি ২০৯ মতান্তরে ২১০ হিজরীতে (প্রায় ৮২৪/৮২৫ খ্রিষ্টাব্দ) তিরমিয (বর্তমান উজবেকিস্তান) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। আনুমানিক ৭০ বছর বয়সে সোমবার ১৩ রজব ২৭৯ হিজরীতে (প্রায় ৮৯২ খ্রিষ্টাব্দ) তিরমিয শহরেই মৃত্যুবরণ করেন। সকল মুহাদ্দিস তাঁকে হাদীস শাস্ত্রে সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করেছেন। তবে ইবনে হাযম রহ. তাঁকে

১. সুনান তিরমিযী-২৮৬৩, মিশকাত-৩৬৯৪, জামে মা'মার বিন রাশেদ -২০৭০৯, মুসনাদ আবী দাউদ তয়ালিসী-১২৫৮, মুসান্নাফ আ. রাজ্জাক ৫১৪১, মুসনাদ আহমাদ -১৭১৭০, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী লিইবনে আসেম -২৫১০, আসসুন্নাহ লিইবনে আসেম-১০৩৬, মুসনাদ আবী ইয়ালা আল মুসেলী-২৫৭১, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ - ১৮৯৫, সহীহ ইবনু হিব্বান-৬২৩৩, আশ শারিয়াহ লিলআজুরী-০৪, আল মুজামুল কাবীর -৩৪২৭, মুসনাদুশ শামীঈন-২৮৭০, আল ইবানাহ আল কুবরা লিইবনে বাত্তাহ-১২৪, আল ঈমান লিইবনে মানদাহ-২১২, আলমুসতাদরাক লিলহাকেম- ৪০৪, আদদাওয়াতুল কাবীর-১২, আসসুনানুল কুররা লিলবাইহাকী -১৬৬১৩, শুয়াবুল ঈমান -৭০৯০, শারহুস সুন্নাহ লিলবাগাভী-২৪৬০, মাওয়ারিদুয যিমান-১২২২, সহীহুল জামি'-১৭২৪।

২. আল ইলযামাত-১০০

মাজহুল বা অপরিচিত বলেছেন বলে কিছু আলেম উল্লেখ করেছেন।[৩]

ইবনু হাযম রহ. কি সত্যিই ইমাম তিরমিযী রহ. কে মাজহুল বা অপরিচিত বলেছেন?

নিম্মোক্ত আলেমগণ ইবনু হাযম রহ.-এর বরাতে ইমাম তিরমিযীকে মাজহুল আখ্যায়িত করার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন: ইমাম আবুল-হাসান আলী ইবনুল কাত্তান।[৪] হাফিয যাহাবী।[৫] হাফিয ইবনু কাসীর।[৬] তবে তিনি বলেন, "ইবনু হাযম তাঁর মুহাল্লা গ্রন্থে ইমাম তিরমিযীকে মাজহুল বলেছেন" এ কথা সঠিক না, কেননা ইবনু হাযম রহ. মুহাল্লা গ্রন্থে শুধুমাত্র একবার ইমাম তিরমিযীর নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু তিনি তাঁকে জারাহ বা তাদিল কিছুই করেননি যদিও তিনি উক্ত হাদীসটি দুর্বল হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।[৭] হাফিয ইবনু হাজার।[৮] কিন্তু এর বিপরীতে কিছু আলেম এ মতকে (তথা ইবনু হাযম ইমাম তিরমিযীকে মাজহুল বলেছেন)

সঠিক মনে করেন না নিম্নোক্ত কারণে: ইবনু হাযম রহ. কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ «الرسالة الباهرة في الرد على أهل الأقوال الفاسدة» -এর ৫০ পৃষ্ঠায় ইমাম তিরমিযীকে স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল মুহাল্লাতে ইমাম তিরমিযীর নাম একবার উল্লেখ করেছেন উক্ত হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করার জন্য কিন্তু তিনি অন্য বর্ণনাকারীদের দুর্বল বললেও ইমাম তিরমিযীর বিষয়ে কোনো মতামত উল্লেখ করেননি।[৯]

এও সম্ভাবনা আছে যে, হয়তো ইবনু হাযম প্রথম দিকে ইমাম তিরমিযীকে মাজহুল বললেও শেষ দিকে নিজ মত থেকে সরে এসেছেন। কেননা উল্লিখিত চারজন আলেমই ইবনু হাযম কর্তৃক লিখিত আল 'ই সাল' গ্রন্থের বরাত উল্লেখ করেছেন যা তাঁর জীবনের প্রথম দিকের বই (বইটা বর্তমানে অস্তিত্বহীন)। আর 'আল মুহাল্লা' জীবনের শেষ বই; যা লিখতে লিখতে তিনি মারা যান। তিনি ২০২৮ নং মাসয়ালা পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেন, পরে তাঁর ছেলে আবু রাফি পিতার 'আল ই-সাল' গ্রন্থের আলোকে বাকি অংশ পূরণ করেন[১০]।[১১]

ইমাম বুখারি : আমিরুল মু'মিনিন ফিল হাদীস।

মূসা ইবনু ইসমাঈল: আল-হাফিয আল-ইমাম আল-হুজ্জাহ শাইখুল ইসলাম আবূ সালামাহ মূসা ইবনু ইসমাঈল আল-মিনকারি (মাওলাহুম) আল-বাসরী আত-তাবূযদুকী। জন্ম সাল জানা যায় না তবে তিনি আব্বাসী দ্বিতীয় খলিফা আবু জাফর মানসুর (১৩৬- ১৫৮ হিজরী) এর খেলাফতের প্রথমে জন্ম গ্রহণ করেন। বসরাতে ২২৩ বা ২২৬ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। সকলের মতে তিনি সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য ছিলেন।[১২]

আবান ইবনু ইয়াযীদ: আবান ইবনু ইয়াযীদ আল-আত্তার হাফিয, ইমাম, আবু ইয়াযীদ আল-বাসরী। তিনি হাদীস শাস্ত্রের একজন বড় মাপের আলেম ও বিশিষ্ট রাবি ছিলেন। জন্ম সাল জানা যায় না। মৃত্যু আনুমানিক ১৬০ হিজরী। আহমদ, ইবনু মাঈনসহ অন্যান্য আলেম তাঁকে সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য বলেছেন।[১৩]

---

৩. *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১১/৬৭*
৪. *বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ইইহাম ফি কিতাবিল আহকাম-৫/৬৩৭*
৫. *তারিখুল ইসলাম- ২০/৪৬১, দারুল কুতুব আল আরাবী*
৬. *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১১/৬৭*
৭. *আল মুহাল্লা-৮/৩৭১, মাসয়ালা নং- ১৭৬৩*
৮. *তাহযিবুত তাহযিব-৯/৩৮৮*
৯. *আল মুহাল্লা-৮/৩৭১, মাসয়ালা নং- ১৭৬৩*
১০. *উইকিপিডিয়া (আল মুহাল্লা পরিচিতি)*
১১. *বিস্তারিত জানতে দেখুন:* صحة نسبة تجهيل الإمام ابن حزم للإمام الترمذي لمشهور بن مرزوق الحرازي
১২. *সিয়ারু আলামিন নুবালা-৬/৪২৩-৪২৫, জীবনী নং-১৬৩০*
১৩. *সিয়ারু আলামিন নুবালা-৭/৯৮, জীবনী নং-১১৬৩*

ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর আততয়ী: জন্ম সাল জানা যায় না তবে ১২৯ হিজরীতে মারা যান। তিনি অনেক ধার্মিক ছিলেন। বিখ্যাত উক্তি ও সহীহ মুসলিমের একমাত্র মাকতু' বর্ণনা: لا يستطاع العلم براحة الجسم– শরীরের আরামের মাধ্যমে জ্ঞান আসে না।[১৪]

যাইদ ইবনু সাল্লাম: জন্ম-মৃত্যু সন জানা যায় না। ইমাম নাসাঈসহ সকলেই তাঁকে সিকাহ বলেছেন।[১৫]
আবূ সাল্লাম মামতুর: নির্ভরযোগ্য তাবেঈ ছিলেন।[১৬]
হারিস আল-আশআরী: সাহাবী, অনেক তাকে আবু মালেক আল আশয়ারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন যা সঠিক না।[১৭]

হাদীসের ব্যাখ্যা:
وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ অর্থাৎ আমিও তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যেগুলো প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন। আমরা এ অংশ দিয়ে হাদীস অস্বীকারকারীদের প্রতিউত্তর করতে পারি, কেননা উক্ত ৫টি বিষয় কুরআনে একত্রে কোথায়ও আসেনি এবং রাসূলকে আদেশও করা হয়নি (কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিষয়গুলোর সারনির্যাস এসেছে) তবুও রাসূল বললেন, "আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন।" তাহলে উক্ত আদেশ কোথায়? নিঃসন্দেহে তা ওহীর মাধ্যমে রাসূলের কাছে এসেছে। কেননা আল্লাহ বলেন, "তিনি যদি আমাদের নামে কোনো কথা রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতেন, তবে অবশ্যই আমরা তাকে পাকড়াও করতাম ডান হাত দিয়ে, তারপর অবশ্যই আমরা কেটে দিতাম তার হৃদপিন্ডের শিরা।"[১৮] সুতরাং কুরআন ও হাদীস উভয়টি একসাথে মানতে হবে নতুবা সে মুসলিম থাকতে পারবে না।[১৯]

শ্রবণ (السَّمْعُ) - রাসূলের প্রথম আদেশ শোনা। শ্রবণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কবুল করা, শুধুমাত্র কান দিয়ে শোনা উদ্দেশ্য না। যেমন আল্লাহ বলেন, – وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ "আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বলে, 'শুনলাম'; আসলে তারা শুনে না।"[২০] কবুল করাটাই হলো দ্বীনের মূল উদ্দেশ্য।[২১]

আনুগত্য করা (الطَّاعَةُ) – রাসূলের দ্বিতীয় আদেশ আনুগত্য করা। নেতা যা আদেশ-নিষেধ করবেন তা কবুল করে মানতে হবে। কেননা নেতার অবাধ্যতার কারণে অনেক বড় বিপর্যয় নেমে আসে যেমনটি আমরা ইসলামের ইতিহাসে দেখতে পায়। রাসূল এর অবাধ্যতার কারণে উহুদ যুদ্ধে পরাজয়, উসমান এর অবাধ্যতার কারণে মুসলিম জাতিকে অনেক বড় মূল্য দিতে হয়েছে। তাই ইসলাম নেতা তথা শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করতে নিষেধ করেছে, যদিও শাসক যালেম হয়, যতক্ষণ না স্পষ্ট কুফরী প্রকাশ করে এবং তাকে সরানোর মত সক্ষমতা থাকে।[২২] তবে শাসকের ভুলের জন্য অবশ্যই সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। তবে তা করতে হবে সংশোধনের উদ্দেশ্যে বিরোধীতা বা বিশৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে না।[২৩]

---

১৪. সহীহ মুসলিম-৬১২
১৫. তাহযিবুত তাহযিব, জীবনী নং- ৭৫৫
১৬. তাহযিবুত তাহযিব, জীবনী নং- ৫১৪
১৭. তাহযিবুত তাহযিব, জীবনী নং- ২৩২
১৮. সূরা আল মা'আরিজ, ৭০: ৪৪-৪৬
১৯. শুবহাতুল কুরআনিয়্যীন হাউলাস্ সুন্নান্ নববিয়্যাহ-২৬
২০. সূরা আনফাল, ৮ : ২১
২১. আরিযাতুল আহওয়াযী শরহে সহীহ তিরমিযী, ইবনুল আরাবী-১০/৩০৬
২২. বুখারী-৭০৫৫, শারহু আকীতুত তহাবীয়াহ-৩৭১ পৃষ্ঠা
২৩. বুখারী-৯৫৬, ১৩০৯, মুসলিম-৫৫, আবু দাউদ-৪১৩১

নেতা বা শাসকের আনুগত্য হতে হবে শরিয়ত সম্মত বা বৈধ বিষয়ে, আল্লাহর অবাধ্যতা বা হারাম বিষয়ে আনুগত্য করা হারাম।[২৪] তবে যদি তাকে হারাম কাজে বাধ্য করা হয় এমতাবস্থায় অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ তাহলে সে অপরাধী হবে না।[২৫]

জিহাদ (الْجِهَادُ) - রাসূলের তৃতীয় আদেশ জিহাদ। জিহাদ হলো "কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে পরিশ্রম বা প্রচেষ্টা করা।"[২৬] জিহাদের অসংখ্য ফযিলত কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তবে তা ইবাদত হওয়ায় তার কিছু প্রকার, শর্ত ও নিয়মনীতিও রয়েছে। সংক্ষেপে কিছু আলোকপাত করা যায়,
প্রকার: ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থ যাদুল মা'আদে জিহাদকে **১৩** প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে।

জিহাদের প্রাথমিক স্তর চারটি:

১. নিজের প্রবৃত্তির (নফসের) বিরুদ্ধে জিহাদ,
২.শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ,
৩. কাফের- মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ,
৪. জালেম, বিদআত ও মন্দ কাজের বিরুদ্ধে জিহাদ।

নিজের প্রবৃত্তির (নফসের) বিরুদ্ধে জিহাদের স্তর ৪টি : ***ইলম অর্জন, আমল, দাওয়াত, সবর***। যা সূরা আসরে বর্ণিত হয়েছে। শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ দুই পর্যায়ে বিভক্ত। ***এক.*** শয়তান যে সমস্ত সন্দেহ ও সংশয় মানুষের অন্তরে নিক্ষেপ করে, যা ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তা প্রতিহ করার জন্য জিহাদ করা। ***দুই.*** শয়তান যে নষ্ট বাসনা ও কুপ্রবৃত্তি মানুষের মনে সঞ্চার করে, সেগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ করা। প্রথম জিহাদের ফলে মানুষ নিশ্চিত বিশ্বাস (ইয়াকীন) অর্জন করে, আর দ্বিতীয় জিহাদের পর আসে ধৈর্য (সবর)।[২৭]

কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের স্তর চারটি: ***অন্তর দিয়ে, মুখের ভাষা দিয়ে, সম্পদের মাধ্যমে এবং নিজের জান (প্রাণ) দিয়ে।*** কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদে হাত (অস্ত্র বা শক্তি) ব্যবহারের দিকটি বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়, আর মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে মুখের ভাষা (প্রচারণা, নসিহত) ব্যবহারই বেশি প্রযোজ্য।

জালেম, বিদআত ও মন্দ কাজের বিরুদ্ধে জিহাদের তিনটি স্তর:
১. সক্ষমতা থাকলে হাত দ্বারা প্রতিরোধ,
২. যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে মুখ দ্বারা।
৩. যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে নিজের অন্তরে ঘৃণা করে জিহাদ করবে।[২৮]

হুকুমের দিক থেকে জিহাদ দুই প্রকার: ১. ফরজে কেফায়াহ তথা কিছু ব্যক্তি জিহাদ করলে সকলে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তবে তার জন্য শর্ত হচ্ছে, জিহাদের সক্ষমতা থাকতে হবে।[২৯] **২.** ফরজে আইন।

চার অবস্থায় জিহাদ ফরজে আইন হয়:
১. যখন দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়ে যায় এবং সেনাসমূহ পরস্পরের সামনে অবস্থান নেয়, তখন উপস্থিত ব্যক্তির জন্য পলায়ন করা হারাম হয়ে যায়।[৩০]

---

২৪. বুখারী-২৯৫৫
২৫. ব্যক্তি বাধ্য বা নিরুপায় কখন হবে তা জানতে দেখুন - ফাতহুল বারী-১২/৩১১, কিতাবুল ইকরাহ।
২৬. ফাতহুল বারী-০৬/০৩, কিতাবুল জিহাদ
২৭. সূরা সাজদাহ, ৩২ : ২৪
২৮. যাদুল মা'আদ-৩/৯
২৯. সূরা বাকারাহ, ২ : ২৮৬
৩০. সূরা আনফাল, ৮:১৬, বুখারী-২৭৬৬

২. যদি কাফিররা কোনো দেশে আক্রমণ করে, তাহলে সেই দেশের অধিবাসীদের জন্য যুদ্ধ করা ও প্রতিরোধ করা ফরজ হয়ে যায়।

৩.যদি ইমাম (শাসক/আমির) কোনো জাতিকে (যুদ্ধে) আহ্বান করে, তবে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে অংশগ্রহণ করা তাদের ওপর আবশ্যিক হয়ে যায়।

৪. যদি বিশেষ কারো প্রয়োজন হয়। (অর্থাৎ অন্যদের জন্য যুদ্ধ অপরিহার্য না হলেও কারো বিশেষভাবে দরকার হয়ে পড়লে), তার জন্য জিহাদ ফরজে আইন (ব্যক্তিগতভাবে আবশ্যিক) হয়ে যায়।[৩১]

জিহাদের শর্তাবলী: ৭টি শর্তে ব্যক্তির উপর জিহাদ ফরজ হয়। মুসলমান হওয়া, বালেগ হওয়া, বুদ্ধিমান হওয়া, স্বাধীন হওয়া (দাস না হওয়া), পুরুষ হওয়া, ক্ষতির আশঙ্কা থেকে নিরাপদ থাকা, খরচ বহনের সামর্থ্য থাকা।[৩২]

জিহাদের জন্য কি আমির বা নেতা শর্ত?

বর্তমানে এ বিষয় নিয়ে অনেক মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। যদিও উক্ত মতানৈক্য সালাফী আলেমদের মাঝে না বরং উগ্রপন্থী কিছু আলেমের মাঝে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, আক্রমাণত্মক যুদ্ধের জন্য আমির বা শাসকের অনুমতি লাগবে তবে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থায় আমিরের অনুমতি লাগবে না। মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয়।"[৩৩] কে বের হতে বলবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যখন তোমাদের কাছে (জিহাদে) বের হতে বলা হবে, তখন বেরিয়ে পড়বে।"[৩৪] কে চাইবে? যে কেউ চাইলেই হবে? যেমন বর্তমানে অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে জিহাদের ডাক পাওয়া যায়। এরকম ব্যক্তি ডাকলেও হবে? না, বরং এমন নেতা হতে হবে যে তাঁর বাহিনীকে নিরাপত্তা দিতে পারবে। রাসূল বলেন,"ইমাম হচ্ছে ঢালস্বরুপ, তার অধীনে যুদ্ধ করতে হবে।"[৩৫] ইবনু কুদামাহ রহ. বলেন, "আর জিহাদের বিষয়টি ইমামের সিদ্ধান্ত ও ইজতিহাদের ওপর ন্যস্ত থাকে এবং তিনি যা সঠিক মনে করেন সে বিষয়ে প্রজাদের তার আনুগত্য করা ফরজ।"[৩৬] ইবনু উসাইমিন বলেন,"অবস্থা যায় হোক না কেন ইমামের অনুমতি ছাড়া যুদ্ধ করা যাবে না।"[৩৭] একই মত ব্যক্ত করেছেন ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রহ.।[৩৮]

হিজরত (الْهِجْرَة), রাসূলের চতুর্থ আদেশ হিজরত।

হিজরতের শাব্দিক অর্থ: ত্যাগ করা, বর্জন করা, বিচ্ছেদ। পারিভাষিক অর্থ: আব্দুর রহমান মুবারকপুরী রহ. বলেন, হিজরত হল,মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করা (মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত), কুফরীর দেশ থেকে ইসলামী দেশে, বিদআতের দেশ থেকে সুন্নাতের দেশে, এবং গোনাহের অবস্থা থেকে তাওবার দিকে স্থানান্তর, এগুলোকেই হিজরত বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সেই ব্যক্তি প্রকৃত হিজরতকারী, যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করে[৩৯]।[৪০]"

---

৩১. *শারহুল মুমতি'-৮/৭-১০*
৩২. *আল মুগনী লি ইবনে কুদামাহ-৯/১৯৭, মাসয়ালা নং -৭৪১৪*
৩৩. *সূরা তাওবাহ, ৯ : ৩৮*
৩৪. *বুখারী -২৮২৫*
৩৫. *বুখারী -২৯৫৭*
৩৬. *আল মুগনী -৯/২০২, মাসয়ালা নং - ৭৪২৩*
৩৭. *শারহুল মুমতি'-৮ /২২*
৩৮. *মাজমূআ ফাতাওয়া- ২৮/৩৯০-৩৯১*
৩৯. *বুখারী-১০*
৪০. *তুহফাতুল আহওয়াযী-৮/১৩১*

১১তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৫

হিজরতের প্রকারঃ

ইমাম ইজ্জ ইবনু আব্দুস সালাম ও ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, হিজরত প্রথমত দুই প্রকার :

১. স্থানগত হিজরত (الهجرة المكانية)

২. আচার-আচরণগত হিজরত (الهجرة المعنوية / السلوكية)

স্থানগত হিজরত ৪ প্রকার: **১.** রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট মদীনায় হিজরত করা। এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম হিজরত।[৪১] **২.**কুফরের দেশ থেকে ইসলামী দেশে হিজরত করা।[৪২] **৩.** খারাপ স্থান (পাপের স্থান) থেকে উত্তম স্থানে হিজরত করা।[৪৩] **৪.** শেষ জামানায় শামে হিজরত করা।[৪৪] ইবনুল আরাবীর নিকট হিজরতের প্রকার:

তিনি বলেন, আলেমগণ হিজরতকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন:

এক. পালানোর হিজরত (هجرة الهرب) ***দুই.*** অন্বেষণের হিজরত (هجرة الطلب)। পালানোর হিজরত (هجرة الهرب) আবার ছয় প্রকার। যথা: **১.** কুফর দেশ থেকে ইসলামের দেশে হিজরত করা। **২.** বিদআতের ভূমি থেকে বেরিয়ে আসা। **৩.** এমন ভূমি থেকে বেরিয়ে আসা যেখানে হারাম প্রাধান্য পেয়েছে; কেননা হালাল তালাশ করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ। **৪.** দেহে আঘাত বা ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কায় (জুলুম থেকে) পলায়ন করা।[৪৫] **৫.** রোগাক্রান্ত ও অস্বাস্থ্যকর স্থান থেকে সুস্থ বা স্বাস্থ্যকর জায়গায় চলে যাওয়া।[৪৬] তবে মহামারীর ভয়ে পালানো নিষেধ।[৪৭] **৬.** সম্পদহানির আশঙ্কায় পলায়ন করা; কেননা মুসলমানের সম্পদের মর্যাদা তার রক্তের মর্যাদার মতো, আর পরিবার (সন্তান-স্ত্রী) এর মর্যাদা তার চেয়েও বেশি ও অগ্রগণ্য। অন্বেষণের হিজরত (هجرة الطلب) আবার দুই প্রকার: **১.** ধর্ম অন্বেষণ (এটা আবার ৯ প্রকার), **২.** দুনিয়া অন্বেষণ।[৪৮]

বর্তমানে হিজরতের বিধান: মক্কা বিজয়ের পর থেকে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের ফরজ বিধান রহিত হয়ে যায়। কিন্তু অনান্য স্থান থেকে হিজরতের বিধান কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে।[৪৯]

অমুসলিম দেশে হিজরত (নাগরিকত্ব গ্রহণ) করার বিধান: অমুসলিম দেশে বসবাসের নিয়তে যাওয়া হারাম।[৫০] শাইখ ইবনু উসাঈমিন রহ. বলেন, একজন মুসলিমের জন্য কুফরী দেশে সফর করা তিনটি শর্তসাপেক্ষে বৈধ: **১.** তার কাছে এমন পরিমাণে ইসলামী জ্ঞান থাকতে হবে, যার মাধ্যমে সে শুবহাত (সন্দেহজনক ভ্রান্ত মতবাদ ও বিশ্বাস) প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। **২.** তার মাঝে এমন দ্বীনদারিতা (আল্লাহভীতি ও তাকওয়া) থাকতে হবে, যা তাকে কু-প্রবৃত্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। যেমনঃ মদ, ব্যভিচার, সমকামিতা ইত্যাদি যা সে সেখানে সহজেই পায়। **৩.** তার এই সফরের বাস্তবিক প্রয়োজন থাকতে হবে। যেমন একজন চিকিৎসার জন্য, অথবা এমন কোনো জ্ঞান বা শিক্ষার প্রয়োজন, যার ইসলামী দেশে কোনো বিশেষায়িত ব্যবস্থা নেই। অথবা ব্যবসায়িক কোনো জরুরি প্রয়োজন, যার জন্য সেখানে গিয়ে বাণিজ্য করবে এবং পরে ফিরে আসবে।[৫১]

৪১. সূরা তওবাহ, ৯: ১০০
৪২. আবু দাউদ -২৪৭৯
৪৩. বুখারী -৩৪৭০
৪৪. আবু দাউদ -২৪৮৩
৪৫. সূরা কসাস, ২৮ : ২১
৪৬. বুখারী -৪১৯২
৪৭. বুখারী -৩৪৭৩
৪৮. বিস্তারিত দেখুন: আহকামুল কুরআন লিইবনিল আরাবী-১/৬১১
৪৯. আবু দাউদ -২৪৭৯
৫০. আবু দাউদ -২৬৪৫
৫১. শারহু রিয়াজিস সালেহীন লিইবনিল উসাঈমিন -১/২৩

জামায়াতবদ্ধ (الْجَمَاعَةُ), রাসূলের পঞ্চম আদেশ জামায়াতবদ্ধ থাকা

জামায়াত দ্বারা কি উদ্দেশ্য? ইমাম শাতিবী বলেন, জামায়াত দ্বারা কি উদ্দেশ্য এ নিয়ে ৫টি মত রয়েছে। যথা:

১. জামাআত হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দল ((السواد الأعظم। এ মত ব্যক্ত করেছেন আবু মাসউদ ও ইবনু মাসউদ সাহাবীদ্বয়।

২. জামাআত হলো উম্মাহর বিদ্বান, বিচক্ষণ, শূরা ও নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিরা যার উপর একমত হয়েছেন (أهل الحل والعقد)। এটা আব্দুল্লাহ বিন মুবারক এর মত।

৩. জামাআত হলো, সেই পথ বা মানহাজ, যার উপর ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবিরা। এটাই সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। এটি উমর বিন আব্দুল আজিজ ও ইমাম আহমাদসহ বহু সালাফের বক্তব্য।

৪. জামাআত হলো মুসলিম উম্মাহর সমষ্টি। যখন তারা কোনো বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছে, তখন অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ওপর তাদের অনুসরণ করা ওয়াজিব।"

৫. ইমাম তাবারী যে মত পছন্দ করেছেন তা হলো, জামাআত হলো মুসলিমদের সে দল, যারা কোনো আমীর বা শাসকের ওপর একত্রিত হয়।"[৫২]

ইমাম আল-তীবী বলেন, "জামায়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাহাবী, তাবেঈদের দল তথা তাদের আদর্শের উপর যারা রয়েছে তাদের সাথে থাকা।"[৫৩]

আবু মুহাম্মদ আস-সুলাইমানি (আল্লাহ তাঁকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন) বলেছেন, প্রত্যেক যুগেই আল্লাহ মুসলিমদের জন্য একটি জামাআত নির্ধারিত করেছেন, আর তারা হল আহলুল হাদীস। অতএব, তাদের সঙ্গই অবলম্বন করো; কারণ তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সবচেয়ে বেশি অনুগত, এবং মুসলিম শাসকদের প্রতিও সবচেয়ে বেশি অনুগত।" (নেট থেকে নেওয়া) ঐক্যবদ্ধ ও জামায়াতবদ্ধ থাকার বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য দলিল বর্ণিত হয়েছে । এমনকি ইসলাম ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন ফরজ করেছে, দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা হারাম করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"....এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে ।"[৫৪] তিনি আরো বলেন,"নিশ্চয় যারা তাদের দ্বীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোনো দায়িত্ব আপনার নয় ; তাদের বিষয় তো আল্লাহর নিকট, তারপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানাবেন।"[৫৫] **(ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পড়ুন: আল-ই'তিসাম লিল শাতিবী)**।

فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ؛ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ– **"যে জামাআত হতে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হল সে ইসলামের বন্ধন তার ঘাড় হতে ফেলে দিল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে।"**

আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, "যে ব্যক্তি জামাআতের অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় (সুন্নাহ পরিত্যাগ করে এবং বিদআত অনুসরণ করে, আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়) যদি তা সামান্যই হয়, যা দৃশ্যমানভাবে এক বিঘত পরিমাণে পরিমাপযোগ্য হলেও সে ইসলামকে নিজের গলা থেকে খুলে ফেলেছে।"[৫৬] এটা রাসূল ধমকস্বরুপ বলেছেন অর্থাৎ সে কাফের হয়ে যাবে না বরং বড় পাপী হবে।[৫৭]

যেমন রাসূল অন্য হাদীসে বলেন, مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، فَمَاتَ؛ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ - যে ব্যক্তি জামাআত

৫২. বিস্তারিত দেখুন:আল-ই'তিসাম ২/২০৮-২১৮
৫৩. তুহফাতুল আহওয়াযী-৮/১৩১
৫৪. সূরা আনফাল, ৮ : ৪৬
৫৫. সূরা আনয়াম, ৬: ১৫৯
৫৬. তুহফাতুল আহওয়াযী-৮/১৩১
৫৭. শারহু কিতাবিল-ইবানা মিন উসূলিদ-দিয়ানা লিআবিল আবুল আশবাল হাসান আয-যুহাইরি-৭/২৪

(মুসলিমদের ঐক্য ও নেতার অনুসরণ) থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে যায়, অতঃপর মারা যায় সে জাহিলিয়্যাতের (ইসলামের পূর্ব যুগের অজ্ঞতার) মৃত্যুর মতো মৃত্যুবরণ করেছে।"[৫৮]

জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু (ميتة جاهلية) অর্থ কী?

ইমাম নবাবী রহ. বলেন, ميتة جاهلية অর্থ: জাহিলি যুগের লোকেরা যেভাবে মারা যেত সেইভাবে। তাদের কোনো ইমাম বা নেতা ছিল না।[৫৯] হাফিজ ইবনু হাজার বলেন, এটি হলো এমন এক মৃত্যু, যা জাহেলিয়াত যুগের লোকদের মত, যারা পথভ্রষ্ট অবস্থায় মারা যেত এবং যাদের কোনো নেতা বা ইমাম ছিল না। এ উদ্দেশ্য এই নয় যে সে 'কাফির' অবস্থায় মারা গেছে, বরং সে 'গুনাহগার' হিসেবে মারা গেছে। উল্লিখিত আলোচনায় জামায়াতবদ্ধ থাকার গুরুত্ব বুঝা গেলো এবং এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীস গুলো মূলত রাষ্ট্র নেতার সাথে সম্পর্কিত।[৬০] জমঈয়ত বা অন্য কোনো সংগঠন থেকে বেরিয়ে পড়লে উক্ত হাদীসের অন্তর্ভক্ত হবে না তবে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টির পাপে পাপী হবে।

وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ- আর যে জাহিলিয়াত আমলের রীতি-নীতির দিকে আহবান করে সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত।

জাহেলী যুগের রিতীনীতি দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সে যুগের কথা, কাজ করা। যেমন: বিচ্ছিন্নতা, আনুগত্য হীনতা, জাতীয়তাবাদ, গোত্র প্রীতি, শোক প্রকাশে বিলাপ করে কান্না করা ইত্যাদি। তবে এখানে উদ্দেশ্যে হচ্ছে, বিচ্ছিন্নতাবাদ বা জাতীয়তাবাদ/ গোত্র প্রীতি। যেমন অন্য হাদীসে এসেছে,

মুরাইসি যুদ্ধে জনৈক মুহাজির এক আনসারীর নিতম্বে আঘাত করলেন। তখন আনসারী হে আনসারী ভাইগণ! বলে সাহায্য প্রার্থনা করলেন এবং মুহাজির সাহাবী, ওহে মুহাজির ভাইগণ! বলে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। রাসূল তা শুনে বললেন, কী খবর,

জাহিলী যুগের মত ডাকাডাকি করছ কেন? তখন উপস্থিত লোকেরা বললেন, এক মুহাজির এক আনসারীর নিতম্বে আঘাত করেছে। তিনি বললেন, এমন ডাকাডাকি পরিত্যাগ কর। এটা অত্যন্ত গন্ধময় কথা।[৬১]

তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসের শেষ অংশে বলেন, **فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهِ** - "সুতরাং তোমরা সেই আল্লাহ তা'আলার ডাকেই নিজেদেরকে ডাকবে যিনি তোমাদেরকে মুসলিম, মু'মিন ও আল্লাহ তা'আলার বান্দা নাম রেখেছেন।" সুতরাং এমন নাম বা গুণ ধারণ করা যাবে না যা থেকে বিচ্ছিন্নতা বুঝা যায়।

তাহলে কি আহলে হাদীস নামকরণ করা যাবে?

উত্তরে বলবো, আহলে হাদীস নামকরণ করা যাবে যেমন ভাবে আল্লাহ মুহাজির আনসার নামকরণ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাদরী, তুলাকাসহ বিভিন্ন নামে নামকরণ করেছেন। অনুরুপ আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নামে নামকরণ করে থাকি। এগুলো হাদীস বিরোধী হচ্ছে না, কেননা এ নামকরণ পরিচয়ের জন্য, বিভেদর জন্য না। অনুরুপ ভাবে আহলে হাদীসও আদর্শিক নাম, বিদআতী থেকে পৃথক বুঝানোর জন্য।

---

৫৮. মুসলিম- ১৮৫১
৫৯. শরহু মুসলিম- ১২/২৩৮
৬০. শারহু কিতাবিল-ইবানা মিন উসূলিদ-দিয়ানা লিআবিল আবুল আশবাল হাসান আয-যুহাইরি-৬/০২
৬১. বুখারী-৪৯০৫

হাদীস থেকে শিক্ষা:

১. কুরআন মানা যেমন ফরজ হাদীস মানাও তেমনি ফরজ,

২. মুসলিম জীবনে আনুগত্যের গুরুত্ব,

৩. শারঈ ও জাগতিক বিষয়ে নেতার আনুগত্য করা আবশ্যক,

৪. আনুগত্যহীন জীবন জাহেলি জীবন,

৪. দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সকল প্রকার জিহাদের গুরুত্ব,

৫. হিজরত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত,

৬. কাফের দেশে হিজরত বা নাগরিকত্ব গ্রহণ নিষেধ,

৭. স্থানগত হিজরতের চেয়ে আচরণগত হিজরত বেশি গুরুত্ব,

৮. সম্পদ রক্ষার চেয়ে দ্বীন রক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাই ইসলাম স্থানগত হিজরতের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে,

৯. ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন করা ফরজ তাই ইসলাম ফেরকাবন্দী ও দলাদলি হারাম করেছে,

১০. মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম,

১১. মুসলিমদের মাঝে ফেরকাবন্দী সৃষ্টি করার কারণে সালাত সিয়াম আদায় করেও জাহান্নামে যেতে হবে,

১২. জাহেলি রীতিনীতি ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে,

১৩. পরিচয়ের জন্য বিভিন্ন নামে নামকরণ করা বৈধ।

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছের রাজনৈতিক জীবনের একটি অধ্যায়

আল্লামা কোরায়শীর রচনা থেকে

আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী রহ.

সাধারণতঃ মনে করা হয়, ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল সর্বপ্রথম ভারত-উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের কথা কল্পনা করিয়াছিলেন আর তাঁহার কল্পলোকের চিত্রকে বাস্তব মানচিত্রে পরিণত করিয়াছেন কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ। পাক-ভারত উপমহাদেশের বিংশ শতকের ইতিহাস আমাদিগকে উপরিউক্ত সন্ধানই দিয়া থাকে। কিন্তু এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস মাত্র পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় আর অর্ধশতাব্দীকালের পূর্ববর্তী যুগগুলিতে মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক জীবন কোন সময়েই আড়ষ্ট ও নিস্পন্দ হইয়া যায় নাই।

পাকভারতের মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল পলাশীযুদ্ধের অব্যবহিতকাল পর হইতেই। ভারতের ইতিহাস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া রচিত হইয়াছে, কিন্তু জানিনা একথা কয়জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে যে, পলাশীর পর ক্লাইভের মুষ্টিমেয় সেনাবাহিনী যখন মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে বালাজীরাও এর জ্ঞাতিভ্রাতা সদাশিব রাও ভাও ১৩ লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লী অধিকার করিয়া লইয়াছিল। আজ চেয়ারে ঠেশ দিয়া বসিয়া এরূপ নিষ্ঠুর অবাস্তব উক্তি উচ্চারণ করা অত্যন্ত সহজ যে, মুসলমানরা অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনে কোন সক্রিয় অংশগ্রহণ করে নাই। আমাদের জাতীয় জীবনের দেড়শত বৎসরের ইতিহাস দূর্ভাগ্যবশতঃ আজ পর্যন্ত স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে আর নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক পদ্ধতির অনুসরণে লিখিত হয় নাই বলিয়াই এক শ্রেণীর উচ্ছিষ্ট ভোজী ও গতানুগতিকতার অনুসারী ব্যক্তিরা এরূপ দায়িত্বহীন অভিমত প্রকাশ করার সুযোগ লাভ করিয়াছে। ১৭৫৭-৫৮ সনে সমগ্র পাক ভারত উপমহাদেশের মুসলিমগণ যে প্রলয়কান্ডের সম্মুখীন হইয়াছিল আর তাহাদের নেতৃবর্গ জাতির অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখার জন্য তখন যেসকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, পাকিস্তানের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করার পক্ষে তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক।

১৭৩৯ সনে নাদির শাহের আক্রমণের ফলে মুগল সাম্রাজ্যের দেহ প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল। বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণররা কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অযোধ্যায় সাআদত আলী খান, বাঙলায় আলীওয়ার্দী খান, দাক্ষিণাত্যে নিযাম স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবে শিখদের প্রতিপত্তি দিনদিন বাড়িয়া চলিয়াছিল। পশ্চিম দক্ষিণ অঞ্চলসমূহে মারহাট্টারা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার এই মারহাট্টা বর্গীদুস্যদের উপদ্রবের কাহিনী শিশুদের ঘুমপাড়ানো ছড়াতেও স্থান লাভ করিয়াছে :

> "ছেলে ঘুমোলো, পাড়া জুড়ালো, বর্গী এল দেশে,
> টুনটুনিতে ধান খেয়েছে খাজ্না দেব কিসে?"

দিল্লীতে ইরানী, তুরানী জাতীয়তার কলহ চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। হতভাগ্য উমারার দল পরস্পরকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে মারহাট্টাদের শরণাপন্ন হইত। ক্রমে ক্রমে মারহাট্টাদের প্রভাব দিল্লীর উপকণ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সপ্তদশ শতকের শেষভাগ হইতে মারহাট্টাদের উত্থান আরম্ভ হয়। পুনা, সাট্টারা, কোলহাপুর, গোয়ালিয়র, নাগপুর, গুজরাট ও ইন্দোরে তাহারা স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী রাজত্ব স্থাপন করে। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে শাহজীর পুত্র শিবাজী মুগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া প্রকাশ্যে লুটতারাজ আরম্ভ করিয়া দেয় আর ১৬৫৯ সনে বিশ্বাসঘাতকতার সহিত মুগল সেনাপতি আফযল খানকে হত্যা করে। শিবাজী মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৬৮০ খৃঃ) মুঘল ও বিজাপুর রাজ্যের অনেকগুলি দুর্গ জয় করিয়া লয় আর মারহাট্টাদের এক বিশাল রাজত্ব গঠন করে।

শিবাজীর পৌত্র শাহুজীকে সম্রাট আলমগীর নযরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ওফাতের সঙ্গে সঙ্গেই (১৭০৭ খৃ.) তদীয় পুত্র বাহাদুর শাহ শাহুকে মুক্ত করিয়া দেন। বালাজী বিশ্বনাথের সাহায্যে শাহু শিবাজীর উত্তরাধিকারী হয়।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাক্ষণ-সন্তান বালাজী 'পেশওয়া' রাজবংশের স্রষ্টা। তদীয় পুত্র বাজীরাও ১৭৩১ সনে গুজরাটে 'গায়কোয়ার' রাজবংশ স্থাপিত করে। তাহার সেনাপতিগণের মধ্যে হোলকার, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা কর্ণাটক ও ত্রিচিনাপল্লী হস্তগত করে আর ১৭১১ খৃষ্টাব্দে মুগল-সাম্রাজ্যের উত্তরাংশ দখল করিয়া লয়। ১৭৩৭ সনে তাহারা গয়া, মথুরা, কাশী ও এলাহাবাদ অধিকার করে। ১৭৪০ সনে শাহু নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে বাজীরাও-এর পুত্র বালাজীরাও শাহুর স্থানে উপবেশন করে। তাহার ভ্রাতা রঘুনাথ বা রাঘবারাও হোলকার উত্তরাঞ্চলে মারহাট্টা রাজ্য প্রসারিত করার জন্য ব্রতী হয় এবং জাঠদের[১] সাহায্য গ্রহণ করিয়া ১৭৫৮ সনে দিল্লি আক্রমণ করিয়া বসে। নজীবুদ্দওয়ালা[২] নিরুপায় অবস্থা মারহাট্টাদের সহিত তখনকার

---

১. Tod তাঁর "রাজস্থানের ইতিহাসে" জাঠদিগকে ডেনমার্কের পুরাতন অধিবাসী Getoe দের বংশধর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ভারতবর্ষে আসিয়া ইহারা প্রথমে যমুনার তীরে বসবাস করিত এবং কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকার্জন করিত। যদুনাথ সরকার আওরাংযীবের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, উত্তর ভারত হইতে সম্রাটের অনুপস্থিতির সর্বপ্রথম সুযোগ জাঠরাই গ্রহণ- করিয়াছিল। তাহারা সেনাবাহিনী গঠন করিয়া মুগল ফওজের মুকাবিলা শুরু করিয়া দেয়। প্রত্যেকজন জাঠ বাধ্যতামুলকভাবে অসিচালনা শিক্ষা করে ও তাহাদের মধ্যে বন্দুক বিতরণ করা হয়। আক্রমণ আর লুটের মাল সুরক্ষিত করার জন্য নিবিড় জঙ্গলে তাহারা মাটির বহু দুর্গ নির্মাণ করে। এই মাটির দুর্গগুলি গড় নামে কথিত হইত আর সেগুলি তোপের প্রতিরোধ করিতে পারিত। মুগল সম্রাট মুহাম্মদ শাহের সময়ে জাঠদের নেতা চুড়ামন অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। তাহার পৌত্র সুরজমল দীগ ও কুন্তেরের দুর্গ নির্মাণ করে এবং ভরতপুর রাজধানী রূপে নির্বাচিত হয়। এই পুরলমলই ৩০ হাজার জাঠ সৈন্য লইয়া আহমদ শাহ আব্দালীর বিরুদ্ধে মারহাট্টাদের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল। [History of Indie H. Beveridge III P. P. 784 & Histroy of Aurangzib V.P.P. 296-97].

২. পেশোয়ারের ২৫ ক্রোশ দূরে মন্রী গ্রামে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে নজীবুদ্দওলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবিকার সন্ধানে ১৭৪৩ সনে আওলায় আসিয়া আলী মুহাম্মদ খানের অধীনে দ্বাদশ অশ্বারোহীর কাপ্তেন নিযুক্ত হন এবং দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়া কয়েকশত অশ্বারোহীর নায়ক পদ লাভ করেন। সম্রাট কর্তৃক আলী মুহাম্মদ খান সরহিন্দের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলে নজীবুদ্দওলা তাঁহার অনুসরণ করেন। এই সময়ে তাঁহার কর্মকুশলতা ও যোগ্যতা সর্বজনবিদিত হইয়া পড়ে। প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁহার শ্বশুর ছন্দেখান জামাতাকে চাঁদপুর, নগীনা ও বিজনোর প্রভৃতি অঞ্চল সমর্পণ করেন। সফদরজং আর মারহাট্টারা মিলিতভাবে আফগানদের উপর চড়াও করিলে নজীব অশেষ বীরত্বের পরিচয় দেন এবং হাফিয রহমতুল্লাহ তাঁহাকে সহস্র অশ্বারোহীর অধিনায়কত্ব সমর্পণ করেন। ১৭৫৩ সনে সফদর জঙ্গের বিরুদ্ধে তিনি ১ হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে বাদশাহর সমর্থনে দিল্লী যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে প্রায় ১০ হাজার রোহিলা সৈন্য তাঁহার অনুগামী হয়। দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে "নজীবুদ্দওলা" খেতাব দেন আর পাঁচহাজারী মনসবদারের পদ অর্পণ করেন। সফদর জঙ্গের সহিত যুদ্ধে তিনি যে বিক্রম ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার বিনিময়ে সম্রাট নজীবের বাহিনীর বেতন বাবত তাঁহাকে নদীর মধ্যবর্তী ইলাকা দান করেন। চারমাস পর নজীবুদ্দওলা দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার অবস্থা সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়। মুগল দরবারের সহিত তাঁহার সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দেখিতে দেখিতে রাজধানীর সকল প্রকার রাজনীতির তিনি কর্ণধারে পরিণত হন। ১৭৬১ হইতে ১৭৭০ পর্যন্ত তিনি দিল্লীর বিশিষ্টতম পুরুষ ছিলেন। প্রচলিত শিক্ষার দিক দিয়া নজীব উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু কঠোর অধ্যবসায়, বিশ্বস্ততা আর অভিজ্ঞতা দ্বারা মানুষ যে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে, সেদিক দিয়া তাঁহার কেহ জুড়ি ছিল না। ইহার পর ১৭৫৩ সন হইতে হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর সাহচর্য সোনায় সোহাগার মত তাঁহার মধ্যে স্বজাতিবাৎসল্য ও ধর্মপরায়ণতার অপূর্ব সমাবেশ ঘটাইয়া দেয়। সলজোকীরা আববাসী খিলাফত রক্ষা করার জন্য যাহা করিয়াছিল, তাঁহার নেতৃত্বে রোহিলারাও মুগল সাম্রাজ্যের রক্ষাকল্পে ঠিক তাহাই করিয়াছিল। নজীবুদ্দওলা কর্তৃক ৯শত বিদ্বান প্রতিপালিত হইতেন সর্বনিম্ন হইতে সর্বোচ্চশ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেকেই ৫ টাকা হইতে ৫ শত টাকা মাসিক বৃত্তি পাইতেন। হযরত শাহ সাহেবের রহীমিয়া মাদরাসার নিয়মানুসারে তিনি নজীবাবাদেও একটি বিরাট শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রহীমিয়া মাদরাসার মত এই মাদরাসাটিও শাহ সাহেবের রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল, নজীবুদ্দওলা প্রত্যেক দুরূহ সমস্যায় শাহ সাহেবের শরণাপন্ন হইতেন এবং তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্য চাহিতেন। মারহাট্টা, শিখ আর জাঠদের মিলিত শক্তি যখন দিললী চড়াও করে, তখন তাঁহারই পরামর্শক্রমে নজীবুদ্দওলা এই ত্রিশক্তির এককভাবে সম্মুখীন হইয়াছিলেন। আহমদ শাহ আব্দালীকে ভারতাগমনের জন্য শাহ সাহেব যে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন, নজীবুদ্দওলা উক্ত ব্যাপারে শাহ সাহেবের সহচর ছিলেন এবং পানিপথের সমরক্ষেত্রে এ্যাডভান্স গার্ডের তিনিই প্রধান পরিচালক ছিলেন। আব্দালীর ভারতাগমন, নজীবুদ্দওলার সহিত তাঁহার যোগাযোগ, পানিপথের সংগ্রাম, মারহাট্টাশক্তির পতন, নজীবের আমীরুল উমারা পদে নিয়োগ সমস্তই শাহ ওলীউল্লাহর চেষ্টাতেই হইয়া ছিল। যদুনাথ সরকার লিখিয়াছেন, নজীবুদ্দওলার কোন গুণের যে সবচাইতে অধিক প্রশংসা করা যায়, একজন ঐতিহাসিকের পক্ষে তাহা নির্ণয় করা বাস্তবিক দুঃসাধ্য। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার বিস্ময়কর নেতৃত্বের, না বিপদে তাঁহার দূরদর্শিতা ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার, না তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সদগুণাবলীর, যাহার ফলে সম্পর্ণ প্রতিকুল অবস্থাও তাঁহার অনুকূল ধারণ করিত? ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর নজীবুদ্দওলা পরলোকবাসী হন- ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। [Fall of the Mughal Empire P. P. 416]

মত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হয়। এই সনে তাহারা লাহোর দখল করিয়া লয়। দাতাজী সিন্ধীয়া পাঞ্জাব অধিকার করিয়া সতাজী সিন্ধীয়াকে গভর্ণর নিযুক্ত করে অতঃপর মারহাট্টারা রোহিলাখন্ড আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। বালাজীর জ্ঞাতিভ্রাতা সদাশিব রাও ভাও ৩ লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাবহারে দিল্লী অধিকার করে। এই সদাশিবের দিল্লী লুণ্ঠনের যে বিবরণ ইতিহাসে স্থানলাভ করিয়াছে শুজাউদ্দওলার মুখ হইতে তাহা শ্রবণ করা উচিত।

مردم از دست شان بجان آمده برای پاس ناموس و آبری خود...

'জনসাধারণ মারহাট্টাদের পাশবিক অত্যাচারে ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া পড়িয়াছিল'।[৩] সিয়ারুল মুতাআখ্‌খেরীনে কথিত হইয়াছে,

دناءت و تنگ چشمی ب او باین مرتبه بود که سقف دیوان خاص را که از نقره میناکار بود کنده مسکوک ساخت وآلات طلا و نقره مزار اقدام نبوی ومقبره نظام الدین اولیاء و مرقد محمدشاه مثل عود سوز وشمع دان وقنادیل وغیره طلبیده مسکوک نمود–

"বাহাও এরূপ পিশাচ ও অর্থগৃধ্ণু ছিল যে, দিল্লীর "দিওয়ানে খাসের" ছাদে স্বর্ণ ও রৌপ্য মন্ডিত যে সকল কারুকার্য ছিল সেগুলি উপড়াইয়া আর "কদমে রসূল" নিজামুদ্দীন আওলিয়া ও মুহাম্মদ শাহ প্রভৃতি রাজপুরুষ ও সাধুসজ্জনদের সমাধিতে যেসকল স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈজসপত্র শামাদান, ঝাড়, ফানুস আর সুগন্ধি জ্বালাইবার পাত্র ছিল, সমস্তই গলাইয়া লইয়াছিল।"[৪] শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস বলিয়াছেন, প্রথমে নাদির শাহ পরে মারহাট্টা ও জাঠদের বিরামহীন লুণ্ঠন, শোষণ আর অত্যাচার ও পীড়নের ফলে শেষ পর্যন্ত দিল্লীর নাগরিকরা স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের লইয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে ঝাপাইয়া পড়িয়া ভস্মীভূত হইবার সংকল্প করিয়াছিল।[৫]

ভারতের রাষ্ট্রীয় পতনযুগের এই নিদারুণ সন্ধিক্ষণে দিল্লীর মুগলসাম্রাজ্য যখন বালকদের হস্তের ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছিল, ঘরে-বাহিরে সর্বত্র স্বার্থলোলুপতার ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার হইয়া পড়িয়াছিল, জনগণের মধ্যে নৈরাশ্য ও মানসিক দীনতা গোটা সমাজকে স্থবির ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিয়া ফেলিয়াছিল, শাসকগোষ্ঠী বিলাসব্যসনে ও আমোদ-প্রমোদে আকণ্ঠ ডুবিয়া কাপুরুষতার চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিল, আমীর-উমারা ও সেনানায়করা দলাদলির বিষ ছড়াইয়া রাজ প্রসাদ হইতে রাস্তাঘাট পর্যন্ত কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল, সামরিক বাহিনী বিশৃংখল ও বিশ্বাসঘাতক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অপদার্থ বাদশাহরা শত্রুদের প্রতিরোধ করিতে অক্ষম হইয়া টাকার বিনিময়ে তাহাদের নিকট হইতে সন্ধি ক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে দিল্লীর এক মহাপ্রজ্ঞাবান আলিম, যিনি সচরাচর একজন মুহাদ্দিস, সুফী ও সমাজ সংস্কারকরূপে আখ্যাত হইয়া থাকেন, জাতির রক্ষাকল্পে আর মুসলমানদের রাজ্যকে মারাঠা, জাঠ ও শিখ আততায়ী দস্যুদের কবল হইতে পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে আগাইয়া আসিয়াছিলেন।

তিনি সেই সংকট মুহূর্তে যে অতুলনীয় ও কুশাগ্র রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, আযাদ পাকিস্তানের নাগরিকদের পক্ষে তাহার কথা বিস্মৃত হওয়া অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। পাকিস্তানের যে প্রথম মহান নেতার কথা আমরা বলিতে চাই, তিনি হইলেন ভুবনবিখ্যাত বিদ্বান, মহাযশস্বী দার্শনিক, মুহাদ্দিস ও অর্থনীতিবিশারদ শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রহঃ)। আমরা তৎকালীন ধর্মীয় ও নৈতিক পতনের কাহিনী এবং এ বিষয়ে হযরত শাহ সাহেবের সংস্কার আন্দোলনের বিবরণ এই নিবন্ধে আলোচনা করিব না। শুধু তাঁহার

৩. বাঙলার কবি গঙ্গারাম এই মারহাট্টা কুক্কুরদের পাশবিক অত্যাচারের যে ভয়াবহ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, ড. যদুনাথ সরকার তাঁহার Fall of the Mughal Empire গ্রন্থে তাহা উধৃত করিয়াছেন। কবি লিখিয়াছেন, বর্গীরা গ্রামাঞ্চলে লুটতারাজ শুরু করিরা দেয়। তাহারা লোকদের নাসিকা ও কর্ণ আর হস্ত ছেদন করিতে থাকে। সুন্দরী রমণীদের তাহারা দড়িতে বাঁধিয়া লইয়া যায়। এক বর্গী এক রমণীর সহিত বলাৎকার করার পর অপরাপর বর্গীরা তাহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে বলাৎকার করিতে থাকে আর অসহায়া নারীর হৃদয়বিদারক চীৎকারে আকাশ কম্পিত হয়। তাহারা গৃহস্থদের বাড়ীঘর জ্বালাইয়া দেয় আর এইভাবে বাংলাদেশের সর্বত্র লুঠমার করিয়া বেড়াইতে থাকে। V. I. P. P. 89

৪. ১১২ পৃ.

৫. মালফুযতে শাহ আব্দুল আযীয।

রাজনৈতিক তৎপরতার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

মুগলগৌরব সম্রাট আলমগীর ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ওফাতের ৫ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে (১১১৩ হিঃ) শাহ ওলীউল্লাহ জন্মগ্রহণ করিয়া শাহ আলম বাদশাহর রাজত্বের ৭ম বর্ষে আর পলাশীযুদ্ধের ৮ বৎসর পর ১৭৬৫ সনে জান্নাতবাসী হন। শাহ সাহেব তাঁহার জীবদ্দশায় দিল্লীর সিংহাসনে বার জন বাদশাহকে উপবেশন করিতে দেখিয়াছিলেন। যথা- আলমগীর, বাহাদুর শাহ, জাঁহাদার শাহ, ফররুখসিয়র, নেকোসিয়র, রফীউদ্দরজাত, মুহাম্মদ শাহ, মুহাম্মদ ইব্রাহীম, আহমদ শাহ, দ্বিতীয় আলমগীর ও শাহ আলম। মোটের উপর শাহ সাহেব মুগল সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত ও সর্বাপেক্ষা অধঃপতিত যুগদ্বয়ের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। মুগল সাম্রাজ্যের পতন ও সামাজিক দুরাবস্থার তিনি ভিন্ন ভিন্ন কারণ নিরূপিত করিয়াছেন। ধর্মীয় মতবাদ ও আচারব্যবহারে মুসলমানদের অবহেলা আর ধর্মীয় শিক্ষার অভাবকে তিনি সামাজিক দুরাবস্তার মূল কারণ আর অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে মুগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য তিনি দায়ী স্থির করিয়াছিলেন। এসকল বিষয়ে তিনি তাহার জগতবরেণ্য "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা" "তাফহীমাতে ইলাহিয়া" প্রভৃতি গ্রন্থে পুংখানুপুংখ আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি "হুজ্জাতুল্লাহ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "দেশের বর্তমান র্দুগতি ও অধঃপতনের প্রধান কারণ দুইটি : প্রথমতঃ রাষ্ট্রের কোষাগারে অর্থের অভাব। লোকদের বিনা পরিশ্রমে সৈন্য বা বিদ্বান হইবার দাবীতে সরকারী কোষাগার হইতে অর্থসংগ্রহ করার অভ্যাস। বাদশাহদের অনর্থক পুরস্কার ও বৃত্তি দেওয়ার রীতি; সুফী, দরবেশ ও কবিদের ওযীফা। রাষ্ট্রের কোন সেবা না করিয়াই ইহারা সরকারী কোষাগার হইতে জীবিকা সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীটি নিজেদের আর অন্যদের উপার্জনের পথ সংকুচিত করিয়া ফেলিয়াছে। আর দেশবাসীর ঘাড়ে বোঝা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"দ্বিতীয় কারণ, কৃষিজীবী, শিল্পী আর ব্যবসায়ীদের উপর গুরুভার ট্যাক্স আরোপ আর কঠোর উপায়ে সেই ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা। ইহার ফলে যাহারা রাষ্ট্রের অনুগত প্রজা, তাহারা সরকারী নির্দেশ পালন করিতে গিয়া সর্বস্বান্ত হইতেছে আর অবাধ্য বাকীদাররা অধিকতর অবাধ্য হইয়া পড়িতেছে আর বাকীর পরিমাণও বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দেশের সুখশান্তি আর রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে হালকা ট্যাক্স-ব্যবস্থার উপর, আর যে পরিমাণ সৈন্য ও সরকারী র্কমচারী না রাখিলে নয়, কেবল সেই পরিমাণ সৈন্য ও সরকারী কর্মচারী নিয়োগ-ব্যবস্থার উপর। রাজনৈতিক নেতাদের এই বিষয়গুলি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।"

শাহ সাহেব মুগল সাম্রাজ্যের পতনের ৫টি কারণ নির্ণয় করিয়াছিলেন।[৬] মুগল রাজত্বের পতনের যেসব কারণ দিল্লীর রহীমিয়া মাদরাসার উস্তায নির্ণয় করিয়াছিলেন, আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের অর্থবিশারদরা আজ দুইশত বৎসর পরও সেগুলির কোন একটি দফারও সংশোধন করিতে পারেন নাই। জাতীয় উত্থান ও পতনের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করিতে গিয়া শাহ সাহেব তাঁহার অমর গ্রন্থে যে বিস্তারিত ও বিস্ময়কর মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সার এই যে, "কোন জাতির তমুদ্দনিক প্রগতি অবিচলিত থাকিলে তাহাদের শিল্প আর কারিগরীও উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে বাধ্য। কিন্তু শাসকগোষ্ঠি সুখ সম্ভোগ, বিলাসপরায়ণতা আর বাগাড়ম্বরে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে তাহাদের সমস্ত বোঝা শিল্পী, কৃষক আর কারিগরদের স্কন্ধেই পতিত হয়। ইহার ফলে সমাজের বৃহত্তর দল পশুর মত জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। জনগণকে অর্থনৈতিক সংকটে যবরদস্তীভাবে নিক্ষেপ করিলে তাহারা গরু-গাধার মত কেবল রুটি উপার্জনের জন্যই পরিশ্রম করিতে থাকিবে। দেশবাসী এরূপ দুরবস্থার সম্মুখীন হইলে তাহাদের উদ্ধারকল্পে আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান সমাজের স্কন্ধ হইতে এই অবৈধ শাসনের বোঝা অপসারিত করার জন্য বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়"[৭]

শাহ ওলীউল্লাহর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতবাদে এক বিরাট বাহিনী তাঁহার জীবদ্দশাতেই দীক্ষিত হইয়াছিল।

৬. সরকারি ভূমির অপর্যাপ্ততা; ২. রাজস্বের স্বল্পতা; ৩. জায়গীরদারদের প্রাচুর্য; ৪. ইজারাদারির কুফল; ৫. সৈন্যদের প্রাপ্য নিয়মিতভাবে পরিশোধ না করা।

৭. হুজ্জাতুল্লাহ. ২০৮ ও ২৯২ পৃ.

শাহ আলম বাদশাহকে তিনি যে সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও তাহার গঠনমূলক পরিকল্পনাগুলির সুসম্পন্ন ইংগিত রহিয়াছে। শাহ সাহেব মুগল শাসকগোষ্ঠির প্রতি কোনদিন শ্রদ্ধাশীল ছিলেননা। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, অনতিকাল মধ্যেই মুগল সাম্রাজ্য উপমহাদেশ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু মুগলদের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে মুসলমানদের অস্তিত্বও চিরতরে নির্মূল হইয়া যাউক আর ভারত উপমহাদেশে হিন্দু, জাঠ, মারাঠা আর শিখদের রাজত্ব স্থাপিত হউক, ইসলামি তমদ্দুন, মতবাদ আর ধর্ম ভারতের বুক হইতে নির্বাসিত হইয়া পড়ুক, জাতির এই মহান নেতা তাহা বরদাশত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মুগল বাদশাহ শাহ আলমকে তিনি পুনঃপুনঃ হুঁশিয়ার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে তিনি উত্থান করেন নাই। কারণ তাহাতে বিভ্রাটের মাত্রাই শুধু বর্ধিত হইতনা, ইহার ফলে শত্রুপক্ষরাও সুবিধা ও প্রশ্রয় লাভ করিত। তাহারা শুধু মুগলদের বিরুদ্ধেই সমরসজ্জা করিয়া ক্ষান্ত থাকে নাই, পাঞ্জাবের শিখরা সমুদয় মুসলমানের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। আততায়ীদের অত্যাচারে নিস্পেষিত দিল্লীর নিরপরাধ আবালবৃদ্ধবনিতার করুণ ক্রন্দনে শাহ সাহেব অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন বটে, কিন্তু দিশাহারা হন নাই। তাই সকল কাজ পরিহার করিয়া তিনি সর্বাগ্রে দৃঢ়হস্তে মারহাট্টা আততায়ীদের দমন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শাহ সাহেব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মারহাট্টাদিগকে বিতাড়িত আর দেশকে তাহাদের প্রভাব হইতে মুক্ত করা মুগল বাদশাহদের সাধ্যায়ত নয়। দেশের ভিতরেও এই দুঃসাধ্য কার্য সমাধা করার যোগ্য কোন শক্তিমান পুরুষ ছিলনা। মুগল উমারা আর সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করারও কোন উপায় ছিলনা। এইরূপ সংগীন পরিস্থিতিতেও শাহ ওলীউল্লাহ দমিয়া না গিয়া মারহাট্টা ও জাঠদের বিরুদ্ধে জনমত কেন্দ্রীভূত করার জন্য তাঁহার ছাত্র ও ভক্ত-অনুরক্তগণের শক্তিশালী একটি জোট গঠন করিয়া ফেলিলেন। ইহাদের মধ্যে নওয়াব নজীবুদ্দওলা, সাআদুল্লাহ খান, হাফেয রহমতুল্লাহ, আহমদ খান বঙ্গশ, নওয়াব মজদুদ্দওলা, মওলানা সৈয়দ আহমদ, ছন্দী খান, নজীব খান, সৈয়দ মা'সূম, আবদুস্‌সত্তার খান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে নওয়াব নজীবুদ্দওলা সম্বন্ধে ডক্টর যদুনাথ সরকার মন্তব্য করিয়াছেন, স্বয়ং আহমদ শাহ আব্দালী ছাড়া সে যুগে নজীবুদ্দওলার সমকক্ষ কেহই ছিলনা। He had no equal in that age except Ahmad Shah Abdali[৮] সাহেবের নির্দেশ ও উৎসাহ ক্রমেই এই নজীবুদ্দওলা দিল্লীতে সর্বপ্রথম রঘুনাথরাও এর প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। শাহ সাহেবের সহচরবৃন্দের বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংকলিত হওয়া আবশ্যক।

মোটের উপর আভ্যন্তরীণভাবে সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া ফেলার পর শাহ ছাহেব মারহাট্টাদের দমন করার জন্য আহমদ শাহ আব্দালীকে আমন্ত্রিত করেন। ধর্মপরায়ণতায়, নৈতিক বলে আর সামরিক নৈপূণ্যে ও বীরত্বে তৎকালে জাহানে ইসলামে আব্দালী অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন। আব্দালী ইতিপূর্বে যথাক্রমে ১৭৪৭, ১৭৫০, ও ১৭৫২ সনে ৪ বার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু ১৭৫৭ আর ১৭৫৯ সনে তিনি আমন্ত্রিত হইয়াই ভারতে প্রবেশ করেন। শাহ সাহেব আহমদ শাহ আব্দালীকে যে সুদীর্ঘ "দাওয়াতনামা" প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার একস্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন,

"হিন্দে কাফেরদের প্রাদুর্ভাব আর অত্যাচার আর মুসলমানদের অসহায় অবস্থার বিবরণ লিখিত হইল। বর্তমানে আপনি ব্যতীত এমন কোন ক্ষমতাশালী ও প্রভাবান্বিত নরপতি নাই, যিনি স্বীয় সামরিক বলবিক্রম, বুদ্ধি-কৌশল ও দূরদর্শিতা দ্বারা শত্রুদলকে পরাভূত করিতে পারেন। অতএব এবিষয়ে ইহা সুনিশ্চিত যে, আপনার পক্ষে হিন্দে অগ্রসর হইয়া মারহাট্টাদের শক্তিকে চূর্ণ আর অসহায় মুসলিমদিগকে কাফেরদের কবল হইতে উদ্ধার করা "আইনী ফরয" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নতুবা আল্লাহ না করুন অবস্থার গতি যদি অপরিবর্তিতই

৮. *Fall of the Mughal Emp Vol, ii P.P 4/5*

থাকিয়া যায় তাহা হইলে অনতিকাল মধ্যেই এদেশে মুসলমানরা ইসলামকে ভুলিয়া যাইবে"।

শাহ সাহেবের অতুলনীয় সাংগঠনিক প্রতিভার প্রমাণ এই যে, আহমদ শাহ আব্দালীর বিরুদ্ধে বাহাও অযোধ্যার অধিপতি সফদর জঙ্গের পুত্র শুজাউদ্দওলাকে আপন দলে ভিড়াইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ব্যর্থকাম হইয়াছিল। 'মুতাআখ্‌খিরীনে'র সংকলয়িতা শুজাউদ্দওলার উক্তি উধৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন,

"দীর্ঘকাল হইতে দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণরা হিন্দ ভূমিতে জবর দখল করিয়া রহিয়াছে। তাহাদের সীমাহীন লোভ, বিশ্বাসঘাতকতা আর কটুক্তির ফলে আহমদ শাহ আব্দালীর বিপদ তাহাদের মস্তকে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহারা জনগণের ইয্যত, আব্রু, সুখ-শান্তি আর মর্যাদার কোন পরওয়াই রাখেনা, তাহারা সমস্তই নিজেদের আর স্বীয় জাত ভাইদের জন্য গ্রাস করিয়া রাখিতে চায়। জনগণ ইহাদের আচরণে ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া নিজেদের রক্ষা করার মানসে আর কতকটা সুখ-শান্তিলাভের আশায় বহু অনুরোধ-উপরোধ করিয়া শাহ আব্দালীকে আহবান করি আনিয়াছে। আব্দালীর আক্রমণের ক্ষতিকে মারহাট্টাদের অত্যাচারের তুলনায় তাহারা লঘু মনে করিয়াছে। অতএব এখন সন্ধির কথা উঠিতেই পারেনা"।[৯]

আহমদ শাহ আব্দালীর অভিযান : শাহ সাহেব যে উদ্দেশ্যে আব্দালীকে আমন্ত্রিত করিয়াছিলেন, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার নির্বাচন কিরূপ অভ্রান্ত ছিল, এইবারে আমরা তাহা উল্লেখ করিব। সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরও আব্দালীর সহিত পত্রব্যবহার করিতেন আর গোপনে তিনিও শাহ সাহেবের প্রধান বাহু নজীবুদ্দওলার শুভানুধ্যায়ী ছিলেন বলিয়া "মুতাআখ্‌খিরীনে" উল্লিখিত রহিয়াছে।[১০] আমরা সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে আহমদ শাহ আব্দালীর ৫ম ও ৬ষ্ঠ অভিযানের কাহিনী একসঙ্গেই বর্ণনা করিব।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে আহমদ শাহ আব্দালী রাজপুতানা আক্রমণ করিয়া সরহিন্দ হইতে মারহাট্টাদিগকে বিতাড়িত করেন। এই স্থানে তাহারা মুসলমানদের অনেকগুলি মসজিদ ও সাধুসজ্জনদের সমাধি বিধ্বস্ত করিয়াছিল। দাতা সিন্ধিয়া দিল্লীর উপকণ্ঠে বাউলী প্রান্তরে উপস্থিত হয়। আহমদ শাহও যমুনা পার হইয়া থানেশ্বরে দাতাজী সিন্ধিয়ার সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করেন। এই যুদ্ধে দিল্লীর ১০ মাইল দূরবর্তী বিরারী ঘাটে দাতাজী সিন্ধিয়া নিহত হয়। রাও হোলকারকে শায়েস্তা করার জন্য আব্দালী শাহ পছন্দ খান ও শাহ কলন্দর খানকে ১৫ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। তাঁহারা নারনোলের পথে একদিন ও এক রাত্রিতে ৭০ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া দিল্লী পৌঁছেন। তথায় একদিন বিশ্রাম করিয়া তাঁহারা রাত্রিযোগে যমুনা পড়ি দেন এবং প্রত্যুষে আকস্মিকভাবে রাও হোলকারের সৈন্যদলের উপর পতিত হন। হোলকার মাত্র ৩ শত সৈন্য লইয়া পলায়ন করে, অবশিষ্ট সমুদয় সৈন্য বিনষ্ট হয়।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে দিল্লী হইতে মারহাট্টাদের বহিষ্কারের উদ্দেশ্যে আহমদ শাহ আব্দালী লাহোর হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থানে উপস্থিত হওয়ামাত্র সাআদুল্লাহ খান নজীবুদ্দওলা, আহমদ জঙ্গ, হাফেয রহমত খান ও দুন্দীখান আব্দালীর সহিত মিলিত হন।[১১] কেহ কেহ বলেন, আব্দালী নজীবুদ্দওলা ও শুজাউদ্দওলার সঙ্গেই যাত্রা করিয়াছিলেন। নজীবুদ্দওলার কুটনৈতিক ব্যবস্থার ফলেই অযোধ্যার যুবরাজের সহিত আব্দালীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। ভরা বর্ষায় যমুনা পাড়ি দিয়া আব্দালী তদীয় বাহিনীসহ দিল্লী উপস্থিত হন।

সদাশিব রাও বালাজীর পুত্র বিশ্বাস রাওকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া ভারতে মুগল রাজত্বের অবসান আর মারহাট্টা ব্রাহ্মণদের রাজত্বের অভিষেক ঘোষণা করার পাঁয়তারা করিতেছিল, ঠিক এমনি সময়ে আহমদ শাহ আব্দালীর এই অপ্রত্যাশিত অভিযানে প্রথমতঃ সে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, তারপর হিন্দু রাজত্ব ঘোষণার পূর্বে

৯. ৯১২ পৃ.
১০.. ৯০৮ পৃ.
১১. মুতাআখখিরীন, ৯১০ পৃ.

আব্দালীকে বিধ্বস্ত করা সমীচীন মনে করিয়া ইহার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। এই উদ্দেশ্যে সদাশিব রাও ভাও ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবরে পানিপথে ৩ লক্ষ সৈন্য সন্নিবেশিত করে। তাহার সহিত জনৈক ভূতপূর্ব ফরাসী সেনাধ্যক্ষ গার্দীও ১২ হাজার বন্দুক ও তোপসহ যোগদান করিয়াছিল।

আব্দালী সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের বর্ণনাসুত্রে ১ লক্ষের অধিক ছিল না। তিনি দিল্লী হইতে ৩০টি কামান আর কয়েকটি প্রাচীরভেদী যন্ত্রও হস্তগত করিয়াছিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের পহেলা নভেম্বরে আহমদ শাহ পানিপথে উপস্থিত হন। আড়াই মাস ধরিয়া পানিপথে মারহাট্টাদের সহিত বিরামহীন যুদ্ধ চলিতে থাকে। অ্যাডভান্স গার্ডসের অধিনায়ক রূপে প্রথম সারিতে জাহান খান, শাহপছন্দ খান ও নজীবুদ্দওলা, তাঁহাদের পশ্চাতে অযোধ্যার যুবরাজ শুজাউদ্দওলা (সফ্দরজঙ্গের পুত্র), আহমদ খান বঙ্গশ, হাফেয রহমতুল্লাহ, দুন্দীখান, আলী মুহাম্মদ রোহিলার পুত্র ফয়েযুল্লাহ খান, তাঁহাদের পশ্চাতে শাহওলীখান ওযীরসহ স্বয়ং আহমদ শাহ আব্দালীকে লইয়া মুসলিম বাহিনী সজ্জিত হইয়াছিল। যোহরের নমায পড়ার পর আব্দালী যুদ্ধ আরম্ভ করেন। সূর্যাস্তের ঘণ্টাখানিক পূর্বেই নজীবুদ্দওলা ১০ হাজার রোহিলা পদাতিক সমভিব্যাহারে মারহাট্টাদের তোপখানা কাড়িয়া লয়। সদাশিবের শ্বশুর বলবন্ত রাও গুলির আঘাতে নিহত হয়।
দীর্ঘকাল অবরোধ অবস্থায় থাকার ফলে মারহাট্টাদের মধ্যে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। অবশেষে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী (৬ই জমাদিস্‌সানী ১১৭৪ হিঃ) মারহাট্টারা "হর, হর, বোম" চীৎকারে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে কিন্তু শুজাউদদ্দওলা ও নজীবুদ্দওলা সিংহবিক্রমে তাহাদিগকে ভুশায়ী করিয়া ফেলেন। বালাজীর পুত্র বিশ্বাস রাও (যাহাকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল) আর প্রধান সেনাপতি সদাশিব রাও ভাও এবং প্রায় ২ লক্ষ মারহাট্টা সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হয়। চক্ষের নিমিষে মারহাট্টাদের বিক্রম কর্পূরের মত উড়িয়া যায়। স্যার যদুনাথ সরকার দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, মহারাষ্ট্রে এমন কোন পরিবার ছিলনা যাহার গৃহে ক্রনদনের রোল উত্থিত হয়নাই। নেতাদের একটি পূর্ণ পিঁড়ি এক যুদ্ধেই নিঃশেষিত হইয়াছিল। ফরাসী কম্যান্ডাগার্দী আর জানকী সিন্ধিয়া কোর্টমার্শালে মৃত্যুদন্ড পায়। মূহলর রাও হোলকার আর নানাফণবীশ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। পলাতক মারহাট্টা সৈন্যের অধিকাংশ, মারহাট্টাদের অত্যাচারে সর্বস্বান্ত কৃষকদের হস্তে নানাস্থানে নিহত হয়। ইহার ৫ মাস পর বালাজীরাও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহার পর ভারত ভূমিতে ব্রাহ্মণতন্ত্র আর হিন্দুরাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হইয়া যায়।

শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী পানিপথে যে সমরাঙ্গন সজ্জিত করিয়াছিলেন, তাহার পরিণতি স্বরূপ ভারতে ইসলামী রাজত্বের সংস্কার ও প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কার্যতঃ মুগলদের ভিতর কোন শক্তি বিদ্যমান না থাকায় বিশেষতঃ ইহার পরেই শিখ আর জাঠদের ষড়যন্ত্র বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছু করা সম্ভবপর হয়নাই। শিখদের নবম গুরু তেগবাহাদুরের মুসলিমবিদ্বেষ অতঃপর বীভৎসমূর্তি ধারণ করে। মারহাট্টাদের পতনের পর পরেই ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে শিখরা পুনরায় লাহোর দখল করিয়া বসে। তাহারা সরহিন্দে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানীর জন্মভূমি ও সাধু-তাপসগণের সমাধি ধ্বংস্তূপে পরিণত করে। পানিপথের পরবর্তী বৎসর ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে আলাজাঠ নামক জনৈক দস্যু সরদার দিল্লী আক্রমণ করার জন্য ২ লক্ষ সৈন্য সন্নিবেশিত করে। ঠিক এই সময়ে হযরত শাহ সাহেবের নিকট তাঁহার প্রভুর আহবান আসিয়া পড়ে। তিনি তাঁহার আরব্ধ কার্য অসমাপ্ত রাখিয়াই ১১৭৬ হিজরীতে পরলোকের যাত্রী হন। কিন্তু যাহা তিনি অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার ছাত্র, পুত্র ও পৌত্রগণ তাহা সমাপ্ত করার জন্য উত্তরকালে তাঁহাদের মস্তক উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত ইসলামি রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আল্লাহর অভিপ্রায়ে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর হস্তেই বাস্তবায়িত হইয়াছিল।

সংগৃহীত : তর্জুমানুল হাদীস, অষ্টম বর্ষ-দ্বাদশ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৫৯।

জাগো, হে নয়া জামানার শার্দূল!

অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম
সাবেক সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ ও নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

বিশ্ব আজ এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। নতুন বিশ্বব্যবস্থা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে সবাইকে। যতই ক্ষমতাশালী হোক না কেন কেউ এই বিশ্বব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারছে না। অন্যভাবে বলা যায়, আখেরি জামানার এক নয়া অধ্যায় শুরু হয়েছে। এ সময় এক দিকে নতুন নতুন সমস্যা আবির্ভূত হচ্ছে। অন্য দিকে, পুরনো ফিতনাগুলোও নতুন রূপে বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, এমনকি শিক্ষা ক্ষেত্রেও বস্তুবাদী চিন্তার ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। অবশ্য এ রকম সমস্যা সব যুগেই কমবেশি ছিল। কিন্তু এখন আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে, আমরা যারা মুসলিম হিসেবে পরিচিত তারা এ বিষয়ে অতীতের মতো আশানুরূপ উদ্বিগ্ন নই। সক্রিয় নই। আমরা অধিকাংশই অসতর্ক, অসচেতন, নিদ্রাচ্ছন্ন। আয়েশি জীবনের দাসপার্থিব সমৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় বস্তুবাদের মায়াজালে জাদুগ্রস্ত। সবই দেখছি, শুনছি, কিন্তু সক্রিয় ভূমিকা পালনে আগ্রহী নই। কথাগুলো কি একটু কঠিন শোনালো? সবাই একমত না হলেও বাস্তবতা অনেকটা এ রকমই। কবি ফররুখ আহমদ তার পাঞ্জেরী কবিতায় এ অবস্থাটিই তুলে ধরেছেন,

শুধু গাফলতে শুধু খেয়ালের ভুলে,
দরিয়া-অথই ভ্রান্তি-নিয়াছি তুলে,
আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী।
মোদের খেলায় ধুলায় লুটায়ে পড়ি।
কেটেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্বরী।
সওদাগরের দল মাঝে মোরা ওঠায়েছি আহাজারি,
ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দনধ্বনি আওয়াজ শুনছি তারি।

বিশ্ব রাজনীতির কথাই ভাবুন। ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, চীনের উইঘুর, আরাকান, চেচনিয়া, বসনিয়া, ইয়েমেন, সিরিয়া, ইরান, ইরাক, কুয়েত, লেবানন-এ রকম কত ইস্যুই তো আমরা দেখলাম। মুসলিমদের উপর নির্যাতনের একের পর এক ভয়াবহ রেকর্ড তৈরি হয়েছে। মানবতার চূড়ান্ত পরাজয় হয়েছে। প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রতিবাদ হয়েছে দেশে দেশে। রাস্তায় নেমেছে সাধারণ মানুষ। সালাতে, মুনাজাতে, দুয়া কুনূতে তারা কেঁদেছে। জনমত গঠনে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে। কিন্তু এসব অশান্তি অবসানে ১৫৭টি মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধানদের ভূমিকা কতটা দৃশ্যমান ছিল? ইদানিং ইরান বা তুরস্কের মতো কেউ কেউ চড়া গলায় কথা বললেও বিশ্বাসযোগ্য এবং টেকসই কোন কর্মসূচী চোখে পড়েনি। কারণ মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের জন্য নয়, বরং নিজের স্বার্থে যুদ্ধ কিংবা পররাষ্ট্র নীতি অবলম্বন করছে তারা। এ কারণে দেখা যায়, মুসলিমদের হত্যাকারী ইজরাইল, চীন, রাশিয়া বা ভারতের সাথেও জোট করতে, বাণিজ্য করতে তাদের আগ্রহের অভাব নেই। আর এ পথে চলতে চলতে কখন যে তারা অমুসলিমদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে ফেলেছেন, তা টেরও পাচ্ছেন না,

যদিও মহান আল্লাহ বলেছেন,

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ

"মুমিনরা যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধু (ঘনিষ্ঠ সহচর বা অভিভাবক) হিসেবে গ্রহণ না করে। আর যারা এটা করবে, তারা আল্লাহর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না-তবে যদি তোমরা তাদের থেকে কোনো ভয় বা আশঙ্কা করো (তবে তা ভিন্ন বিষয়)। আল্লাহ নিজ থেকে তোমাদের সতর্ক করছেন, আর আল্লাহর দিকেই (তোমাদের) প্রত্যাবর্তন।"[১]

এ আয়াতে মুসলিম উম্মাহর বাস্তব চিত্রই ফুটে ওঠেছে। ইসলাম বিরোধী শক্তির ভয়ে মুসলিম বিশ্ব আজ বন্ধুত্ব নয়, বরং আরও দুর্বল অবস্থানে নেমে গিয়ে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছে। আর এ পরাজয় শুধু রাজনৈতিক বা সামরিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়; শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, বাণিজ্য, দর্শন-চিন্তা, আকীদা-আমল ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে পড়েছে। মজলুম মুসলিমদের কাছে খাদ্য বা মানবিক সাহায্য পাঠাবার সাহসটকুও আর অবশিষ্ট নেই আমাদের। ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, আরাকান আজ এ ট্রাজেডিরই সাক্ষ্য বহন করছে।

এই দূরবস্থার কারণ কী? আমেরিকা বা মার্কিন বলয়, এমনকি চীনও মুসলিম উম্মাহ বা সভ্যতার বিজয় কখনও মেনে নেয়নি। মেনে নেবেও না কোনো দিন। অতীতের যুদ্ধ-বিগ্রহগুলো এ ক্ষেত্রে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী Samuel P. Huntington-র ভাষায় এ হচ্ছে Clash of Civilization (সভ্যতার দ্বন্দ্ব)। ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে দ্বান্দ্বিক বলয় তৈরি হয়েছে। জন্ম হয়েছে সমমনা বিভিন্ন দেশের আঞ্চলিক জোট। মুসলিম বিশ্ব এ ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে অনেক পেছনে। শিক্ষা-গবেষণা , অর্থনীতি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, প্রচার-মিডিয়া ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই আমরা দুর্বল। আখিরাতের সাফল্যের লক্ষ্যে দুনিয়াকে পরাভূত করার জন্য ঈমান এবং ইখলাসপূর্ণ যে সতর্ক উদ্যোগ প্রয়োজন, তা আমাদের মাঝে অনুপস্থিত। ব্যক্তিগত উন্নতির পাশাপাশি সমাজ, দেশ আর উম্মাহর জন্য নিজেকে যোগ্য খাদেম বা নেতা হিসেবে গড়ে তোলার, নিজেকে আল্লাহর পথে কুরবান করার লক্ষ্য থেকে আমরা দূরে সরে গিয়েছি। নিজের ক্যারিয়ার, পরিবারের পার্থিব উন্নতি, আর আয়েশি জীবনের জন্য বাড়ি-গাড়ি, ধন-সম্পদের পেছনে আমরা পুরো দিনটাই ব্যয় করছি। অথচ সমাজ বা উম্মাহর জন্য সময় বা অর্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করা ছাড়া আমাদের এ অচলাবস্থার অবসানের উপায় নেই। এ কারণে আমাদের সালাফে সালেহীন সমাজ বা রাষ্ট্র সংস্কারের এ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে করেছিলেন। ফলে তারা ভাল জেনারেশন তৈরি করতে পেরেছিলেন। সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। কারণ তারা আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনের এ আদেশের প্রতি অনুগত ছিলেন,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

-"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং মন্দ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।"[২]

সুপ্রিয় শুব্বান ভাইয়েরা, পৃথিবীতে আমরা দায়িত্বশীল সৃষ্টি। আমরা যদি আমাদের সময় এবং অর্থের একটি অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় না করি তাহলে মুসলিম সমাজেই ইসলাম থাকবে না। শিরক-বিদ'আতের বন্যায় তলিয়ে যাবে তাওহীদ এবং সুন্নাহর চেতনা। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, জাতীয়তাবাদের আঘাতে

১. *সূরা আলে ইমরান, ৩ : ২৮*
২. *সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০৪*

খিলাফত আজ বিলুপ্ত। দেশভিত্তিক বিবাদে উম্মাহ ক্ষতবিক্ষত। গণতন্ত্রের ব্যক্তিকেন্দ্রিক চেতনার চাপে সামাজিক ঐক্য আজ দূরীভূত। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বেড়ে চলছে ধর্মনিরপেক্ষতা। এ যেন কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রের নাস্তিক্যবাদের নয়া রূপ। এর বাইরে খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্মান্তর কর্মসূচী, ইয়াহুদীদের হত্যাযজ্ঞ এবং ষড়যন্ত্র, পশ্চিমা এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক আগ্রাসনের শিকার আজ শান্তিকামী মানুষ। পারিবারিক বন্ধন ক্রমশ ভেঙ্গে পড়ছে। যুবসমাজের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে মাদকাশক্তি, ধর্মবিমুখতা, বেকারত্ব, হতাশা, লক্ষ্যহীনতা। এ যেন ইসলামী মূল্যবোধের বিরুদ্ধে শয়তানী শক্তির নিরব যুদ্ধ। সর্বাত্মক সংগ্রাম। এ জিহাদে বিজয় লাভের জন্য আমাদের প্রয়োজন আজীবন জিহাদের আপোষহীন মুজাহিদ; যারা হাশরের ময়দানে আল্লাহর আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাওয়ার আশা রাখে। আমরা আশা করি, শুব্বান হবে নতুন প্রযুক্তির নয়া জামানার সমাজ এবং রাষ্ট্র সংস্কারের সেই মুজাহিদ। আসাদুল্লাহ এবং আসাদুর রাসূলের সাহস এবং উদ্দীপনা নিয়ে তারা এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে। জুলাই বিপ্লব- ২০২৪ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে যে সম্ভানার সুযোগ নিয়ে এসেছে, যে নতুন ভোরের সূত্রপাত করেছে, তা কাজে লাগিয়ে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে সর্বাত্মক প্রয়াস চালাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন আমাদের সকল প্রচেষ্টায় বারাকাহ দান করুন। আমীন।

দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।
তবু জাগলে না? তবু, তুমি জাগলে না?
সাত সাগরের মাঝি চেয়ে দেখো দুয়ারে ডাকে জাহাজ,
অচল ছবি সে, তসবির যেন দাঁড়ায়ে রয়েছে আজ।
হালে পানি নাই, পাল তার ওড়ে নাকো,
হে নাবিক! তুমি মিনতি আমার রাখো;
তুমি ওঠে এসো, তুমি ওঠে এসো মাঝি মাল্লার দলে
দেখবে তোমার কিশতি আবার ভেসেছে সাগর জলে,

“দেশ জাতি গঠনে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর করণীয়”

ড. আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকি
আল কোরআন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

শুব্বান (شُبَّان) শাব্বুন (شاب) এর বহুবচন। অর্থ যুবক। আল কুরআন ও হাদীসে যুবকদের করণীয়, তাদের মর্যাদা সম্পর্কে অনেক বিষয় রয়েছে। হাশরের দিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। সেদিন এ ছায়ার নিচে সাত শ্রেণীর মানুষ আশ্রয় পাবে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, وشاب نشأ في عبادة الله-যে যুবক তার যৌবনে আল্লাহর এবাদতে মশগুল ছিল। তার মানে এই সাত শ্রেণীর এক শ্রেণী হলো যুবকদল। বাংলাদেশের লোক সংখ্যা ১৭ কোটি। বিভিন্ন বর্ণনা মতে আহলে হাদীসের সংখ্যা বাংলাদেশে কমবেশি ৪ কোটি। অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যার ৪ এর ১ ভাগ। চার কোটির মধ্যে প্রায় দেড় কোটিই হবে যুবক। দেশের এত বড় জনশক্তি একটি সংগঠনের জন্য অনেক বড় বিষয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও এটি সত্য যে, এত বড় একটি সংগঠনের মধ্যে দেশ জাতির পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য কোনো লোক নেই। অথচ অনুপাত অনুসারে দেশের প্রশাসন থেকে সর্বস্থানে চার ভাগের একভাগ লোক থাকা উচিত ছিল বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের। পরিকল্পনার অভাবে সাংগঠনিক, দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর যুব সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ তারা দেশ ও জাতির উন্নয়নে খাঁটি দ্বীন প্রচারে যেভাবে অবদান রাখার কথা ছিল ততটুকু নেই।

এজন্য এখন সময় এসেছে তোমাদের সচেতন হওয়া। জমঈয়তের কার্যক্রমকে যেমন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা, তেমনি দেশে নির্ভেজাল শির্ক বিদআত মুক্ত খাঁটি দ্বীন প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা রাখা। শুধু তাই নয়, দেশ জাতির উন্নয়নে সবার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়াই এখন সময়ের দাবি।

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর অঙ্গসংগঠন। এজন্য জমঈয়তে আহলে হাদীসকেই আগে এগিয়ে আসতে হবে শুব্বানকে সুসংগঠিত করে একটি পরিপূর্ণ রূপ দেওয়া। যাতে উল্লিখিত কাজগুলো করতে নিজেদের সাংগঠনিক অবকাঠামোকে আরো শক্তিশালী করার প্রয়াস পায়।

তাই আমি এখানে শুব্বানকে তাদের করণীয় বিষয়ে দু-চারটি পরামর্শ দিতে চাই:
প্রথমত: নিজেদের সাংগঠনিক শাখা শক্তিশালী করা। সাংগঠনিক শাখা শক্তিশালী করতে-
১. শুব্বান শাখা গঠন: প্রতিটি এলাকা শুব্বানের শাখা গঠন করা।
২.খাওয়াতীন শাখা গঠন: প্রতিটি এলাকার জমঈয়তে খাওয়াতীন শাখা গঠন করা।
৩. সাংগঠনিক যোগ্যতা বৃদ্ধি: সাংগঠনিক যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য নিজেদেরকে ট্রেইন আপ করতে নিয়মিত তারবীয়াতের ব্যবস্থা করা।
৪. একাডেমিক যোগ্যতা বৃদ্ধি : একাডেমিক যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে নিম্ন থেকে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শ্রেণী অনুযায়ী এদেরকে বিন্যস্ত করতে হবে। এবং সে অনুযায়ী এদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়ে ভালো ছাত্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। স্কুল, কলেজ, মাদরাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয় সবচাইতে ভালো ছেলেটি শুব্বানের হতে হবে।
৫. পরামর্শক সেল গঠন: একাডেমিক ও গবেষণা পরামর্শক সেল গঠন করতে হবে। একাডেমিক ব্যক্তিদেরকে নিয়ে একটি অনলাইন প্লাটফর্ম দাঁড় করাতে হবে। যেকোনো লাইনে পড়া বা গবেষণার জন্য এই সেল থেকে পরামর্শ দেওয়া হবে। যারা বিদেশে লেখাপড়া করতে যাবে তারাও এই সেলের পরামর্শ অনুযায়ী যাবে।

দ্বিতীয়তঃ কর্মীদের কর্মসংস্থান চালু করা। এজন্য,

১. ভোকেশনালে ভর্তি হওয়াঃ যারা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে মেধা বা আর্থিক দিক থেকে অসামর্থ্য তারা ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হবে। কম্পিউটারে/ইলেকট্রিক বিষয়ে পড়াশোনা করে অভিজ্ঞ হবে। এতে তাড়াতাড়ি নিজের এবং পরিবার পরিচালনার জন্য সহজে ইনকামের জন্য নিজেকে তৈরি হবে।

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোচিং খোলা : ভালো শিক্ষার্থীদেরকে দিয়ে ভালো মানের কোচিং খোলা যেতে পারে। এতে একদিকে যেমন জমঈয়তের শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল করতে পারবে অনুরূপভাবে কোচিং পরিচালনা করে পরিচালনা পর্ষদের সবাই নিজেদের আর্থিক দৈনতাও দূর করতে পারবে।

৩. ভালো মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা : এখন মানুষ পয়সার দিকে তাকায় না, ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চায়। এজন্য প্রতিটি এলাকায় একটি করে ভালো মানের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে পারলে এলাকার জমঈয়তের শিক্ষার্থীরাসহ অন্যান্যরাও শিক্ষালাভ করতে পারবে। এতে একদিকে যেমন জমঈয়তের শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল করতে পারবে অনুরূপভাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরাও নিজেদের আর্থিক দৈনতা দূর করতে পারবে।

৪. আর্থিক সমিতি গঠনঃ আর্থিক সমবায় সমিতি গঠন করে মাসিক চাঁদার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে আর্থিকভাবে বড় করা। এরপরে এর মাধ্যমে এলাকায় একটি ইত্যাদি দোকান চালু করা। দোকানে দুই শিফটে শুব্বানের ছেলেদেরকে মাসিক বেতনে চাকুরী দেওয়া। এতে ৮-১০ জনের যেমন কর্মসংস্থান হবে তেমনি এ দোকান থেকে আয় দিয়ে নিজেদের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি করা যাবে।

৫. মসজিদে মক্তব/ বয়স্ক শিক্ষা চালু করা : মসজিদে মক্তব/ বয়স্ক শিক্ষা চালু করলে একদিকে এলাকার জমঈয়তের শিশু বৃদ্ধারা যেমন নিজেদের ঈমান আক্বীদা সূরা গুলো বিশুদ্ধ করতে পারবে তেমনি তাদের দেওয়া বেতন থেকে ইমাম এবং মুয়াজ্জিন যারা শিক্ষক হবেন তাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতাও দূর হবে।

৬. যোগ্যতা অনুযায়ী ব্যবসা করাঃ শিক্ষকতা যোগ্যতা অনুযায়ী যদি কোন চাকরির ব্যবস্থা করা না যায় তাহলে তাকে ব্যবসার কাজে লাগিয়ে দেওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যবসার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ ব্যবসা করে যত তাড়াতাড়ি আর্থিক সচ্ছলতা দূর করা যায় অন্যটাতে তত নয়। মুরগির ফার্ম দেওয়া, গাভী লালন পালন ইত্যাদি করা যায়। অর্থাৎ আর্থিক অবস্থা সচ্ছল করতে যোগ্যতা অনুযায়ী ব্যবসা করা যায়।

৭. ইমামের জন্য দোকান প্রতিষ্ঠাঃ প্রতিটি মসজিদে ইমামের জন্য একটি দোকান করে দেওয়া যেতে পারে। কারণ ইমামরা সাধারণত আর্থিকভাবে অসচ্ছল হন। প্রতিটি মসজিদে ইমামের জন্য একটি দোকান করে দেওয়া যেতে পারে। এজন্য মসজিদ কমিটি ইমামের জন্য একটি দোকানের ব্যবস্থা করলে ঈমানের স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে। এতে শুব্বানও অংশগ্রহণ করতে পারে।

৮.ইফার ইমাম প্রশিক্ষণ গ্রহণ করাঃ ইমাম সাহেব ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ইমাম প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকলে তিনি পশু চিকিৎসার ওপর ট্রেইন আপ হয়েছেন অবশ্যই। তিনি এগুলোকে কাজে লাগিয়ে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হতে পারেন।

৯. যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরীর ব্যবস্থা করাঃ দেশের উচ্চ শিক্ষিত বেকারের হার যেখানে প্রায় কোটির কাছে সেখানে কম মেধাবীদের অবস্থান কোথায়? তাই তুলনামূলক কম যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরীর ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. স্ব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হওয়া: একটা বিষয় মনে রাখতে হবে লেখাপড়া এবং কাজ করা অন্যের অনুপ্রেরণায় নয়, নিজের প্রেরণাতেই করতে হয়। নিজের প্রেরণায় উৎসাহিত হতে নিজেকে চিন্তা করতে হয়, দেশ জাতি সমাজ রাষ্ট্র ধর্ম এগুলো নিয়ে চিন্তা করতে হয়। যখন এগুলোর নিয়ে চিন্তা মাথায় আসে তখন নিজের কথা নিজের অস্তিত্বর কথা তারা ভুলে যায়। ঠিক তখনই সে দেশজাতির একজন প্রকৃত সেবক এবং নেতা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

তৃতীয়ত: খাঁটি দ্বীন প্রচারে সকল ধরনের মিডিয়ার ব্যবহার, এজন্য:
ক. ইমামদেরকে সময় উপযোগী খুতবা তৈরি করে মসজিদে সুন্দর আকর্ষণীয় ভাষায় বক্তব্য প্রদান করতে হবে।
খ. ফেসবুকে কুরআন হাদীসের বাণীগুলো বেশি বেশি প্রচার করতে হবে।
গ পেপার পত্রিকায় কুরআন হাদীসের আলোকে যুগোপযোগী আলোচনা বক্তব্য প্রবন্ধ প্রকাশ করতে হবে।

চতুর্থত: চ্যারিটি কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকা:
চ্যারিটি কাজের মাধ্যমে আমাদের নবী দ্বীন প্রচারের ফিল্ড তৈরি করতেন। এ ফিল্ড তৈরি করতে নিজেকে এগিয়ে যেতে হবে। কারো বিপদে এগিয়ে যাওয়া কাউকে আর্থিক সহযোগিতা করা। এলাকার গরিব অসচ্ছল মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করা। এলাকার রোগীদের চিকিৎসার ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া। এভাবেই শুব্বানের সদস্যরা এলাকার সবচাইতে ভালো ছেলে হিসেবে পরিচিত হতে পারে।

তাই শুব্বানের প্রতিটি সদস্যকে শারীরিক, মানসিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ আর্থিক বিষয়ের স্বচ্ছলতা অর্জন করতে হবে। অংশ গ্রহণ করতে হবে দেশ জাতির সেবায় সকল ইতিবাচক কাজে।

Dr. Md Osman Ghani
Vice President,
Bangladesh Jamiyat Ahl-al- Hadith
Professor & Director, Asian Institute, Asian University of Bangladesh.

The power of youth: A few words

Today's youth are the future of tomorrow. Youth contains the power to rise up against all injustices. Only The advice of elders and the power of youth can move a nation forward. That is why it is said, 'Youth is power, and youth is freedom'. The youth have played a leading role in all the great works of the world. The torch of this youth power can burn the garbage of the world. The world of inhumanity can be illuminated by spreading the light of the good energy of the youth.

Youth cannot be defined by age. Youth is the time in life when a person is young. Again, the period between childhood and adulthood is also called youth. However, the one who has beauty, liveliness, vitality and enthusiasm is the young one. In fact, youth is an experience-based, creative and enthusiastic stage of life. Physically capable, modern in thought, cultured in mind and spontaneous in charity work - these are the young ones. Mahathir Mohamad! Even after crossing the milestone of a century, he is still radiant. Mahathir is still physically and mentally active on his 100th birthday. According to him, I am always like to be busy with work. I do not understand why people want to take a rest. The warm blood of youth flows in the midst of continuous work. Hazrat Ali (RA) said, 'The body of the believers will be in a sweaty state when they breathe their last. But that is not due to the agony of death; it is due to hard work. That is, he will breathe his last while working.

Youth is the pride and valuable asset of any nation. The strong morale, immense courage and pure mentality of youth can change a nation. A large part of the rise and fall of civilization has come through the hands of youth. Youth is the main architect of the development of culture and civilization. Endless vitality and the creativity are the nature of youth. Breaking through the closed doors huts is their achievement. When the young people with a strong spirit wake up, they conquer all obstacles and win. The garland of victory adorns their necks. Islam has added the inexhaustibility of a new truth to the strength and courage of youth. The vibrant walk of Muslim youth has made it possible to spread the torch of Islam in the hearts of Europe.

The triumph of youth is also included in the Quran. It is mentioned that Allah Almighty created you in a weak state (infancy), then after weakness He gave you strength (youth). The warning is uttered in words indicative of His power.

مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً -That is, then give weakness and old age.[1]

From the beginning of creation to the present day, the heroic story of the youth is

1. Sura-ar-Rum: 54

written in every corner of the history that has changed the pace of civilization. Which began with the Allah-fearing, pious and the first martyr in the path of truth, the young man Hbel (A.S.). Who was a lover of Allah. He was a symbol of the highest ideal for all the youth of the world.

Ibrahim (AS.) was young. He was thrown into the fire of the heretic Namrud, embracing the truth. He was not defeated; he was rewarded. He became the friend of Allah. The gentle-looking Yusuf (AS) was young. Enlightened by the spirit of faith. The trap of conspiracy could not overcome him.

Prophet Younus jumped into the sea, filled with the thought that people should live and Islam should develop in its own glory. At that time, he was young one. Jalut was a tyrannical ruler. Humanity was fed up with his tyranny. In order to protect them, the need arose to kill Jaluth. David (AS), the representative of the youth of that time, took that responsibility on his shoulders. He killed Jaluth. David (AS) was a young man at that time.

We are inspired by the various advices and encouragements given to young people in the Holy Quran. Some of the young people mentioned in the Companions of the Cave had high morale, courage like mountains and complete faith in Allah Almighty. On the other hand, Allah Almighty Himself has been praised for their courage and cooperation.

نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

“O Prophet! I have narrated to you their (the Companions of the Cave) history in truth, they were young men and I strengthened them in their right path.”[2]

Throughout the fifth century and the first half of the sixth century, the unrest, barbarity, fighting, violence and insecurity of life and property in Arab society began a dark chapter. In the words of the historian Hitti, it was the `age of ignorance’. Muhammad ibn ‘Abdullah emerged to dispel the darkness of that inhumanity. Muhammad’s (sm) charitable activities at a young age created a sensation in the contemporary city of Macca. He formed Hilful Fuzul. He organized them under an organization and called for peace in Arabia. He achieved great success. The Arabs were delighted.

After receiving the Nabuwat, Muhammad (sm) mobilized the youth. Abu Bakr (RA), ‘Umar (RA), ‘Uthman (RA) and the ten-year-old ‘Ali (RA) unconditionally joined with Prophet (sm) The youngh who showed bravery and valor in the battlefield. In the Battle of Badr (624), two young companions named Mu’adh and Mu’awwiz killed Abu Jahl, the archenemy of Islam. In this way, young soldiers have continuously wielded their swords in the frontline battles on all jihadi battlefields. The names of Khalid ibn

2. Sura Kahaf: 13

Walid in the Battle of Muta (629), Tariq ibn Ziyad, the conqueror of Spain (711), and Muhammad ibn Qasim, the conqueror of Sindh (712), resonate in the hearts of all Muslims today.

The youth played a courageous role in the rise and development of Islam in the subcontinent. Among the Delhi-based sultans, Qutbuddin Aibek (1206-1210), the founder of the slave dynasty, Jalaluddin Firoz Khilji (1290-1296), the founder of the khilji dynasty, Jalaluddin Muhammad Tughlaq (1320-1325), the founder of the Tughalq dynasty, the founder of the Syed dynasty, Khizr Khan (1414-1421) and Bahlul Lodi (1458-1489), the founder of Lodi dinasty, were all young. Zahiruddin Muhammad Babur, the architect of the Mughal empire, conquered India at the age of just 22nd. From Ikhtiaruddin Muhammad Bakhtiar Khalji (1203-1206), to Fakhruddin Mubarak Shah(1238), all were youthful and brave warriors. Siraj-Ud-Daula, the first independent Nawab of Bengal, was a young man of only 23 years. Unfortunately, after the disaster of Plassey, the success achieved by the Muslim youth faded. The conspiracies of the English and the Brahmins and the treachery of the upper classes delayed the achievement of victory. From 1831 to 1947, the fearless young Muslim youth tried to erase the stain of subjugation. They had to wait for 190 years. Then independence was achieved.

Dear reader! Independence has been achieved. But the gaze of Saturn does not seem to be leaving behind. Cultural aggression is going on with the help of electronic media. Through satellites and dish antennas, all the aspects of the Western irreligious, anti-Islam, sensual, consumerist life are infiltrating the inner circle of Muslims today.The addiction to tobacco products and drugs has caught the youth. The West is harassing the Muslim world by imposing certain labels on it to make its empire and discourse successful. It is hindering progress by calling a true Muslim a fundamentalist, terrorist and militant.

The great anarchy in the education sector has created a crisis in the minds of the youth. Due to the secular education system, the youth are unable to learn religious morality. In Malaysia, a 50% Muslim-majority country, religious education is compulsory up to the highest level of education. However, in Bangladesh, which is 90% Muslim-majority, Islamic education is the most neglected. Bangladesh is currently reeling from a great religious and moral crisis.

Students, teachers and administration are related to education management. All these organs are today in turmoil due to the poisonous influence of party politics. Educational institutions have now become centers of political factionalism. In the name of entertainment, nude and semi-nude pictures of heroes and heroines, and singers are being published

in newspapers and magazines in a distorted manner. All these publications, which are disgusting, are leading the youth astray. The Western-controlled media is like a death knell. Not only distorted pictures are being disseminated in their media, they are also destroying our ability to understand.

All those temptations, deceptions and obstacles should be avoided. Conventional technology should be practiced and used. It should be noted that the widespread use of artificial intelligence is constantly changing our learning methods, work styles and life styles. The youth must move forward at the same pace with those changes. They must be proactive in acquiring artificial intelligence and digital skills.

The path of relating to the Creator has been made difficult. The path of walking must be smoothed by being saturated with the consciousness of monotheism and Ittaba'i-e-Sunnah. We must become courageous by removing all errors, deviations, weakness and laziness. We must move forward with firm steps to achieve victory by trampling on despair and hopelessness. A mass awakening must be created among the youth based on the Quranic philosophy and the ideals of the Prophet (sm).

I believe that our youth have already learned that today's world has entered the era of the Fourth Industrial Revolution, where technology, innovation, and leadership are all important. In this reality, need to prepare themselves not only for jobs but also for leadership.

The hope is that, under the supervision of Bangladesh Jamiat-e-Ahl-al-Hadith, Jamiyat Shubbane Ahl-Al Hadith Bangladesh is working at a rapid pace for social change. The helpless youth today is misguided. Having understood the matter in its essence, it is making a strong effort to unite the youth on the basis of divine philosophy. The burning desire to gain this and the next worldly welfare is constantly uniting them. The continuous journey of winning victory has constantly made our youth brave and confident. The black cloud of ignorance will soon be disappeared. The promise of the youth is expressed in the poet's words-

'This procession of ours is from the recent past to eternity...

We have come from Badr to Uhud, here, in the midst of a hundred conflicts, to this camp...

Who asks where we will go? We have said that our journey is in eternity...

The fatigue of dawn and dusk has never been able to dishearten us.

ইহতিশামুল আলম মারুফ
Assistant Manager, CrackTech Limited
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি , বাংলাদেশ জমঈয়তে আতফাল আহলে হাদীস ও
সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। (২০১৩-১৫)

দ্বীন কায়েমের সংস্কৃতি: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষ সৃষ্টির অভিপ্রায় ফেরেশতাদেরকে জানালে তারা মানুষ যেই ভুলগুলো করবে সেগুলো উল্লেখ করে আপত্তি জানিয়েছিলেন বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন। জবাবে আল্লাহ বলেছিলেন, "আমি যা জানি তা তোমরা জানো না।"[১] এই একটি বাক্য অত্যন্ত নিগুঢ় অর্থ বহন করে। তথ্য প্রযুক্তির এই উৎকর্ষের সময়, প্রতিনিয়ত যখন মানব সভ্যতা নতুন নতুন চূড়ায় গমন করছে, ঠিক একই সময় দুঃখের সাথে লক্ষ্য করতে হয় মানুষ আল্লাহ থেকে যোজন যোজন দূরে যাচ্ছে।

মানুষ ভুলে গেছে, কিংবা ভুলে থাকার অভিনয় করছে যে, যিনি তাদের স্রষ্টা, তিনি জীবন যাপনের যে পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন, সেটিই সর্বোত্তম। আল্লাহর বিধান দূরে সরিয়ে মানুষ নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ দাবী করছে, একই সাথে অন্তহীন বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে গোটা মানবতাকে। তবু তাদের হুঁশ হয় না, আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে ইচ্ছে হয় না, বরং ভুল পথেই নিমজ্জিত করে রাখছে নিজেদের।

মানবরচিত কোন জীবন বিধান কখনোই মানবকল্যান আর মুক্তি এনে দিতে পারবে না। বিধর্মীদের চাকচিক্য, বস্তুগত উন্নয়ন দেখে মুসলিম উম্মাহও যেন তন্ত্র মন্ত্রের মধ্যে সমাধান খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অথচ সিরাতুল মুস্তাকীম তো সহজ সরল, জটিলতা বর্জিত। বারবার দংশিত হবার পরও আমরা আশায় থাকছি হয়তো এবার বেঁচে যাবো, সাপের মাথায় আক্রমণ করে সাপের বিষ নামানোর পরিবর্তে।

জাহিলিয়াতের মধ্যে আকন্ঠ নিমজ্জিত একটা সমাজে আল্লাহ তাঁর প্রেরিত রাসুল পাঠালেন, যিনি সুদীর্ঘ তেইশ বছরের দাওয়াতী জীবনে অল্প কিছু মানুষকে তৈরী করলেন আগামী সভ্যতা বিনির্মাণের। ঐশী বাণীর আলোয় আলোকিত মুষ্টিমেয় সেই জানবাজ মানুষগুলো একরকম রিক্ত হস্তে তৎকালীন দুনিয়ার পরাশক্তিগুলোকে পদানত করলেন আল্লাহর ইচ্ছায়। দুনিয়ার মানচিত্র পাল্টিয়ে দিলেন ১০০ বছরের মধ্যে। কী ছিল তাদের বিজয়ের রহস্য? কেন সেই জাতির অধঃপতন হলো, কেন আজ নিকৃষ্ট ইহুদীরা বুকের উপর চড়ে বসেছে অথচ প্রতিবাদ তো দূরের কথা, মোহগ্রস্তের মতো উল্টো পশ্চিমাদের স্তুতি গাইছি আমরা? তাদের ফর্মুলা আমাদের সমাজ, রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছি?

মদীনা, দামেস্ক, বাগদাদ, কর্ডোভা, গ্রানাডা, ইস্তাম্বুল, দিল্লী, মুসলমানদের শান শওকত দেখে হয়রান হয়ে যাওয়া পশ্চিমারা আজ আমাদের ভিক্ষা দিতে চায়, বিনিময়ে তারা তাদের তৈরী বিভিন্ন তন্ত্র আমাদের সমাজে বাস্তবায়ন করতে চাপ দেয়। আমরাও লালায়িত কুকুরের মতো পশ্চিমাদের প্রিয়ভাজন হওয়ার দৌঁড়ে কে কতটুকু এগিয়ে থাকতে পারি সেই চেষ্টারত। আল্লাহর বিধানের চাইতে মানব রচিত বিধান উত্তম এটা মেনে নেওয়ার সাথে সাথে আমাদের অধঃপতন শুরু হয়েছে, বাকী সব যিল্লতি এর বাই প্রোডাক্ট।

আমরা বাংলাদেশি মুসলিমরা সামরিক আগ্রাসনের শিকার না হলেও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে পর্যদুস্ত। সমাজের চোখে গ্রহনযোগ্য ইসলাম পালনে আমরা সচেষ্ট। সেক্যুলার সমাজ যতটুকু অ্যালাও করে সেই সীমারেখার মধ্যে আবর্তিত আমাদের কর্মসূচী আর বয়ানগুলো। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ভঙ্গুর, আমাদের জীবনের সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য নেই, আমাদের কোনো রোডম্যাপ নেই, আমরা গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে চলেছি।

---

১. *সূরা আল বাকারা, ২ : ৩০*

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কেমন হবে, কাদের হাতে চালিকাশক্তি থাকবে এই প্রশ্ন করার অধিকারও যেন আমাদের নেই। হয়তো উগ্রবাদী সেক্যুলারিজম কিংবা কিছুটা নরম জাতীয়তাবাদী সেক্যুলারিজম এই দুইয়ের বাইরে যেন আমাদের কোনো গতি নেই। আমরা মুসলিমরা যেন অস্পৃশ্য কোনো সম্পপ্রদায় যেখানে আমরা দাবীই করতে পারি না, এই দেশ আমাদের, এই দেশে আমরা আমাদের স্রষ্টার বিধান অনুযায়ী চালাতে চাই।

সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মুসলিমরা নিজেরাও একটি ইসলামি সমাজ বিনির্মানের স্বপ্ন দেখতে সাহস করে না, বাকীরা কিভাবে বুঝবে ইসলামের সৌন্দর্য? আমাদের উন্নতির প্যারামিটার আমরা কয়টি নোবেল পুরস্কার জয় করতে পারলাম তাতে নয়, বরং আল্লাহর বিধানের প্রতি সম্পূর্ন আত্মসমর্পন। বস্তুবাদী উন্নয়ন আর চাকচিক্য নগণ্য হয়ে আমাদের পায়ে এসে পড়বে যদি আমরা আমাদের আত্মিক মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে যাই; সকল তন্ত্র মন্ত্রের পেছনে দৌড়ঝাঁপ বাদ দিয়ে ঐশী বিধান আঁকড়ে ধরি।

একজন মুসলিম মাত্রই বিপ্লবি। তার চিন্তা, তার আচরণ, তার লক্ষ্য সবকিছুতেই থাকবে বিপ্লবের প্রতিচ্ছবি। যেই মুষ্টিমেয় সাহাবায়ে আজমাইন অর্ধ পৃথিবীতে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন তাদের মতো চরিত্রের অধিকারী হবে মুসলিমরা। সেই মুসলিম আর আজকের মুসলিমের পার্থক্য হলো তারা কুরআন পড়তেন মাওলানা কিংবা বক্তা হওয়ার জন্য নয়, বরং কুরআনের বিধান নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। জাহিলিয়াত থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে তারা ইসলামে প্রবেশ করতেন, পিতার সাথে পুত্রের লড়াই, কত কুরবানী, কত প্রলোভন সত্ত্বেও আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি আনুগত্যকে সব কিছুর উর্ধ্বে রাখতেন।

বইমেলায় ইসলামী বই বেস্ট সেলার হওয়া, ইসলামী বক্তাকে ১ লাখ টাকা হাদিয়া দেওয়া, মসজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি, বছরব্যাপি ইসলামী জালসা হওয়া ইতিবাচক হলেও দীর্ঘমেয়াদী এগুলো কোনো ফল বয়ে আনতে পারবে না, আমাদের দরকার সেরকম জানবাজ মানুষ নিজেরা হওয়া এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তৈরী করা। যারা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য রক্তের সমুদ্রে স্নান করতে কিংবা আগুনে ঝাঁপ দিতে রাজি থাকবে। যদি আমরা বিশ্বাস করি ইসলাম মানব জাতির জন্য একমাত্র জীবন বিধান, তাহলে এই বিধান প্রতিষ্ঠার জন্যও আন্তরিক এবং বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা ঈমানের দাবী।

প্রচলিত রাজনীতিতে মুসলিমরা অংশগ্রহণ করবে কি না এ নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘ দিন ধরে চলমান, পক্ষে বিপক্ষে নানা তথ্য উপাত্ত হাজির করতে পারবেন নিজ নিজ মতের অনুসারীরা। তবে মোটাদাগে এই রাস্তায় সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের সফলতা আসার নজির খুব বেশি না বলা যায়। যতুটুকু অর্জিত হয়েছে বিনিময়ে যা মূল্য দিতে হয়েছে তা রীতিমত অসম এবং অপ্রাসঙ্গিক। তবে একটি বিষয়ে ঐক্যমতে আসা জরুরি, ভোটে প্রার্থীতা কিংবা রাজনৈতিক দল হিসেবে অংশগ্রহণ না করলেও রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরী এবং রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা দরকার। এটাকে বলে মেটাপলিটিক্স।

মুসলিমদের রাজনৈতিক অবস্থান কেমন হবে, কোন পন্থায় লাভ, কোন পন্থায় ক্ষতি, কোন ইস্যুতে আমাদের কতটুকু প্রতিক্রিয়া দেখাতে হবে, কোন রাজনীতিটা সঠিক, কোন পদ্ধতিতে চাপ প্রয়োগ করতে হবে, কোন পদ্ধতিতে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জিত হবে, কারা বন্ধু, কারা শত্রু, কাদের সমর্থন করতে হবে মতভিন্নতা থাকলেও এই বিষয়গুলো নির্ধারণ করতে হবে, নির্বাচনে সরাসরি অংশগ্রহন না করলেও। বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনক জায়গায়ই পরিবর্তনের সুযোগ নেই, কিন্ত সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে, সমাজের কোনটা উপযোগী আর কোনটা উপযোগী না তা নিয়ে আমাদের কথা বলার সুযোগ আছে, বলতেই হবে।

সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভের পাশাপাশি আমাদের সামনে আছে শহীদ তিতুমীরের উদাহরণ, হাজী শরীয়তউল্লাহর কর্মপদ্ধতি। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে নিজেদের বাঁচানো, নিজেদের তাহযীব তমদ্দুন রক্ষায় নতজানু না হয়ে বলিষ্ঠ ভাবে স্বকীয়তা তুলে ধরার প্রেরণা নিতে হবে তাদের কাছ থেকে। পশ্চিমাদের অনুকম্পার ভিখারি না হয়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে মেনে নেওয়ার নামই হবে ইসলামী রাজনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য, অন্য কিছু নয়।

আজকের ইউরোপ এবং পশ্চিমা বিশ্ব একটি রেঁনেসার মাধ্যমে পুনঃজাগরিত হয়েছে, চোখ ধাঁধানো বস্তুবাদী সংস্কৃতি নির্মান করেছে। ধর্মহীন আর নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত এই সভ্যতা তার সাংস্কৃতিক আগ্রাসন দ্বারা পুরো পৃথিবীকে কব্জা করে রাখতে চায়, লজ্জাহীন আর আল্লাহর অবাধ্য বানাতে চায় পুরো মানবজাতিকে। ইসলামই কেবল এই জাহিলী সভ্যতার মূলে কুঠারাঘাত করতে সক্ষম।

প্রতিষ্ঠিত জাহেলি সভ্যতার বুনিয়াদ ভাঙ্গার কাজটা তেমনভাবেই করতে হবে ঠিক যেমনভাবে করেছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর অনুসারী সাহাবায়ে আজমাইনগণ। এছাড়া বাকি সব পন্থা বাতিল এবং ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে হিলফুল ফুযুল বা ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মসূচী থাকলেও নবুওতের পর প্রধান দাওয়াত ছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মূহুর্তেই যারা ছিল এতদিনের হিতাকাঙ্খী, গুণমুগ্ধ, তারা হয়ে গেল নিকৃষ্ট শত্রু; অথচ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাইলে কৌশলে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কথাটা এড়িয়ে যেয়ে আবু জাহাল আর আবু লাহাবকে সাথে নিয়েই কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করতে পারতেন, মক্কার কাফির মুশরিকরা তো এমনিতেও আল্লাহকে স্রষ্টা, রব হিসেবে মানতো। কিন্তু না, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জাহেলী সভ্যতার বুনিয়াদে আঘাত করলেন, জানিয়ে দিলেন, ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ!

পরিশেষে, আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ, তায়িফায়ে মানসুরার চাঁদরে যেন আমরা আবৃত হতে পারি। আল্লাহর সুন্নাহ হলো কেউ তাদের কাজে অবহেলা করলে অন্য কোনো দল দ্বারা তাদের রিপ্লেস করানো। দ্বীন কায়েমের পথ থেকে যদি আমরা আহলুল হাদীসরা ন্যুনতম পিছিয়ে আসি, কাফেলা ঠিকই চলতে থাকবে আমাদের ছাড়া। যে হালাকু খাঁ বাগদাদ হালাক করেছিলো তাদের বংশধররাই একসময় ইসলামের গৌরবে নিজের গৌরবান্বিত করেছে, আলোর মশাল টেনে নিয়ে গেছে পুরো মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত। আমাদের দেশের আহলুল হাদীসরা যেন পূর্বপুরুষদের সিলসিলা জারি রেখে আমর বিল মা'রুফ আর নাহী আনীল মুনকারে অগ্রগামী হতে পারে, নেতৃত্ব দিতে পারে সেই প্রত্যাশা রেখে শেষ করছি।

তানযীল আহমাদ
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

দাঈর মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা

"দাঈ" বলতে সাধারণত ইসলাম ধর্ম প্রচার ও দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে বোঝায়। ইসলাম একটি মিশনারি ধর্ম। সাধ্যপক্ষে প্রত্যেক মুসলিমকেই ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করতে হয়। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহয় এই মহান কাজের অনেক মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম এই মহান দায়িত্ব অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে, বুদ্ধিমত্তার সাথে, যুগোপযোগীভাবে পালন করেছেন। একজন দাঈকে জ্ঞানগত দিক থেকে যেমন পরিপক্ক হতে হয়, ঠিক তেমনি তাকে নৈতিকতা ও মনস্তাত্ত্বিকভাবেও প্রস্তুত হতে হয়। বর্তমানে একজন দাঈ-এর মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাগুলো নানা কারণে হতে পারে; যেগুলো তার দাওয়াতি কাজ ও ব্যক্তিজীবনে প্রভাব ফেলতে পারে। আজকের এই আলোচনায় আমরা একজন দাঈর কেবল মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা গুলো নিয়ে আলোচনা করব। যেমন:

১. জ্ঞান ও আকলের (বিবেচনাবোধ) সমন্বয় না ঘটানো: জ্ঞান ও আকলের মাঝে সমন্বয় না থাকলে দাঈ নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবেন। এজন্য আলেমগণ বলেন, জ্ঞান ও আকলের দিক দিয়ে মানুষ তিন প্রকার:

এক. যার আকলের চেয়ে জ্ঞান বেশি। এই ব্যক্তি চরম ক্ষতিকর।
দুই. যার জ্ঞানের চেয়ে আকল বেশি। সে ক্ষতিকর নয়।
তিন. যার জ্ঞান ও আকল সমান। এ হলো সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি।

প্রখ্যাত ভাষাবিদ খলীল বিন আহমাদ (মৃ. ১৭০ হি.) ও ইবনুল মুকাফফা (মৃ. ১৪২ হি.)-এর মাঝে একদিন সাক্ষাৎ শেষে উভয়েই নিজ নিজ রাস্তা ধরে চলে যাচ্ছিলেন। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রথমে ইবনুল মুকাফফাকে খলীলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল। ইবনুল মুকাফফা বললেন, খলীলের জ্ঞানের চেয়ে আকল বেশি। ঐ ব্যক্তি খলীলকে জিজ্ঞাসা করল যে, ইবনুল মুকাফফা কেমন? খলীল বললেন, তার আকলের চেয়ে জ্ঞান বেশি। ঠিকই কিছুদিন পর ইবনুল মুকাফফা যিনদিক হয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করা হলো।[১]

আবু সাঈদ খুদরি রাযি. বলেন, إن لكل شيئ دعامة ودعامة المرء عقله، فبقدر العقل تكون عبادته لربه، أما سمعتم قول الله : **لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم**- "প্রত্যেকটি বস্তুর একটি ভিত্তি আছে, একজন ব্যক্তির মূল ভিত্তি হল তার আকল। আকল অনুপাতেই ব্যক্তি তার রবের এবাদত করে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন "জাহান্নামিরা বলবে আমরা যদি শুনতাম এবং উপলব্ধি করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামি হতাম না।"[২]

আকল দুই প্রকার: ১. সৃষ্টিগত ২. অর্জিত।

সৃষ্টিগত আকলের কারণে মানুষ অন্যান্য সকল প্রাণীর থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। আল্লাহ তা'আলা এ কারণেই তাদের ওপরে শরীয়াতের বিধি-বিধান প্রয়োগ করেছেন এবং এজন্যই তাদের জবাবদিহিতার

---

১. তার নিহত হওয়ার বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে নানা বিতর্ক আছে। কেউ বলেছেন, উমাইয়া গভর্ণর সুফিয়ান বিন মুহাল্লাব তাকে হত্যা করে। কারণ ইবনুল মুকাফফা তাকে হেয় করত। কেউ বলেছেন, তিনি খলিফা মানসুরের কাছে নিরাপত্তা চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু সেই চিঠির ভাষা ছিল আক্রমাণত্মক। ফলে খলিফা রেগে তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। আমীর শাবিব আরসালান, আদ দুররাতুল ইয়াতিমাহ, মিসর, আল মাকতাবা আল আরাবিয়া, পৃ. ১২-১৩, মুহাম্মাদ আলী (১৯১৩), রসায়িলুল বুলাগা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মিসর, দারুল কুতুব আল আরাবিয়া, ১৪ পৃ.
২. হাইসামি, বুগইয়াতুল বাহিস, পৃ. ৮৫০

আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। আর অর্জিত আকল সৃষ্টিগত আকলের থেকেই প্রাপ্ত। তবে সেটাকে শাণিত করার জন্য জ্ঞান অর্জন করতে হয়, অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়, যারা বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তাদের সোহবতে থাকতে হয়।

২. আত্মপ্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়াঃ বিশেষকরে বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সহজলভ্যতার কারণে অনেক দাঈ আত্মপ্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কিভাবে দ্রুততম সময়ে ভাইরাল হওয়া যায় এই কৌশলও রপ্ত করার চেষ্টা করেছেন। এমনকি বিতর্কিত অকল্যাণকর সব বিষয়ে জোর গলায় ক্যামেরার সামনে বক্তব্য দিয়ে প্রচারণায় নামছেন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, إِن اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْغَنِيَّ، الْخَفِيَّ- নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পরহেজগার, আত্মনির্ভরশীল এবং নিভৃতচারী বান্দাকে ভালোবাসেন।[৩]

নাহাওয়ান্দের যুদ্ধ (২১/১৮/১৯ হিজরিতে মুসলিম ও পারস্যের সাসানী সাম্রাজ্যের মধ্যকার সংঘঠিত যুদ্ধ। এতে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দেন নু'মান বিন মুকরিন। এই যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে পারস্যের পতন ঘটে। তবে সেনাপতিসহ অনেকেই শাহাদাত বরণ করেন) শেষে দূত এসে খলিফা ওমর বিন খাত্তাব রা. কে যুদ্ধের বিজয়ের সুসংবাদ দেন এবং বলেন যে, সেনাপতি নু'মান বিন মুকরিন শাহাদাত বরণ করেছেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এরপর জিজ্ঞেস করেন, আর কে কে শাহাদাত বরণ করেছেন? দূত বলেন, অমুক, অমুক, আপনি তাদেরকে চিনবেন না। ওমর তখন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আমি ওমর তাদেরকে চিনি না, কিন্তু আল্লাহ ত'আলা তাদেরকে ঠিকই চেনেন।[৪]

কাজেই একজন প্রকৃত দাঈ কখনোই আত্মপ্রচারের চিন্তা করবেন না, এবং তা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন না। মহান আল্লাহ বলেন,

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصْلَىٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا– وَمَنْ أَرَادَ ٱلْـَٔاخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا

"যে ব্যক্তি কেবল দুনিয়া চায় আমরা তার চাহিদা অনুযায়ী দুনিয়াতেই সবকিছু পূরণ করে দেব। অতঃপর তার জন্য নির্ধারণ করবো জাহান্নাম, সে সেখানে লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে পুড়তে থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পরকাল কামনা করে এবং তার জন্য প্রচেষ্টা করে আর সে এ ব্যাপারে আত্মপ্রত্যয়ী, তাহলে তাদের এই প্রচেষ্টার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে।"[৫] আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من كانت الدُّنيا همَّه ، فرَّق اللهُ عليه أمرَه ، وجعل فقرَه بين عينَيْه ، ولم يأْتِه من الدُّنيا إلَّا ما كُتِب له ، ومن كانت الآخرةُ نيَّتَه ، جمع اللهُ له أمرَه ، وجعل غناه في قلبِه ، وأتته الدُّنيا وهي راغمةٌ

"যে ব্যক্তির মূল চিন্তা চেতনা শুধু দুনিয়া, আল্লাহ তা'আলা তার বিষয়গুলো ছিন্ন ভিন্ন করে দিবেন, তার দু'চোখের সামনে শুধু দারিদ্রতা রাখবেন এবং তার জন্য দুনিয়ার যতটুকু অংশ নির্ধারিত ছিল তা ব্যতীত অতিরিক্ত কোনো কিছুই আসবেনা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির সমস্ত চিন্তা চেতনা হল আখেরাত, আল্লাহ তা'আলা তার বিষয়গুলো সহজ করে দিবেন, তার হৃদয়ে আত্মনির্ভরশীলতা ঢেলে দিবেন এবং দুনিয়া হাতজোড় করে তার সামনে এসে দাঁড়াবে।"[৬]

৩. কঠোর অবস্থানের সময় কোমল হওয়া এবং কোমল অবস্থানের সময় কঠোর হওয়া।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে সাহাবায়ে কেরামকে চিত্রিত করেছেন এভাবে যে,

---

৩. সহীহ মুসলিম- ২৯৬৫
৪. ইবনু জারির, তারিখে তবারি, ৪/১১০
৫. সূরা আল ইসরা, ১৭ : ১৮-১৯
৬. সুনান আত তিরমিযি- ২৪৬৫, সহিহ, আলবানি, সিলসিলা সহীহা- ৯৫০

স্মরণিকা ১১তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৫

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْۖ-"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সঙ্গী সাথীরা কাফেরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর, পরস্পরের মাঝে রহমদিল।"[৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা তাহের ইবনে আশুর বলেন,

وفِي الجَمْعِ لَهم بَيْنَ هاتَيْنِ الخَلَّتَيْنِ المُتَضادَّتَيْنِ الشِّدَّةِ والرَّحْمَةِ إيماءٌ إلى أصالَةِ آرائِهِمْ وحِكْمَةِ عُقُولِهِمْ، وأنَّهم يَتَصَرَّفُونَ فِي أخْلاقِهِمْ وأعْمالِهِمْ تَصَرُّفَ الحِكْمَةِ والرُّشْدِ فَلا تَغْلِبُ عَلى نُفُوسِهِمْ مَحْمَدَةٌ دُونَ أُخْرى ولا يَنْدَفِعُونَ إلى العَمَلِ بِالجِبِلَّةِ وعَدَمِ الرَّوِيَّةِ

-"কঠোরতা এবং কোমলতা এই দুইটি বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্য সাহাবায়ে কেরামের মাঝে একত্রিত হওয়া তাদের ধী-শক্তি এবং প্রজ্ঞার পরিচয়ক। অর্থাৎ তারা তাদের চারিত্রিক এবং কর্মগত যে কাজই করতেন তা প্রজ্ঞাপূর্ণছিল। এমনটা ছিল না যে, তারা একটি গুণ অর্জন করেছেন তো আরেকটি গুণ বাদ দিয়েছেন। এবং তারা শুধু সৃষ্টিগত কারণে বা আবেগ তাড়িত হয়ে এবং কোনো উদ্দেশ্যহীন কোনো কাজ করেছেন এমনটাও ছিল না।"[৮] আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন, فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهم ويُحِبُّونَهُ أذِلَّةٍ عَلى المُؤْمِنِينَ أعِزَّةٍ عَلى الكافِرِينَ -"আল্লাহ অচিরেই এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন এবং তারা আল্লাহকে ভালবাসবে, যারা মুমিনদের ব্যাপারে কোমল ও কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর হবে।"[৯]

কিন্তু অনেক দাঈদের মধ্যে এই ব্যাধি দেখা যাচ্ছে যে, কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য নরম অথবা কোনো বক্তব্য নেই, কিন্তু মুসলিমদের মধ্যে যারা ভুল পথে আছেন অথবা সঠিক পথে আছেন কিন্তু সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি হয় এমন ব্যক্তিদের ব্যাপারেও কঠোর বক্তব্য দেন। যা একজন দাঈর মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার পরিচায়ক। দাওয়াতের ময়দানে যা মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। আমাদেরকে এখান থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা একদিন ছাত্রদেরকে বললেন, তোমরা কি জানো রিফক বা কোমলতা কী? ছাত্ররা বলল না। তখন তিনি বললেন, الرفق أن تضع الأمور مواضعها -"কোমলতা হলো প্রত্যেক বিষয়কে তার নিজ স্থানে রাখা।"

৪. একই মানহাজ- মাসলাকের দাঈদের সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি এড়িয়ে না গিয়ে সমালোচনায় লিপ্ত হওয়া।

সাম্প্রতিক সময়ে এই ব্যাধিটি দাঈদের মধ্যে প্রকট আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অল্প সময়ে পরিচিতি পাওয়ার জন্য অনেকেই এই ন্যাক্কারজনক কাজটি করে থাকেন। অথচ ইসলামের শিক্ষা হলো মুসলিমদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করা, ভুল ত্রুটি এড়িয়ে যাওয়া এবং তার জন্য ওজর তালাশ করা। উসমান বিন যায়েদা বলেন, العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل - "মানসিক সুস্থতা দশ ভাগে বিভক্ত। যার নয় ভাগই হলো দোষ ত্রুটি এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহ. বলেন, العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل-"মানসিক সুস্থতা দশ ভাগে বিভক্ত। যার পুরোটাই দোষ ত্রুটি এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে নিহিত।[১০]

অর্থাৎ একজন দাঈ যদি মানসিক সুস্থতা অর্জন করতে চান, তার মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা কাটাতে চান এবং বুদ্ধিভিত্তিকভাবে তার দাওয়াহ উপস্থাপন করতে চান তাহলে ছোটখাটো দোষ ত্রুটি তিনি এড়িয়ে যাবেন, মুসলিম ভাইয়ের জন্য ওজর তালাশ করবেন, পারতপক্ষে ক্ষমা করে দিবেন। সব দোষ ত্রুটি নিয়ে পড়ে থাকলে এবং সেগুলোর সমালোচনা করলে তিনি কখনোই মানসিক সুস্থতা পাবেন না এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে চরম

৭. সূরা আল ফাতহ, ৪৮ : ২৯

৮.আশুর, মুহাম্মাদ বিন তাহির, আত তাহরীর ওয়াত তানবীর, সূরা আল ফাতহের ২৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.

৯. সূরা আল মায়িদা, ৫ : ৫৪

১০. বাইহাকি, শুআবুল ঈমান- ৮০২৮, হাসান

দুর্বলতায় ভুগবেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সুন্দরভাবেই না বলেছেন, لا يُخبِرْني أحدٌ منكم عن أحدٍ شيئًا فإنِّي أحبُّ أن أخرُجَ إليكم وأنا سليمُ الصَّدرِ -"তোমাদের কেউ যেন আমার কাছে অন্যের ব্যাপারে সমালোচনা না করে। কারণ আমি তোমাদের সবার নিকটে মুক্তমন নিয়ে যেতে চাই।"[১১]

আইয়ুব সাখতিয়ানি (মৃ. ১৩১ হি.) বলেন,

لا يسود العبد حتى يكون فيه خصلتان: اليأس مما في أيدي الناس والتغافل عما يكون منهم

-"কোনো বান্দা দুইটি গুণ অর্জন করা ব্যতীত নেতৃত্ব দিতে পারবে না। এক. মানুষের সম্পদের দিকে না তাকানো। দুই. তাদের পক্ষ থেকে সমালোচনার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে এড়িয়ে যাওয়া।"[১২]

ইমাম যাহাবি রহ. (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেন,

ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعرف تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه ولا نتبع له في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك

-"অতঃপর এমন বড় ইমাম, যার সঠিক সিদ্ধান্তই বেশি এবং তিনি সত্যের অনুসন্ধান করেন, তার জ্ঞানের প্রসারতা, মেধার প্রখরতা, পরহেজগারিতা এবং সুন্নাহর অনুগামীতা স্পষ্ট, তাহলে তার ছোটখাটো ভুলগুলো মার্জনীয়। আমরা তাকে পথভ্রষ্ট বলবো না, ফেলে দিব না এবং তার সৎ কর্মগুলোকে ভুলে যাব না। তবে হ্যাঁ, তার কোনো বিদয়াত বা ভুলের অনুসরণ করবো না। এ ব্যাপারে আমরা তার তাওবার আশা করব।"[১৩]

দুটি গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম বিষয়:

১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুষ্পদ জন্তুর ব্যাপারেও ওযর পেশ করেছেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় তাঁর বাহন কাসওয়া নামক উটনি যখন বসে পড়লো, সামনে অগ্রসর হচ্ছিল না তখন সাহাবায়ে কেরাম বলে উঠলেন, خلأت القصواء خلأت القصواء - "কাসওয়া দুর্বল হয়ে পড়েছে, কাসওয়া দুর্বল হয়ে পড়েছে।" তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل -"কাসওয়া দুর্বল হয়নি, আর এটা তার চরিত্রও নয়। বরং তাকে আটকে দিয়েছেন ওই সত্তা যিনি হস্তিবাহিনীকে আটকে দিয়েছিলেন।"[১৪]

এই ঘটনায় স্পষ্টত বুঝা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চতুষ্পদ জন্তুর ব্যাপারেও সাহাবায়ে কেরামের নিকটে ওযর পেশ করেছেন, সেটার দোষত্রুটি বলেন নি।

২) শরীয়তের মাসয়ালা হলো, যদি প্রশিক্ষিত কুকুর শিকার ধরে নিয়ে আসে তাহলে তা খাওয়া জায়েজ। তবে কুকুর নিজেই যদি শিকারের কোনো অংশ খেয়ে ফেলে তাহলে তা আর খাওয়া যাবে না। কিন্তু তাই বলে সেই কুকুরটি প্রশিক্ষিত কুকুরের তালিকা থেকে বাদ চলে যাবে না। সুবহানাল্লাহ। শরীয়তের মাসআলা কত স্পষ্ট এবং সূক্ষ্ম। এখান থেকে বুঝা যায়, শরীয়ত কুকুরের ওযর তালাশ করেছে, তাকে প্রশিক্ষিত কুকুরের তালিকা থেকে বাদ দেয়নি। তেমনি একজন আলেম বা দাঈ যিনি পরীক্ষিত, পরিচিত, যার অধিকাংশ বক্তব্যই কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক, তাহলে তার দুই একটি ভুলের জন্য মানহাজ থেকে বের করে দেয়ার যে প্রবণতা তা একেবারেই নিচু মানসিকতার পরিচায়ক বৈ কিছু নয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم -"তোমরা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ছোটখাটো ত্রুটি বিচ্যুতি এড়িয়ে যাও।"[১৫]

১১. আবু দাউদ- ৪৮৬০, তিরমিযি- ৩৮৯৬, সনদ ভালো
১২. নুআইম বিন হাম্মাদ, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/৫
১৩. যাহাবি, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৫/২৭১
১৪. সহিহুল বুখারি- ২৭৩১
১৫. মুসনাদে আহমাদ- ২৫৫১৩, সহীহ

কিন্তু বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। আলেমদের পরস্পরের মধ্যে অন্যের ব্যাপারে সমালোচনা, তির্যক বাক্যবাণ, দোষ-ত্রুটির ছিদ্রান্বেষণ সবকিছুই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। ফলে, আমাদের মধ্যকার ভালোবাসা ও প্রীতির সম্পর্কগুলো হিংসা-বিদ্বেষে রূপ নিয়েছে। নাউযুবিল্লাহ। নিজের মতের সাথে না মিললেই তাকে মানহাজ থেকে বের করে দেয়ার প্রবণতা অনেকের মাঝে প্রকট আকার ধারণ করেছে। এটি মূলত খারেজিদের একটি অন্যতম স্বভাব।

৫. ভক্তকুলের বা অনুসারীদের ভয়ে হক কথা না বলা: একজন দাঈর মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা হলো, তিনি তার ভক্তকুল বা অনুসারীদের তোপের মুখে পড়বেন এই আশঙ্কায় হক কথা ছেড়ে দিয়েছেন। এই অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন, যখন তিনি কোনো বিষয়ে অত্যন্ত উগ্রভাবে ফতোয়া দেন এবং পরবর্তীতে ভুল বুঝতে পারেন কিন্তু সঠিক কথা বলার সুযোগ তিনি হারিয়ে ফেলেছেন বলে মনে করেন। কারণ তার ভুলভাল ফতোয়ার কারণেই অন্ধ অনুসারীর দল সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে, সেই ভুল ফতোয়াকেই চূড়ান্ত রূপে গ্রহণ করেছে এবং অন্যের মতামতকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে। এক্ষেত্রে তার প্রথম কর্তব্য হলো, যে কোনো বিষয়ে ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে ভেবেচিন্তে ফতোয়া দেওয়া, ফতোয়া প্রদানে সালাফদের যে পদ্ধতি তার অনুসরণ করবেন, অন্যের দলিলভিত্তিক মতামতকে উল্লেখ করবেন এবং তা দুর্বল হলে তাও বলতে পারেন। তাহলে তার উগ্র ভক্তকুল তৈরি হবে না এবং তারা বুঝবেন যে, এই বিষয়ে একাধিক মতামত ইমামদের মাঝেই বিদ্যমান ছিল। অতঃপর তিনি যদি তার ভুল বুঝতে পারেন তাহলে নিঃসংকোচে সঠিকটি বলবেন এবং তার আগের বক্তব্য ভুল ছিল তাও স্পষ্ট করবেন। এক্ষেত্রে তিনি কোনো সংকোচ করবেন না, মানুষের সন্তুষ্টির আশা করবেন না, কেবল আল্লাহ তালাকেই সন্তুষ্টির চিন্তা করবেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله الى الناس- "যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে হলেও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষকে সন্তুষ্ট করে আল্লাহকে অসন্তোষ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে মানুষের উপরেই ন্যস্ত করে দেন।"[১৬]

একজন আলেমের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে তার এবাদত বন্দেগীতে, আর আভিজাত্য ফুটে ওঠে সত্যের নিঃসংকোচ প্রকাশে। যে আলেম যত বেশি সত্য বলতে দৃঢ় প্রত্যয়ী তার প্রভাব তত বেশি।

৬. বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ আলেম ও দাঈদের সাথে পরামর্শ না করেই দাওয়াতি কাজ করা। বিশেষ করে ওই সকল বিষয়ে যে সকল বিষয়ে পরামর্শ প্রয়োজন: পরামর্শ করে কাজ করা ইসলামের শরীয়তের অন্যতম সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্যের শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি তাদের (সাহাবাগণের) সাথে পরামর্শ করে কাজ করুন।[১৭]

দাওয়াতের অন্যতম পদ্ধতি হলো সমমনা অন্যান্য দাঈদের সাথে পরামর্শ করে দাওয়াতী কাজের আঞ্জাম দেয়া। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো, এ বিষয়েও দাঈদের অনেক ঘাটতি আছে। ইমাম শা'বী এবং কাতাদা বলেন, ব্যক্তি তিন প্রকার:

এক. যে পরামর্শ করে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সে হলো পরিপূর্ণ ব্যক্তি।

দুই. যে পরামর্শ করে কিন্তু সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। সে অর্ধেক ব্যক্তি।

তিন. যে পরামর্শও করে না এবং সিদ্ধান্তও দিতে পারে না। সে কোনো ব্যক্তিই নয়।

পরামর্শ মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। নতুন নতুন চিন্তার বিনির্মাণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা

---

১৬. সুনান আত তিরমিযি-২৪১৪, ইবনু হিব্বান-২৭৭

১৭. সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫৯

যায়। আল্লাহর রহমত লাভ করা যায়। পরামর্শ ইসলামী শরীয়তের অন্যতম সৌন্দর্য। ইসলামী সংগঠনের অন্যতম ভিত্তি হলো পরামর্শ। পরামর্শ করলে অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে সেরাটা জানা যায়। পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করে কাজের কৌশল নির্ধারণ করা যায়। অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয়। এভাবে করে সকলেই সমস্যাবলী উপলব্ধি করতে পারে এবং উত্তরণের উপায় সম্পর্কে ভাবতে শিখে।

৭. দাওয়াতের শত্রুদের সম্পর্কে সতর্ক না থাকা: অনেক দাঈ আছেন যারা সরলমনে দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দিয়ে যান কিন্তু ইসলামের শত্রুরা বিশেষ করে মুনাফিক শ্রেণী তাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে ক্ষতি করতে থাকে, দাওয়াতকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। একজন দাঈকে এসব শত্রুর ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে, সতর্কতার সাথে পা ফেলতে হবে। না হলে তারা ইসলামী দাওয়াতকে ভিন্ন কিছুর সাথে গুলিয়ে ফেলবে। পবিত্র কুরআনুল কারীমে ছয় প্রকার শত্রুর ব্যাপারে আলোচিত হয়েছে:

১. নফস, ২. শয়তান, ৩. ইয়াহুদ, ৪. ইসারা, ৫. মুশরিক, ৬. মুনাফিক।

তবে মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করে বলেছেন, هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحْذَرْهُمْ - "এরাই কট্টর শত্রু। এদের ব্যাপারে সতর্ক থাক।"[১৮]

একজন দাঈ যদি এসব শত্রু সম্পর্কে সজাগ সতর্ক না থাকেন, তাদের পাতা ফাঁদে পা দেন, বিশেষ করে মুনাফিক শ্রেণীর লেজুরবৃত্তি করেন বা তাদের তৈলমর্দনের সুযোগ দেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই তিনি তার দাওয়াতি পথ থেকে বিচ্যুত হবেন, তার দাওয়াত ফলপ্রসূ হবে না এবং তিনি মনস্তাত্ত্বিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বেন।

৮. কোমলতা বর্জন করে কঠোরতা অবলম্বন করা: একজন দাঈকে অবশ্যই কোমল হতে হবে। মিষ্টভাষী, কোমল চরিত্রের অধিকারী, সদা সর্বদা সহাস্য বদনে থাকাই একজন দাঈর উচিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ- "(হে নবী,) এটা আল্লাহর বড়ই অনুগ্রহ যে, তোমার ব্যবহার তাদের প্রতি বড়ই কোমল। নয়তো যদি তুমি রুক্ষ স্বভাবের বা কঠোর চিত্ত হতে, তাহলে তারা সবাই তোমার চার পাশ থেকে সরে যেতো।"[১৯]

মূসা এবং হারুন আলাইহিমাস সালামকে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনের নিকটে দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে যখন পাঠালেন তখন তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ - "তার সাথে কোমলভাবে কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভীত হবে।"[২০]

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به - "হে আল্লাহ, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোনো বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে অতঃপর তাদের প্রতি কঠোর হবে আপনিও তার প্রতি কঠোর হন। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোনো বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে এবং তাদের প্রতি কোমল হবে, আপনিও তার প্রতি কোমল হন।"[২১]

৯. অন্যান্য দাঈদের বা সিনিয়র দাঈদের অবদান অস্বীকার করা বা খাঁটো করে দেখা:

এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা চাই যে, আমরা যদি অন্যের অবদান অস্বীকার করি বা তুচ্ছ করে দেখি তাহলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের অবদানকে অস্বীকার করবে বা তুচ্ছ করে দেখবে। যেকোনো কাজের সূচনা করা যতটা কঠিন তা চালিয়ে নেয়া ততটা কঠিন নয়। যিনি দাওয়াতের সূচনা করেছেন তিনি কত শত বন্ধুর পথ মাড়িয়ে এগিয়ে গেছেন তা আল্লাহই ভালো জানেন। যতটুকু করার তিনি তাওফিক পেয়েছেন ততটুকু করেছেন। আমরা পরবর্তীতে তার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করলেও তার মতো মর্যাদা অর্জন করতে পারব না।

---

১৮. সূরা আল মুনাফিকুন, ৬৩ : ৪
১৯. সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫৯
২০. সূরা ত্ব-হা, ২০ : ৪৪
২১. সহিহ মুসলিম- ১৮২৮

যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَٰتَلَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَقَٰتَلُوا۟ ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ- "তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পরে অর্থ ব্যয় করবে ও জিহাদ করবে, তারা কখনো সেসব বিজয়ের সমকক্ষ হতে পারে না যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। বিজয়ের পরে ব্যয়কারী ও জিহাদকারীদের তুলনায় তাদের মর্যাদা অনেক বেশী। যদিও আল্লাহ উভয়কে ভাল প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।"[২২]
এই গর্হিত কাজের তাৎক্ষনিক কিছু ফলাফল তো পাওয়া যায়। যেমন নিজের ভক্ত অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাদের আরো বেশি জোরালো সমর্থন আদায় করা যায়, কারণ তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, দাওয়াতের যা কাজ তা কেবল এখন হচ্ছে, আগে কোনো কাজ হয়নি। এটা একজন প্রকৃত দাঈর মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা, তার বুদ্ধিবৃত্তিক পরাজয়।

১০. প্রতিযোগিতা না করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাঃ

যেকোনো ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করা ভালো। আল্লাহু তায়ালা নিজেই প্রতিযোগিতার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, وَفِى ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَٰفِسُونَ- "এটি হাসিলের জন্য প্রতিযোগিরা যেন প্রতিযোগিতা করে।"[২৩]
আল্লাহ আরো বলেন, وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ- "দৌড়ে চলো তোমাদের রবের ক্ষমার পথে এবং সেই পথে যা পৃথিবী ও আকাশের সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে চলে গেছে, যা এমন সব আল্লাহভীরু লোকদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।"[২৪]
তাহলে, দাওয়াতের ময়দানে প্রতিযোগিতা অবশ্যই কাম্য। কে কত বেশি দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষকে দ্বীনের পথে নিয়ে আসতে পারে তা অবশ্যই ভালো বিষয়। কিন্তু প্রতিযোগিতা না করে যদি দাঈগণ বা দাওয়াতী সংগঠনগুলো পরস্পরের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়, একজনের দাওয়াতকে বাঁধা দিয়ে নিজে সেখানে দাওয়াতী কাজ করতে চায় তাহলে তা নিন্দনীয়, পরিত্যাজ্য। এসবই দায়ীদের মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার পরিচায়ক।

১১. অন্যের জমিতে ফসল তোলার চেষ্টা করাঃ

এখন অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে, সেখানে একটি সংগঠন আগে থেকেই সক্রিয় আছে, সেই সংগঠন সেখানে দাওয়াতের সূচনা করেছে, সেই জায়গা তাদের আয়ত্তে আছে, কিন্তু সেখানে অন্য আরেকটি সংগঠন অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এর মানেই হলো ঝামেলার জন্ম দেয়া। এবং এই কারণে অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে। অথচ একজন দাঈর বা একটি সংগঠনের উচিত ছিল যেখানে দাওয়াতের কোনো কাজ নেই, কোনো সংগঠন সেখানে সক্রিয় নয়, মানুষজন দাওয়াতের মুখাপেক্ষী সেখানে দাওয়াতি কাজ করা।

১২. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অহেতুক মন্তব্য করা, বিতর্ক করা এবং সত্য মিথ্যা যাচাই করা ছাড়াই কোনো সংবাদ প্রচার করা। এর ফলে,

ক. আমাদের মধ্যকার সম্পর্ক, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও আস্থা চলে যাচ্ছে। সেখানে স্থান নিচ্ছে অনাস্থা, গোস্বা, ক্রোধ ও বিদ্বেষ।

খ. প্রচুর সময়ের অপচয়। অহেতুক কাজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়া, দিনশেষে আক্ষেপ নিয়ে ঘুমাতে যাওয়া।

গ. মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অসুস্থ প্রতিযোগিতার চর্চা হচ্ছে।

ঘ. একাডেমিক ও রিসার্চ নির্ভর ব্যক্তিগণও এতে আক্রান্ত হয়ে খেই হারিয়ে ফেলছেন। তাঁদের খিদমাতের

---

২২. *সূরা আল হাদীদ, ৫৭ : ১০*

২৩. *সূরা আল মুতাফফিফিন, ৮৩ : ২৬*

২৪. *সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৩৩*

মান হারিয়ে যাচ্ছে।

ঙ. সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে অপমান করা হচ্ছে। তাঁদের দীর্ঘদিনের খিদমাত ছোট্ট একটি ভুলের কারণে বিনাশ করা হচ্ছে ফেসবুকে।

চ. আলেমদের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন, শ্রদ্ধা, আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে। মনের কোণে জন্ম নিচ্ছে অনাস্থা, অশ্রদ্ধা এমনকি ঘৃণা।

ছ. একটি ছোট্ট মন্তব্য বা পোস্টের কারণে একজন আগাগোড়া আহলে হাদীস/ সালাফী ব্যক্তিকেও; যিনি হয়তো তার জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় কুরআন - সুন্নাহর প্রচার- প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁকে মানহাজ থেকেই বের করে দেয়া হচ্ছে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এমন সংকীর্ণ মানসিকতার ব্যক্তিদের জন্য দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বই পড়ার অনুরোধ রইলো: ড. বকর আবু যায়দ রচিত- تصنيف الناس بين الظن واليقين, এবং শাইখ আব্দুল মুহসিন আল আব্বাদ রহ. রচিত - رفقا أهل السنة بأهل السنة।

সম্মানিত ব্যক্তির সম্মানহানি হাদীসে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ছোট খাটো ভুল ত্রুটি এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, " أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ، إِلَّا الْحُدُودَ " - "তোমরা সম্মানিত, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ত্রুটি বিচ্যুতি এড়িয়ে চলো, তবে হদ্দ ব্যতীত।"[২৫]

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"এক মুসলিম ব্যক্তি অন্য মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি কোনো যুলম করবে না, তাঁকে ধরিয়ে দিবে না। যতক্ষণ কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করতে নিয়োজিত থাকে, আল্লাহ তা'আলাও ততক্ষণ তার সাথেই থাকেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে দুনিয়াবি বিপদ থেকে উদ্ধার করবে, আল্লাহ তাকে পরকালের বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ- ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ তা'আলাও পরকালে তাঁর দোষ ত্রুটি গোপন রাখবেন।"[২৬]

ঠিক তেমনি ভালো করে না জেনেই কোনো সংবাদ প্রচার করার ব্যাপারে কুরআনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। আহলে হাদীসগণকে এই উপদেশ দেয়ার তো কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

"হে ঈমানদারগণ, যদি কোনো ফাসেক তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসে তাহলে তা অনুসন্ধান করে দেখ। এমন যেন না হয় যে, না জেনে শুনেই তোমরা কোনো গোষ্ঠীর ক্ষতি করে বসবে এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।"[২৭]

১৩. দাওয়াতের ক্ষেত্রে সকল ফিতনায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলা:

অর্থাৎ, কোথায় কে কী করল, কী বলল এসবের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা। পৃথিবীর এক প্রান্তে একজন দাঈকে পৃথিবীর আরেক প্রান্তের আরেকজন দাঈ বিচার করছে। তাকে নিয়ে, তার অনুসারীদের নিয়ে সমালোচনা করছে। জনগণকেও এসবের মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কেউ তো এসবের কিছুই বুঝতে পারছে না, আর কেউ অন্ধের মতো অনুসরণ করতে হয় তাই অনুসরণ করে সেও এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করছে। অথচ দুই জনের মাঝে কত দূরত্ব, কত ব্যবধান, তাদের কাজের ক্ষেত্র এবং পরিধিও সম্পূর্ণ ভিন্ন। এসব অযাচিত বিষয়ে

২৫. *সুনান আবু দাউদ- ৪৩৭৫, সহীহ*
২৬. *সহিহুল বুখারি- ২৪৪২*
২৭. *সূরা আল হুজুরাত, ৪৯ : ৬*

একজন প্রকৃত দাঈ কখনোই নিজেকে জড়াবেন না।

কিন্তু এখন কি হচ্ছে? যুবকরা প্রশ্ন করছে শাইখ দের কাছে, শাইখ, অমুকের বিষয়ে আপনার অবস্থান কি? অমুকের বক্তব্য শোনা যাবে কি?

ভয়ংকর বিষয় হলো, কখনো কখনো যার বিষয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে তিনি একজন পরীক্ষীত দাঈ, সংগঠনের ত্যাগী কর্মী। যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তিনিই হয়তোবা তার মতো অবস্থানে নেই বা পৌঁছতেও পারবেন না।
শাইখ মুকবিল বিন হাদী আল ওদিঈ বলেন, لا تأتوا بفتنة فلان إلى اليمن، فنحن في سلامة منها - তোমরা অমুক তমুকের ফিতনা ইয়ামানে নিয়ে এসো না। আমরা এসবের থেকে নিরাপদে, সুস্থ পরিবেশে আছি।
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا - "সৌভাগ্যবান সেই যাকে ফিতনা থেকে দূরে রাখা হয়েছে, সৌভাগ্যবান সেই যাকে ফিতনা থেকে দূরে রাখা হয়েছে, সৌভাগ্যবান সেই যাকে ফিতনা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। কিন্তু ঐ ব্যক্তির বিষয়টি আশ্চর্যজনক যাকে ফিতনার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হলো আর সে ধৈর্য ধারণ করে তার মোকাবেলা করল।"[২৮]
আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের যোগ্য উত্তরসূরি হওয়ার এবং তাঁদের দাওয়াতি মানহাজকে আঁকড়ে ধরার তাওফিক দিন-আমীন।

২৮. সুনান আবু দাউদ, ৪২৬৩, সহীহ

পথভ্রষ্ট সুন্নাহ অস্বীকারকারীদের ইতিহাস ও আল-কুরআনের দর্পণে সুন্নাহর প্রামাণিকতা

শাইখ রায়হান উদ্দীন মাদানী
সহ-সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও শাশ্বত দ্বীন ও জীবনব্যবস্থার নাম। যে দ্বীনে মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের শরয়ী দিকনির্দেশনা ও সমাধান বিবৃত হয়েছে। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনের নানা দিক বেশ গুরুত্বের সাথে এতে স্থান পেয়েছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি এবং পররাষ্ট্রনীতিসহ আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত সকল ধারণার ক্ষেত্রে পালনীয় কর্তব্য ইসলাম খুব পরিষ্কারভাবে বাতলে দিয়েছে। তাই ইসলাম হল কালোত্তীর্ণ এবং সকল দেশ ও অঞ্চলের জন্য সর্বদা উপযোগী একটি জীবনবিধান।

ইসলামের এ স্বকীয়তা একদিকে মানুষের হৃদয়কে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছে এবং এর ছায়াতলে আশ্রয় নিতে তীব্রভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে, অপরদিকে আচার সর্বস্ব অপরাপর মিথ্যা ধর্মের অনুসারীদের মনে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ভীতি সঞ্চার করেছে। ফলে তারা ইসলাম ও তার অনুসারীদের অগ্রযাত্রার পথ রোধকল্পে যুগে যুগে তাদের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছে এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। সম্মুখ সমরে অব্যাহত পরাজয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তারা বেছে নেয় ষড়যন্ত্রের কুটিল পথ। তারা স্বীয় ধর্মকে গোপন রেখে ইসলাম গ্রহণের নামে, মুসলিম নাম ধারণ করে, পূর্ব ধর্মের বা দর্শনের নানা তত্ত্বকথা হাযির করে ইসলাম ও মুসলিমদের মাঝে ছড়াতে থাকে সন্দেহ-সংশয়ের বীজ। ফলে জন্ম নিতে থাকে বিভিন্ন ভ্রান্ত দল-উপদল; যারা তাদের ভ্রান্ত মূলনীতির কারণে ইসলামের কালোত্তীর্ণতা ও যুগোপযোগীতাকে প্রমাণকারী শরীয়ার অন্যতম উৎস সুন্নাহকে অস্বীকার করা শুরু করে।

অংশবিশেষ অথবা সম্পূর্ণ সুন্নাহ অস্বীকারের সূচনা হয়েছিল খারেজী, রাফেজী শীয়া এবং মু'তাযেলাদের ন্যায় ভ্রান্ত ফেরকা বা তাদের ঔরসে জন্ম নেয়া বিভিন্ন উপদলের হাত ধরে। আর তা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয় উপনিবেশবাদীদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে এবং প্রাচ্যবিদদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং ভ্রান্ত ফেরকা "আহলে কুরআন" নামে দলগতভাবে সম্পূর্ণ সুন্নাহ অস্বীকারকারীদের মাধ্যমে। আলোচ্য প্রবন্ধে সুন্নাহ অস্বীকারের অতীত থেকে নিয়ে বর্তমান পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং আল-কুরআনের দর্পণে সুন্নাহর প্রামাণিকতা উপস্থাপনের প্রয়াস পাব বি ইযনিল্লাহ। তবে মূল বক্তব্যে প্রবেশ করার পূর্বে আমাদের দু'টি বিষয় জেনে রাখা প্রয়োজন; আর তা হলো:

১. সুন্নাহ বলতে কী বুঝায়?

আভিধানিক অর্থে সুন্নাহ বলতে বুঝায়: (السيرة والطريقة حسنة كانت أو قبيحة) পথ, রীতি, পদ্ধতি, আদর্শ, জীবনধারা; চাই তা উত্তম হোক বা মন্দ হোক
যেমন হাদীসসে এসেছে, রাসূল ﷺ বলেছেন,

من سنَّ في الاسلام سُنِّةً حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً، ومن سنَّ في الإسلام سُنَّة سيئةً كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً

অর্থ, "যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম রীতির প্রচলন করবে সে তার সওয়াব পাবে এবং পরবর্তীকালে সে অনুযায়ী যে ব্যক্তি আমল করবে তার সওয়াবও লাভ করবে। এতে তাদের নেকী বিন্দুমাত্র কমবে না।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামে মন্দ রীতি প্রবর্তন করবে, সেই মন্দের পাপের ভার তার উপর বর্তাবে এবং পরবর্তীকালে যে ব্যক্তি উক্ত অসৎ কর্ম সম্পাদন করবে তার পাপের ভারও প্রবর্তকের উপর বর্তাবে। আর এতে তাদের পাপ বিন্দুমাত্রও কমবে না"।[১]

পারিভাষিক অর্থে সুন্নাহ হলোঃ "রাসূল ﷺ এর কথা, কাজ, স্বীকৃতি, জীবনীবৃত্তান্ত এবং তার চারিত্রিক ও দৈহিক বর্ণনা।"[২]

এ দিক থেকে জুমহুর মুহাদ্দিসীনদের নিকট সুন্নাহ ও হাদীসের মাঝে কোন পার্থক্য নেই বরং একটি আরেকটির সমার্থক। তবে কিছু মুহাদ্দিসীনদের নিকট পার্থক্য রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো,

সুন্নাহ ও হাদীসের মাঝে পার্থক্যঃ

১. রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত যা কিছু আমলযোগ্য এবং অনুসরণযোগ্য তাই হল সুন্নাহ। আর যা আমলযোগ্য নয় তা হাদীস হিসেবে স্বীকৃত হলেও সুন্নাহ নয়। আমলযোগ্য না হওয়ার অন্যতম কারণ হল বর্ণিত বিষয়টি রাসূল ﷺ এর সাথে খাস হওয়া অথবা মানসূখ হয়ে যাওয়া; যেমন, চারের অধিক স্ত্রী রাখা, এ বিষয়টি রাসূল ﷺ এর সাথে খাস হওয়ায় তা আমাদের জন্য পালনীয় নয় এবং সুন্নাহ নয়। আর মদপানের শাস্তি হিসেবে চতুর্থ বা পঞ্চমবারে মদ্যপায়ীকে হত্যা করার বিধানটি মানসূখ; তাই এ সম্পর্কিত বর্ণিত হাদীসের উপর উলামাগণ আমল করেননি বিধায় এটিও সুন্নাহ নয়।

২. হাদীস বলতে শুধু রাসূল ﷺ এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো বুঝায় কিন্তু সুন্নাহ বলতে খোলাফায়ে রাশেদা এবং সাহাবাগণের সামষ্টিক আমলকেও বুঝায়। যেমন হাদীসে এসেছে, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين -"তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাহ এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহ অনুসরণ করবে"।[৩]

এ ছাড়াও আরো কিছু পার্থক্য রয়েছে, যা প্রবন্ধের কলেবর বিবেচনায় দীর্ঘায়িত করা সমীচীন মনে করছি না।

২. সুন্নাহ অস্বীকারের ধারণার স্বরূপ বিশ্লেষণঃ

সুন্নাহ অস্বীকারের নানা ধরণ ও রূপ রয়েছে

১. এ বিশ্বাস করা যে, শুধু কুরআন মানাইযথেষ্ট, হাদীস মানার প্রয়োজন নেই এবং ইসলামী শরীয়ার একমাত্র উৎস হল আল-কুরআনুল কারীম। এটি বর্তমানে 'আহলে কুরআন' নামক হাদীস অস্বীকারকারী ভ্রষ্ট দলের আক্বীদা ও বিশ্বাস। অতীতে চরমপন্থী খারেজীরা এ বিশ্বাস লালন করত। (এটি হলো সবচেয়ে জঘন্য পর্যায়ের)

২. শুধুমাত্র মুতাওয়াতির অস্বীকার করা, হাদীস গ্রহণে বিবেক-বুদ্ধিকে বিচারকের আসনে বসিয়ে হাদীস যাচাই-বাছাই করে মনঃপুত হলে গ্রহণ করা। এটি মু'তাযেলা সম্প্রদায়ের আক্বীদা-বিশ্বাস। বর্তমানে বাংলাদেশেও এ ধরণের আকীদা-বিশ্বাসের অনুসারী কতিপয় ব্যক্তি ও ফাউন্ডেশনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

৩. মুতাওয়াতির হাদীস সর্বোতভাবে গ্রহণ করা, তবে খবরে ওয়াহেদ শুধু বিধিবিধানের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা আর আকীদার ক্ষেত্রে অস্বীকার করা। এটি কালামী আশয়ারীদের নীতি।

৪. হাতে গোনা পাঁচ বা সর্বোচ্চ পনেরোজন সাহাবী ব্যতীত সকল সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীসকে অস্বীকার করা। এটি শীয়াদের নানা উপদলের আক্বীদা বিশ্বাস। তন্মধ্যে রাফেজী এবং বারো ইমামী ফেরকা অন্যতম।

---

১. সহীহ মুসলিম, ১০১৭

২. সামান্য পরিমার্জিতসহ দেখুন: উসূলুল হাদীস, মুহাম্মাদ আজাজ আল-খত্বীব, পৃ. ১৪

৩. সুনানে আবু দাউদ. ৪৬০৭, সহীহ

সুন্নাহ অস্বীকারের ইতিহাস

সুন্নাহ অস্বীকারের ইতিহাসকে যুগ বা কালের নিরিখে মোটাদাগে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়; সুন্নাহ অস্বীকারের অতীত কাল ও আধুনিক কাল।[৪]

১. অতীতকালে সুন্নাহ অস্বীকারের ইতিহাসঃ

অতীতকালে সুন্নাহ অস্বীকার সংক্রান্ত তথ্যগুলো পর্যালোচনা করলে প্রতিভাত হয় যে, সুন্নাহ অস্বীকারের দু'টি অবস্থা রয়েছে। **প্রথমটি** হলো, ব্যক্তি পর্যায়ে সুন্নাহ অস্বীকার। **দ্বিতীয়টি** হলো, দলগতভাবে সুন্নাহ অস্বীকার করা।

ব্যক্তি পর্যায়ে সুন্নাহ অস্বীকারে প্রবণতা সাহাবীদের যুগের শেষভাগে দৃশ্যমান হয়। এর স্বপক্ষে বসরায় বসবাসকারী প্রখ্যাত সাহাবী ইমরান বিন হুসাইন রাযি. (মৃ. ৫২ হি.) এর সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি উল্লেখ করা যায়। ঘটনাটি হলো, "ইমরান বিন হুসাইন রাযি. তার সাথীদের সঙ্গে কোন এক মাজলিসে বসা ছিলেন। মাজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বলে উঠল, আমাদেরকে শুধুমাত্র কুরআন থেকে বর্ণনা করুন। তখন ইমরান বিন হুসাইন রাযি. তাকে কাছে আসতে বললেন।

অতঃপর তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যদি তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে কুরআনের উপর ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে কি তোমরা কুরআনে যোহরের সালাত চার রাকাত, আসরের সালাত চার রাকাত এবং মাগরিবের সালাত তিন রাকাত; যার প্রথম দু'রাকাতে কিরাত পাঠ করা হয়-এগুলোর বর্ণনা খুঁজে পাবে? যদি তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে কুরআনের কাছে ন্যস্ত করা হয়, তাহলে কি তুমি তাওয়াফের প্রদক্ষিণ সংখ্যা সাতটি এবং সাফা-মারওয়ায় সাতবার সায়ী করার বর্ণনা পাবে? অতঃপর তিনি বললেন, হে লোকসকল, তোমরা আমাদের থেকে হাদীস গ্রহণ করো, আল্লাহর শপথ! নতুবা তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে"।[৫]

প্রখ্যাত তাবেয়ী আইয়ুব আস-সিখতিয়ানী রহ. (মৃ. ১৩১ হি.) বলেন, "যখন কোন ব্যক্তিকে হাদীস বর্ণনা করে শুনাবে আর সে বলবে, আমাদেরকে হাদীস বাদ দিয়ে কুরআন থেকে বর্ণনা করে শোনান। তাহলে জেনে রাখ যে, ঐ ব্যক্তি নিজে পথভ্রষ্ট এবং অন্যকে পথভ্রষ্টকারী"।[৬]

উপরোক্ত দু'টি ঘটনা ও অন্যান্য ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অতীতকালে সুন্নাহ অস্বীকারের ব্যক্তি বিশেষের প্রবণতা প্রথম শতকে শুধু ইরাকেই সীমাবদ্ধ ছিল, অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ডে এর উপস্থিতি ছিল না। কেননা সাহাবী ইমরান বিন হুসাইন রাযি. এবং তাবেয়ী আইয়ুব আস-সিখতিয়ানী রহ. উভয়ে ছিলেন ইরাকের বসরা নগরীর অধিবাসী। অনুরূপভাবে ইমাম শাফেয়ী স্বীয় "ইখতিলাফুল হাদীস" গ্রন্থে যে সকল হাদীস অস্বীকারকারীদের কথা উল্লেখ করেছেন তাদের অধিকাংশ হল বসরার অধিবাসী।[৭]

আর দলগতভাবে সুন্নাহ অস্বীকারের প্রবণতা শুরু হয় হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে। এর স্বপক্ষে প্রমাণ হল ইমাম শাফেয়ী রহ. স্বীয় "আল-উম" গ্রন্থে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন, باب حكاية قول الطائفة التي ردَّت الأخبار كلها -"এই শীরোনামে। যার অর্থ হল, "সেই দলের বর্ণনা সংক্রান্ত অধ্যায় যারা সকল হাদীসকে

---

৪. মাত্বার আয-যাহরানী, তাদবীনুস সুন্নাহ, পৃ. ৪৯, আব্দুল মাজেদ আল-গৌরী, ইনকারুস সুন্নাহ, পৃ. ৪১

৫. ইমাম বায়হাকী, মাদখালুদ-দালায়েল, ১/২৫, খত্বীব বাগদাদী, আল-কিফায়াহ, পৃ. ৪৮, ইবনে আব্দুল বার, আল-জামে লি আখলাকি.., ২/১৯১

৬. মাত্বার আয-যাহরানী, তাদবীনুস সুন্নাহ, পৃ. ৪৯

৭. আব্দুল মাজেদ, ইনকারুস সুন্নাহ, পৃ. ৪২

প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকার করেছে" ।[৮] লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, ইমাম শাফেঈ সমস্ত হাদীস অস্বীকারকারী দলটির নাম উল্লেখ করেননি। তবে আহলে কুরআন ফেরকা বিষয়ের বিশিষ্ট গবেষক খাদেম হুসাইন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ইমাম শাফেঈ রহ. এর বর্ণিত দলটি হল খারেজীদের দল।[৯]

অতীতে খারেজীরা ছাড়াও সুন্নাহ অস্বীকারের ফেতনায় আক্রান্ত হয়েছে রাফেজী শীয়া, মু'তাযেলা এবং কালামী আশয়ারীগণ। তবে খারেজীরা ছাড়া বাকী ফেরকাগুলো সমগ্র সুন্নাহকে অস্বীকার করেনি। বরং তারা দলভেদে অংশবিশেষ বা অধিকাংশ সুন্নাহকে অস্বীকার করেছে।

২. আধুনিককালে[১০] সুন্নাহ অস্বীকারের ইতিহাস

আধুনিককালে সুন্নাহ অস্বীকারের প্রবণতা বৃটিশ ভারতে এবং আরব বিশ্বের মিশরে বেশ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত বৃটিশ ভারতে সুন্নাহ অস্বীকারের ইতিহাস বর্ণনা করতে গেলে যার নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয় তিনি হলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান (মৃ. ১৮৯৮ খ্রি.)। তিনি হাদীস ও রাবীদের বিষয়ে নানা সন্দেহ-সংশয়ের অবতারণা করেন এবং ইসলামের এমন সব ব্যাখ্যা হাজির করেন যা ইংরেজদের বয়ানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তার দেখানো পথ অনুসরণ করেন মাওলানা চেরাগ আলী এবং তিনি সৈয়দ আহমদের চিন্তা-চেতনার পক্ষে অবস্থান করে সেটাকে ডিফেন্স করেন।

পর্দা, জিহাদসহ ইসলামের বহু বিধান সংশ্লিষ্ট হাদীসের অপব্যাখ্যার পরে সে একসম দাবী করে বসে যে, শুধু কুরআন মানাই যথেষ্ট।[১১] এদের দেখানো পথ ধরেই পরবর্তীতে পাঞ্জাব প্রদেশের গোলাম নাবী ওরফে আব্দুল্লাহ চকড়ালবী ১৯০২ সালে হাদীস অস্বীকার করে শুধু কুরআন মানার আন্দোলন শুরু করে। এ ক্ষেত্রে সে লাহোরে অবস্থিত জিনিয়ান ওয়ালী মসজিদকে তার সংগঠনের সদর দফতর হিসেবে গ্রহণ করে কার্যক্রম চালাতে থাকে। এভাবেই মূলত ভারতীয় উপমহাদেশে আহলে কুরআন নামক হাদীস অস্বীকারকারীদের সাংগঠনিক যাত্রার সূচনা হয়।[১২] অপরদিকে আরব বিশ্বে হাদীস অস্বীকার করার চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেয় দু'টি গোষ্ঠী; তারা হল,

এক. নিজেদেরকে সংস্কারবাদী পরিচয় দেয়া প্যান ইসলামিজমের নেতা জামালুদ্দীন আফগানী (১৮৩৩-১৮৯৭ খ্রি.) ও তার শিষ্য মুহাম্মাদ আবদুহু (১৮৪৯-১৯০৫ খ্রি.)। তারা তাদের চিন্তা-চেতনা 'আল-মানার' ম্যাগাজিন ও আবু রয়া কর্তৃক রচিত 'আদওয়া আলাস-সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ' গ্রন্থের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে থাকে।

দুই. কিছু মুসলিম লেখক ও সাহিত্যিক; যারা ফ্রান্স, বৃটেন ও জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যবিদ শিক্ষকদের নিকট পড়াশোনা করেছে; ফলে হাদীস কেন্দ্রিক তাদের পুশ করা সন্দেহ-সংশয় নিয়ে এরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে এবং তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে থাকে। এদের অন্যতম হল ত্বহা হুসাই এবং আহমদ আমীন।[১৩]

অতীতে সুন্নাহ অস্বীকারকারী কতিপয় ভ্রান্ত ফেরকা

১. খারেজী ফেরকা:

খারেজীদের পরিচয়:

মুহাম্মাদ শাহরাস্তানি রহ. (মৃ. ৫৪৮হি.) বলেন,

৮. শাফেঈ, মুহাম্মাদ বিন ইদরিস, আল উম, ৭/২৭৩
৯. খাদেম হুসাইন, আল-কুরআনিয়্যূন পৃ. ৯৭
১০. সাধারণত ১৫০০ খ্রি. থেকে বর্তমান সময়কে আধুনিককাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়
১১. আল-কুরআনিয়্যূন পৃ. ৯৯-১০৭
১২. আল-কুরআনিয়্যূন, পৃ. ১৯
১৩. মাতার আয যাহরানি, তাদবীনুস সুন্নাহ পৃ, ৫২-৫৩

(الخوارج كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة)
অর্থ: "মুসলিম জামাতের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে মনোনীত ন্যায়সঙ্গত বৈধ ইমামের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে; তারাই খারেজী"।[১৪]

হাদীস মানার বিষয়ে খারেজীদের অবস্থান:

তাদের কিছু মূলনীতি রয়েছে; যেগুলোর আলোকে হাদীসের বিষয়ে তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তাদের উল্লেখযোগ্য মূলনীতির অন্যতম হল,

১. কুরআনের বিপরীত হাদীসসমূহ প্রত্যাখ্যান করা। এ প্রসঙ্গে শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া রহ. (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেন, "খারেজীরা যে সকল হাদীসকে কুরআনের বিপরীত মনে করে সেগুলোর অনুসরণ করার প্রয়োজন বোধ করে না। যেমন, রজম এবং চুরির নেসাব সংক্রান্ত বর্ণিত হাদীস"।[১৫] অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন আব্দুল কাহের আল-বাগদাদী রহ.(মৃ. ৪২৯ হি.) স্বীয় 'উসুলুদ্দীন' গ্রন্থে (পৃ. ১৯); তিনি বলেন, "খারেজীরা মনে করে, শরয়ী আহকামের ক্ষেত্রে একমাত্র দলীল হল কুরআনুল কারীম"।

তাদের কিছু উপদল পাঁচ ওয়াক্ত সালাত অস্বীকার করে। যেহেতু পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সুস্পষ্ট নির্দেশনা কুরআনে বর্ণিত হয়নি।[১৬]

২. কবীরা গুনাহকারীকে তাকফীর করা এবং সালিশী বৈঠকের পরে আলী রাযি. ও মুয়াবিয়া রাযি. সহ উভয় পক্ষের অনুসারীদেরকে তাকফীর করার কারণে জুমহুর সাহাবায়ে কেরাম তাদের নিকট কাফের হয়ে গেছে। তাই সাহাবীদের কর্তৃক বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।[১৭]

২. রাফেজী শীয়া ফেরকা

রাফেজী শীয়াদের পরিচয়:

রাফেজীদের পরিচয়ে ড. গালেব আওয়াজী বলেন:

"রাফেজী বলতে এমন মতবাদসম্পন্ন দলকে নির্দেশ করে, যারা আবু বকর রাযি. ও উমর রাযি. এর খেলাফতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অধিকাংশ সাহাবীকে অস্বীকার করে। তারা বিশ্বাস করে যে, খেলাফত আলী রাযি. ও তার বংশধরদের মাঝে নির্ধারিত হওয়ার ব্যাপারে নাবী ﷺ মৌখিক বক্তব্য দিয়ে গেছেন। তারা মনে করে যে, অন্যদের খেলাফত বাতিল, অবৈধ"।[১৮] রাফেজী শীয়াদের অন্তর্ভুক্ত হল বারো ইমামে বিশ্বাসী শীয়াগণ। বর্তমান ইরানের রেজিম, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশে অবস্থিত অধিকাংশ শীয়া মতবাদে বিশ্বাসীরাই রাফেজী উপদলের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসের বিষয়ে রাফেজী শীয়াদের অবস্থান:

নাবী ﷺ এর মৃত্যুর পর অল্পসংখ্যক সে অল্প সংখ্যক সাহাবী কারো মতে পনের জন, কারো মতে পাঁচজন; তাঁরা হলেন, সালমান ফারেসী, মিকদাদ, আম্মার বিন ইয়াসের, হুজায়ফা এবং আলী ﷺ সাহাবী ব্যতীত সকল সাহাবায়ে কেরামের উপর মুরতাদ ও পথভ্রষ্টতার হুকুম আরোপ করার কারণে তারা সাহাবীদের থেকে

---

১৪. শাহরাস্তানি, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল পৃ. ১০৬
১৫. মাজমুউল ফাতাওয়া, ১৩/২০৮
১৬. ইবনু হাযম, আল-ফাসলু ফিল মিলাল ওয়ান নিহাল পৃ. ২/৯০
১৭. ইনকারুস সুন্নাহ, আব্দুল মাজেদ, পৃ. ৫৬
১৮. ড. গালেব আওয়াজী,ফিরাক মুয়াসিরাহ, ১/৩৪৪

বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করে না। আর সাহাবীদের উপর মুরতাদ ও পথভ্রষ্টতার হুকুম আরোপ করার কারণ হল তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস, যে বা যারাই আলী রাঃ কে খলীফা হিসেবে মেনে নেই নাই সে বা তারাই রাসূল ﷺ এর অসীয়তের খেয়ানত করেছে।[১৯]

ফলে তারা সাহাবীদের মানাক্বেব বা মর্যাদা সম্পর্কিত বর্ণিত হাদীসসমূহ অস্বীকার করে এবং তাদের আকীদা ও বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত হাদীস ছাড়া বুখারী, মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসগ্রন্থের হাদীস মানে না।

৩. মু'তাযেলা ফেরকা

মু'তাযেলা ফেরকার পরিচয়:

মু'তাযেলা ফেরকার পরিচয়ে ড. গালেব আওয়াজী বলেন, المعتزلة أسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في القرن الثاني الهجري ما بين سنة ٥٠١ وسنة ١١٠هـ، بزعامة رجل يسمي واصل بن عطاء الغزال.- "মু'তাযেলা বলতে সে দলকে বুঝায়, যে দল ওয়াসেল বিন আত্বা নামক একজন ব্যক্তির নেতৃত্বে ১০৫-১১০ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে ইসলামের মাঝে আত্মপ্রকাশ করে"।[২০]

হাদীসের বিষয়ে মু'তাযেলাদের অবস্থান: বিস্তারিত জানতে পড়ুন আবু লুবাবাহ হুসাইন রচিত 'মাওকিফুল মু'তাযেলা মিনাস সুন্নাহ।[২১] সাহাবীদের আদালতকে (ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যবাদিতাকে) প্রশ্নবিদ্ধ করা, ক্ষেত্রবিশেষ অস্বীকার করা।

আক্বল তথা বুদ্ধি-বিবেবকে হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে মানদণ্ড বা বিচারক নির্ধারণ করা। সুতরাং বিবেকের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হাদীস গ্রহণ করা এবং অনুত্তীর্ণ হাদীসকে দুর্বল আখ্যায়িত করে প্রত্যাখান করা। ফলে তারা আল্লাহর সিফাত তথা গুণাবলী, কবরের আযাব, রাসূল নবী এর মুজিযা, কিয়ামতের মাঠের অবস্থার বর্ণনা, আল্লাহর দর্শন লাভ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ অস্বীকার করেছে।

খবরে ওয়াহেদ কে দলীল হিসেবে অস্বীকার করা তবে যদি এর বর্ণনাকারী কমপক্ষে চারজন হয় বা খবরে ওয়াহেদের বর্ণনা কুরআনের বাহ্যিক নির্দেশনার সাথে মিলে যায় বা তদানুযায়ী কোন সাহাবীর আমল পাওয়া যায়; তাহলে গ্রহণীয় হবে।

মু'তাযেলা সম্প্রদায়ের পাঁচটি মূলনীতি হল:

১. তাওহীদ: আল্লাহর সিফাত অস্বীকার করা, কুরআনকে মাখলুক হিসেবে বিশ্বাস করা ইত্যাদি।

২. আদল: তাকদীর অস্বীকার করা, ভাল-মন্দ নির্বাচনে বিবেককে বিচারক মানা।

৩. মানযিলা বাইনাল মানযিলাতাইন: কবীরা গুনাহকারী দুনিয়াতে মুমিন বা কাফির নয় বরং উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে, তবে আখেরাতে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

৪. আল-ওয়াদ ওয়াল ওয়ীদ: হুমকীমূলক হাদীসগুলোকে বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করা।

৫. আমর বিল-মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার: শরয়ী মূলনীতি পর্যালোচনা করা ছাড়াই অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আবশ্যক মনে করা।[২২] সাথে সাংঘর্ষিক সকল হাদীসকে প্রত্যাখান করা।

উপরোক্ত ফেরকাগুলো ছাড়াও আরো কিছু ফেরকা রয়েছে যারা নিজেদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন মূলনীতির আলোকে হাদীস অস্বীকার করে থাকে এবং হাদীস ও তার বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে থাকে; সময় এবং কলেবর বিবেচনায় তাদের আলোচনা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উপস্থাপন করা সমীচীন মনে করছি না।

---

১৯. আব্দুল মাজেদ, ইনকারুস সুন্নাহ, পৃ. ৪৭

২০. ড. গালেব আওয়াজী, ফেরাক মুয়াসিরাহ, ৩/১১৬৩

২১. সুন্নাহ', আব্দুল মাজেদ, ইনকারুস সুন্নাহ, পৃ. ৫৭

২২. ইনকারুস সুন্নাহ, পৃ. ৫৭, মাওকিফুল মু'তাযেলা, পৃ. ৪১

আল-কুরআনের দর্পণে সুন্নাহর প্রামাণিকতা

এতক্ষণের আলোচনা থেকে হাদীস অস্বীকারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে পাঠকবৃন্দ আশা করি একটা মৌলিক ধারণা লাভ করতে পেরেছেন। আপনারা ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন যে, যারা হাদীস অস্বীকার করে তাদের সকলের স্বতন্ত্র মূলনীতি রয়েছে। যে গুলো অপনোদনে আহলুস সুন্নাহর আলেমগণ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন; যা থেকে পাঠক সমাজ উপকৃত হতে পারে। তবে উল্লিখিত ফেরকাগুলো আংশিক বা সম্পূর্ণ হাদীস অস্বীকার করলেও কুরআন মানার ব্যাপারে সবাই একমত, চরমপন্থী রাফেজীরা ছাড়া। তাই সবার মূলনীতি আলাদভাবে খণ্ডন করার চেয়ে তারা যে কুরআনকে চিরসত্য হিসেবে মানে; সেই কুরআনে হাদীসের ব্যাপারে কী বলা হয়েছে -তা উপস্থাপনের চেষ্টা করব, ইন শা আল্লাহ। যাতে প্রমাণিত হয় যে, তারা হয় কুরআন মানে না, নতুবা বুঝে না।

১. সুন্নাহও অহী

প্রথমত আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, কুরআন যেমন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ অহী তদ্রুপভাবে সুন্নাহও আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ অহী। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى -"আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তাতো কেবল অহী, যা তার প্রতি অহীরূপে প্রেরিত হয়"।[২৩] অত্র আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাসূল সাঃ যাই বলেন তাই অহী, সুতরাং রাসূল ﷺ এর সুন্নাহও অহী। যদি কোন কিছুকে বাদ দিতে হয় তাহলে তার জন্য স্বতন্ত্র দলীল দিতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা নাবী সাঃ সম্পর্কে বলেন, إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ -"আমার প্রতি যা অহী করা হয়, আমি শুধু তারই অনুসরণ করি"।[২৪] অর্থাৎ নাবী সাঃ শুধু অহীর অনুসরণ করেন। এখান থেকে প্রমাণিত হয় রাসূল ﷺ এর যাবতীয় কথা, কর্ম, সাহাবীদের আমলের অনুমোদন সবই অহীর অনুসরণে সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং সুন্নাহ হল অহী।

তিনি আরো বলেন, قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ -"বলুন, আমি তো শুধু অহী দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি"।[২৫] অত্র আয়াত থেকে সুন্নাহ অহী হওয়ার দিকটি প্রতীয়মাণ হয় এভাবে যে, আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺ কর্তৃক স্বীয় কওমের মানুষদের সতর্কীকরণকে সীমাবদ্ধ করেছেন তার প্রতি প্রদত্ত অহীর মাঝে। আর রাসূল ﷺ এর সতর্কীকরণ প্রক্রিয়াটি নিশ্চিতভাবেই কুরআন ও সুন্নাহ উভয়টির মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছিল। সুতরাং এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, সুন্নাহ হল কুরআনের মতই অহী।[২৬]

২. সুন্নাহ হলো আল-কুরআনের ব্যাখ্যা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে অনেক বিধিবিধান সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তার বিশদ বর্ণনার ভার রাসূল ﷺ এর উপর অর্পণ করা হয়েছে; এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"আর আমি আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন এবং যাতে তারা চিন্তা করে"।[২৭] অত্র আয়াত থেকে প্রমাণিত হল যে, সুন্নাহ হল

২৩. *সূরা আন-নাজম, ৫৩/৩-৪*
২৪. *সূরা আল-আনআম, ৬/৫০*
২৫. *সূরা আল-আম্বিয়া, ২১/৪৫*
২৬. *মোল্লা খাতির আযামি, আস-সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যাহ ওয়াহয়ুন, পৃ, ২৬*
২৭. *সূরা আন-নাহাল, ১৬/৪৪*

কুরআনের ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাস্বরূপ। সুতরাং কেউ যদি হাদীস না মানে তাহলে সে কুরআনের এ আয়াত অস্বীকার করল এবং তার জন্য ইসলামী বিধিবিধান পালন অসম্ভব হয়ে পড়বে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কুরআনে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে কিন্তু সালাতের পদ্ধতি, ওয়াক্ত কখন শুরু হয়ে কখন শেষ হবে - এ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। বরং এর দায়িত্ব রাসূল সাঃ এর উপর আল্লাহ তায়ালা ন্যস্ত করেছেন।

৩. সুন্নাহর বিচারিক মর্যাদা

মহান আল্লাহ বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"কিন্তু না, আপনার রবের শপথ তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়"।[২৮]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

-"আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়সালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের কোন ভিন্ন সিদ্ধান্তের ইখতিয়ার সংগত নয়। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হলো"।[২৯] তিনি আরো বলেন,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

-"মুমিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় যেন তিনি তাদের মাঝে ফায়সালা করেন; তখন তাদের বক্তব্য তো শুধু এই যে, তারা বলবে শুনলাম এবং মানলাম। আর তারাই সফলকাম। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহকে ভয় করবে এবং তার আযাব থেকে বেঁচে থাকবে; তারাই কৃতকার্য হবে"।[৩০]

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, যে ব্যক্তি বা যারা রাসূল সাঃ এর বিচার মানে না সে ব্যক্তি বা তারা মুমিন নয়। রাসূল সাঃ নবুওয়াতের দীর্ঘ ২৩ বছরে বিশেষত মাদানী জীবনে অনেক বিচার-ফায়সালা করেছেন; সেগুলো কেউ যদি অস্বীকার করে, তাহলে কুরআনের ভাষ্যমতে সে মুমিন নয়। আর রাসূল সাঃ এর বিচার-ফায়সালগুলো সুন্নাহর অন্তর্গত। সুতরাং যারা সুন্নাহ মানে না তারা মুমিন নয়। এখন যারা কুরআন মানে কিন্তু হাদীস মানে না, তাদের নিকট প্রশ্ন; তারা চোরের হাত কতটুকু কাটবে? মদপানের কী শাস্তি দিবে? বিবাহিত পুরুষ বা নারী ব্যভিচার করলে তাদের কী শাস্তি দিবে? সমকামিতায় লিপ্ত হলে তার শাস্তি কী হবে? এ গুলোর কুরআন থেকে কি কোন সদুত্তোর দিতে পারবে? নাকি তারা এ ক্ষেত্রে পশ্চিমা আইন ফলো করবে?

৪. রাসূল ﷺ এর সুন্নাহের আনুগত্যের নির্দেশ

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

---

২৮. সূরা আন-নিসা, ৪/৬৫

২৯. সূরা আল-আহযাব, ৩৩/৩৬

৩০. সূরা আন-নূর, ২৪/৫১-৫২

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না"।[৩১]

তিনি আরো বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

-"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, আরও আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের, অতঃপর কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর নিকট"।[৩২]

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে রাসূল ﷺ এর আনুগত্যের কথা স্বতন্ত্রভাবে বলা হয়েছে। "আর রাসূল ﷺ এর আনুগত্যের অর্থ হল, তার ঐ সকল আদেশ ও নিষেধ মান্য করা যেগুলো কুরআনে আসে নাই। যদি কুরআনে আসত, তাহলে তা মান্য করলে আল্লাহর আনুগত্য হিসেবে গণ্য হত"।[৩৩] সুতরাং এখান থেকে রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ দলীল হওয়া প্রমাণিত হল। অনুরূপভাবে শেষের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মতভেদ ঘটলে তার সমাধান বাতলে দিয়েছেন এই বলে যে, 'তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও তার রাসূলের নিকট'।

আল্লাহর নিকট উপস্থাপিত করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল কুরআনের নিকট উপস্থাপন করা। রাসূলের নিকট উপস্থাপিত করা মানে মৃত্যুর পরে তার সুন্নাতের নিকট উপস্থাপিত করা। আর এ বিষয়ে সকল মুসলিমগণ একমত।[৩৪]

৫. আল্লাহর ভালবাসা অর্জন রাসূল সাঃ এর সুন্নাহ অনুসরণের সাথে শর্তযুক্ত

মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"।[৩৫] রাসূল সাঃ এর জীবদ্দশায় রাসূল সাঃ এর অনুসরণ করে আল্লাহর ভালবাসা লাভ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু রাসূল সাঃ এর মৃত্যুর পরে তার হাদীস অস্বীকার করে তাকে অনুসরণ করার পদ্ধতি কী? তাহলে কি এই আয়াত বর্তমানে আমলযোগ্য নয়? হাদীস অস্বীকারকারীরা কী জবাব দিবেন?

৬. নিঃশর্তভাবে রাসূল সাঃ এর সুন্নাহ গ্রহণ করে নেয়ার নির্দেশ

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক"।[৩৬]

আলোচ্য আয়াতটি প্রমাণ করে যে, রাসূল সাঃ এর আদেশ-নিষেধ সংক্রান্ত যাবতীয় নির্দেশনা বিনা শর্তে মেনে নিতে হবে এবং তা শরীয়তের আইনী উৎস। চাই সে বিষয়ে কুরআনের ভাষ্য বিদ্যমান থাক বা না থাক। যদি কেউ দাবী করে যে, 'শুধু ঐ বিষয়গুলো মানতে হবে যা কুরআনের সাথে মিলে যায়' তাহলে তার এ দাবীর পক্ষে কুরআন থেকে দলীল পেশ করতে হবে; নতুবা তার এ দাবী পরিতাজ্য বলে বিবেচিত হবে আলোচ্য

৩১. *সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭/৩৩*
৩২. *সূরা আন-নিসা, ৪/৫৯*
৩৩. *শাতিবি, আল-মুওয়াফাকাত ৪/৩২১*
৩৪. *ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন, ১/৪৯*
৩৫. *সূরা আলে ইমরান, ৩/৩১*
৩৬. *সূরা আল-হাশর, ৫৯/৭*

আয়াতের বক্তবের প্রেক্ষিতে। আর যে সকল হাদীসে এসেছে যে, "আমার পক্ষ থেকে যদি তোমাদের নিকট কোন হাদীস পৌঁছে থাকে তাহলে তোমরা সেটাকে কুরআনের সামনে পেশ করবে। যদি কুরআনের সাথে মিলে যায় তাহলে তা আমি বলেছি বলে ধরে নিবে। আর যদি কুরআনের ভাষ্যের বিপরীত হয়; তাহলে ধরে নিবে আমি তা বলি নাই"। এ ধরণের শব্দে বর্ণিত কোন হাদীসই সহীহ নয়।[৩৭]

৭. সুন্নাহর অবাধ্যচরণে শাস্তির হুমকি

মহান আল্লাহ বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"কাজেই যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতে তারা আক্রান্ত হবে"।[৩৮]

অত্র আয়াতটি নির্দেশ করে যে, সুন্নাহ মেনে চলা আবশ্যক ও তা শরীয়তের দলীল। কেননা সুন্নাহ মেনে চলা যদি আবশ্যকীয় বিষয় এবং দলীল না হত তাহলে তার বিরুদ্ধাচরণে শাস্তির হুমকি দেওয়া হত না। শাস্তি তো কেবল আবশ্যকীয় বিষয় লঙ্ঘনেই প্রদান করা হয়ে থাকে। তাই সুন্নাহ মেনে নেওয়া আবশ্যক।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মাণ হয় যে, হাদীস অস্বীকার করে শুধুমাত্র কুরআন মানার যে দাবী তার উৎপত্তি হাজার বছর পূর্বেই হয়েছে। আজকের আহলে কুরআন নামক হাদীস অস্বীকারকারীদের পূর্বসূরী হল বাতিল ফেরকা খারেজী, মু'তাযেলী, রাফেজী এবং কালামী আশয়ারীগণ। যাদের ভ্রষ্টতার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর আলেমগণ যুগে যুগে বক্তব্য, লেখালেখি এবং পাবলিক লেকচারের মাধ্যম মুসলিমদের সচেতন করেছেন। তাদের চিন্তা-চেতনাকে ধারণ করে উপনিবেশের কোলে লালিত-পালিত আহলে কুরআন নামক হাদীস অস্বীকারকারী ফেরকারও বাতিল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। বরং শাইখ বিন বায রহ. সহ অনেক বিজ্ঞ আলেম এদেরকে তাকফীর করেছেন। তাদের ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বনে রাসূল ﷺ এর এই একটি হাদীসই যথেষ্ট, আর তা হল: আবু রাফে রাঃ হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, "আমি তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় যেন না পাই যে, সে তার আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে এবং সে অবস্থায় আমার প্রদত্ত কোন আদেশ বা নিষেধ তার নিকট পৌঁছলে সে বলবে, আমি কিছু জানিনা। আল্লাহর কিতাবে আমরা যা পাবো শুধু তার অনুসরণ করবো"।[৩৯]

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

৩৭. *ইবনু আব্দিল বার, জামেউ বায়ানিল ইলম, ২/১১৮৯*

৩৮. *সূরা আন-নূর, ২৪/৬৩*

৩৯. *সুনান আত তিরমিযি, ২৬৬৩, সহীহ*

ড. মো. হাবিবুল্লাহ
কেন্দ্রীয় মজলিসে আম সদস্য ও
মুফাসসির, মদীনাতুল উলুম কামিল মাদরাসা, রাজশাহী।

বিশ্ব নেতাদের প্রতি রাসূল ﷺ এর দাওয়াতি পত্র: কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

একটি শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র দাওয়াহর জন্য সবচেয়ে বড় সহায়ক। আল্লাহর করুণায় যখন মদীনায় হিজরত সম্ভব হয়, তখন ইসলামী দাওয়াহর প্রথম আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। যার কেন্দ্র ছিল মদিনা মুনাওয়ারা। হিজরত মুসলমানদের দ্বীনের সুরক্ষা ও স্বাধীনভাবে ইবাদতের সুযোগ দেয়। যা ছিল ইসলামী দাওয়াহর ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যেহেতু ইসলাম একটি বিশ্বজনীন দাওয়াহ, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য অপরিহার্য ছিল এর বাস্তব প্রয়োগ। তিনি তাঁর সময়ের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ও মাধ্যমগুলো ব্যবহার করেন এই আদর্শকে বাস্তব রূপ দিতে। সেই মাধ্যমগুলোর অন্যতম ছিল-দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম প্রচার ও পরিচয় প্রদান। তিনি দূত পাঠান কূটনৈতিক বার্তা সহকারে, যেগুলো ছিল আরব উপদ্বীপের ও উপদ্বীপের বাইরের রাজা, আমির ও গোত্রনেতাদের উদ্দেশ্যে ইসলামের দাওয়াহ। পাশাপাশি, তিনি নিজেও অন্য নেতাদের প্রেরিত দূতদের আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতেন, সম্মান জানাতেন, এবং উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ কূটনৈতিক আচরণ করতেন-এই সবকিছুই ছিল তাঁর মহৎ চরিত্র, আরব সংস্কৃতি, কূটনৈতিক দক্ষতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ইসলামের মূলনীতির প্রকাশ।

এক. কূটনীতিক হিসেবে রাসূল ﷺ-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক. বাহ্যিক রূপ ও অভ্যন্তরীণ গুণের সমন্বয়: কোনো ব্যক্তি তখনই প্রকৃত কূটনীতিক হতে পারেন, যখন তাঁর মধ্যে দুইটি গুণ বিদ্যমান থাকে: সুন্দর চেহারা ও উত্তম চরিত্র-অর্থাৎ বাহ্যিক রূপ ও অভ্যন্তরীণ গুণের সমন্বয়। আধুনিক বিশ্ব কূটনীতিক নির্বাচন করতে গিয়ে এই দুইটি গুণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে একজন সফল কূটনীতিকের যাবতীয় গুণাবলি পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল-তা বাহ্যিক সৌন্দর্যের দিক থেকেই হোক বা অন্তরের গুণাবলির দিক থেকে। আল্লাহ তাআলা নিজেই তাঁর গুণাবলিকে এমন নিখুঁতভাবে পরিপূর্ণ করেছেন যা সাধারণ মানুষের মধ্যে কল্পনাও করা যায় না। কারণ, তিনি ﷺ এমন এক মহান দায়িত্ব পালনের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন যা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে।[১]

খ. স্পষ্টভাষী ও বাগ্মী: একজন প্রেরিত কূটনীতিকের জন্য অপরিহার্য বিষয় হলো-তিনি যেন স্পষ্টভাষী ও বাগ্মী হন। তাঁর এই ফাসাহাত বা বাক্‌পটুতা তাঁর প্রেরকের চিন্তা-চেতনা ও বার্তাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশে সহায়তা করে, যাতে তিনি সহজভাবে প্রাপক পর্যন্ত বার্তাটি পৌঁছে দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক ফসীহ (স্পষ্টভাষী), جوامع الكلم (স্বল্প ভাষী)[২]। তাঁর ভাষা ছিল মিষ্টি, বক্তব্য ছিল স্বাভাবিকগতিসম্পন্ন ও প্রাঞ্জল, বাক্য ছিল হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী। তিনি ﷺ এমনভাবে কথা বলতেন যে তাঁর কথা শ্রোতার অন্তরে গেঁথে যেত। তিনি ﷺ অতিদ্রুত নয়, বরং থেমে থেমে বলতেন যাতে বক্তব্যের মাঝে চিন্তার ও মনোযোগের অবকাশ থাকে-যা তাঁর ও শ্রোতার উভয়ের জন্যই প্রয়োজনীয়।[৩]

গ. অন্যের মতামত ও প্রস্তাব শোনা: একজন কূটনীতিকের মধ্যে যেসব সঠিক নীতি ও দক্ষতা থাকা উচিত,

---

১. হুসাইনি খাদিজা। প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যোগাযোগ কৌশল শিরোনামে মাস্টার্স থিসিস, মিডিয়া ও যোগাযোগ বিজ্ঞান বিভাগ, আলজেরিয়া, ২০০৪, পৃ. ৯৩

২. সহীহ বুখারী হাদীস নং ২৯৭৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৫২৩

৩. সুনান আবু দাউদ- ৪৮৩৯, সহীহ

তার মধ্যে অন্যতম হলো-তিনি যেন অপর পক্ষের মতামত ও প্রস্তাব ভালোভাবে শোনার পরই কথা বলেন। যখন অন্য পক্ষ তার বক্তব্য শেষ করে, তখন কূটনীতিক বিষয়টি পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করতে পারে এবং সে অনুযায়ী যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন; তিনি কখনো অপর পক্ষের কথা শেষ হওয়ার আগে কথা বলতেন না। বরং তাদের কথা শেষ হওয়ার পর জিজ্ঞেস করতেন: "তুমি কি তোমার কথা শেষ করেছো?" তারপর তিনি কথা শুরু করতেন-যখন তিনি তাদের বক্তব্য বুঝে নিতেন এবং তাদের অভিপ্রায় উপলব্ধি করতেন।

ঘ. বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষা জানার ক্ষমতা: একজন কূটনীতিকের প্রজ্ঞা তখনই সত্যিকারভাবে প্রকাশ পায়, যখন তিনি প্রেরিত জাতির ভাষা ভালোভাবে জানেন। এজন্য উন্নত রাষ্ট্রসমূহ দূত প্রেরণের ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তিদেরই নির্বাচন করে, যারা সে রাষ্ট্রের ভাষা জানে। তাই সফল কূটনীতিকের অন্যতম গুণ হলো-বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষা সঠিকভাবে জানার ক্ষমতা। এটি তার কাজের ভিত্তি, যার মাধ্যমে সে অপর পক্ষের কথা অনুধাবন করতে পারে এবং নিজের বক্তব্য সহজে পৌঁছে দিতে পারে।[৪] রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিটি জাতিকে তাদের নিজ ভাষায় দাওয়াত দিতেন-যারাই হোক, নগরবাসী বা বেদুঈন। নগরবাসীকে তিনি সহজ ও সরল ভাষায় বুঝাতেন, আর গ্রামীণদের তিনি তাদের ভাষার রীতি অনুসারে কথা বলতেন। এটি ছিল তাঁর এক মহান প্রভুর দান এবং তাঁর নবুয়তের অলৌকিকত্বের অংশ।

ঙ. নৈতিক ভিত্তি: ইসলাম নৈতিকতাকে সব সম্পর্ক ও লেনদেনের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছে। বিশেষ করে মুসলিম ও অমুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলাম নৈতিকতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে নৈতিকতা ও রাজনীতির মধ্যে সমন্বয় ইসলামি কূটনীতির অন্যতম অবদান।[৫] ইসলাম নৈতিকতাকে কেবল ব্যক্তিগত বিষয় নয় বরং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করে, যেখানে ব্যক্তিগত আচরণ ও সার্বজনীন নীতি একে অপরের সঙ্গে জড়িত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম আদর্শ ছিলেন। তিনি বিশ্বের রাজা, শাসক ও নেতাদের সাথে উত্তম আচরণ ও কৌশলী ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন করতেন। তিনি ছিলেন এমন একজন রোল মডেল, যাকে অনুসরণ করা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রেরিত দূত ও কূটনীতিকগণ তাঁর শিক্ষা ও চরিত্র অনুসরণ করে যেসব রাষ্ট্রনায়ক ও নেতাদের নিকট গিয়েছেন, তারা কৌশল, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতেন। সেইসাথে তাঁরা আমানতদার, চুক্তিপরায়ণ, এবং কোনো রকম বিশ্বাসভঙ্গ বা প্রতারণা থেকে মুক্ত ছিলেন-এগুলোও ইসলামি কূটনীতির মূল বৈশিষ্ট্য।[৬]

চ. শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সম্পর্ক তৈরী: ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ধর্ম, যা মানবজাতির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। বরং শান্তিপূর্ণ উপায় ব্যর্থ এবং যুদ্ধ অপরিহার্য হলে তবেই ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের পূর্বে অমুসলিমদের চিঠি লিখে ইসলামের দাওয়াত দিতেন, প্রমাণ উপস্থাপন করতেন এবং তাদের সত্য গ্রহণের সুযোগ দিতেন। তিনি আহলে কিতাব, যেমন ইহুদি ও খ্রিস্টানদের তাদের ধর্মে থাকতে দিতেন-তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতেন না।

দুই. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কূটনৈতিক পদক্ষেপ: রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কূটনৈতিক সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ:

---

৪. খাদিজা হুসনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

৫. হায়দার বাদাওয়ী সাদিক: আধুনিক যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির প্রেক্ষাপটে কূটনীতির ভবিষ্যৎ, (এমিরেটস স্টাডিজ অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক রিসার্চ সেন্টার, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬) পৃ. ১৬

৬. সাঈদ আবদুল্লাহ হারিব আল-মুহাইরী। ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্ক: একটি তুলনামূলক গবেষণা, (বৈরুত: মুয়াসসাতুর রিসালাহ লিত তিবায়াহ ওয়ান নাশর ওয়া তাওজি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ৩৪০

ক. দূত প্রেরণ: নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্যই ছিল মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া, তাই মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের শুরু থেকেই বিভিন্ন জাতি, রাজা ও দেশের নিকট রাসূল সা. দূত পাঠাতে থাকেন। তাদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার ও ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা হতো। ড. সাঈদ আবদুল্লাহ হারিব আল-মুহাইরী বলেন, "এই দূতিয়ালী ও পত্র প্রেরণ ছিল ইসলামী কূটনীতির এক অনন্য কাজ। বরং এটি ছিল ইসলামের কূটনৈতিক অঙ্গনে প্রথম ও বিস্ময়কর পদক্ষেপ। নবী সা. তখনও তাঁর জাতির সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম চালাচ্ছিলেন, তবুও তিনি আশাবাদী ছিলেন না যে, সেইসব শক্তিধর রাজারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবেন। বরং দূত প্রেরণ ছিল নবুয়তের বার্তার গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ।"[৭]

খ. প্রতিনিধিদল গ্রহণ করা: যেমনভাবে ইসলামের প্রথম রাষ্ট্র বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে দূত ও প্রতিনিধি পাঠানোর মাধ্যমে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলে, তেমনি প্রতিনিধিদল গ্রহণ করাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। রাসূলুল্লাহ সা. সবসময় তাঁর কাছে আগত দূত ও প্রতিনিধিদলগুলোর যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দিতেন, তাদের আদর-আপ্যায়ন করতেন, যেন তারা ইসলামের বার্তা শুনে স্বাচ্ছন্দ্যে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারে। এটি তাদের জন্য ইসলামের প্রতি আহ্বান ছিল-যাতে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর দীন গ্রহণ করে।[৮] রাসূলুল্লাহ ﷺ এই প্রতিনিধিদের সঙ্গে যে ব্যবহার করতেন, তা ছিল চমৎকার যোগাযোগ কৌশলের নিদর্শন। বর্ণিত আছে, তিনি প্রতিনিধিদের সম্মানার্থে নিজেকে সুসজ্জিত করতেন।[৯] আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো-ইসলামের প্রথম রাষ্ট্র গঠনের শুরুর দিক থেকেই অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদল মদীনায় আগমন করত। বিশেষ করে মক্কা বিজয়ের বছর তো গোটা আরব উপদ্বীপ থেকেই বহু প্রতিনিধিদল ইসলামী রাষ্ট্রে আসতে থাকে। ইবন ইসহাক বলেন, "যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয় করলেন, তাবূকের অভিযান শেষ করলেন, এবং সাকীফ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে বাই'আত দিল, তখন আরবের বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিনিধিদলসমূহ রাসূলের নিকট আসতে শুরু করে।" ইবন হিশাম বলেন, "এই ঘটনা নবম হিজরিতে ঘটে, এবং এ বছরটিকে 'সনাতুল উফূদ' বা 'প্রতিনিধিদলের বছর' বলা হয়।"[১০]

গ. চুক্তি সম্পাদন: আন্তর্জাতিক সম্পর্কে "চুক্তি" বলতে বোঝায়-দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতিতে স্বাক্ষরিত একটি আইনগত চুক্তি, যা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান, দ্বিপাক্ষিক অধিকার-দায়িত্ব নির্ধারণ বা সাধারণ কোনো নিয়ম অনুসরণে প্রতিশ্রুতি দেয়ার উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়।[১১]
ইসলামের প্রথম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই রাসূল সা. এই চুক্তির পন্থা গ্রহণ করেছিল। এটি ছিল তার বহির্বিশ্ব সম্পর্ক সুসংগঠিত করা এবং অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের নিরাপত্তা রক্ষা করার একটি কৌশল, যাতে ইসলাম প্রচারের পথ প্রশস্ত হয়। এসব চুক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল বিভিন্ন বিষয়ের ওপর: সন্ধি, অস্ত্রবিরতি, যুদ্ধবন্দি, নিরাপত্তা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, বাণিজ্য আদান-প্রদান ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হিজরতের পর মদীনায় আসেন, তখন তিনি মদীনার ইহুদিদের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তিতে রাসূল ﷺ তাদের ধর্ম ও সম্পদে স্বাধীনতা দেন এবং তাদের জন্য কিছু শর্ত নির্ধারণ করেন, আবার তাদের থেকেও কিছু শর্ত গ্রহণ করেন।[১২]
ঘ. পরামর্শ ও মীমাংসা: ইসলামের প্রথম রাষ্ট্র পরামর্শ বা মীমাংসার পদ্ধতিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক

৭. *প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১*
৮. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪*
৯. *আল-কাস্তালানী: আল-মাওয়াহিব আল-লাদুনিয়্যাহ বিল-মিনাহ আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৬, খণ্ড ৬, পৃ. ২৯২*
১০. ১০. *ইবন কাসির: আস-সীরাহ আন-নবাবিয়্যাহ, (বৈরুত : দারু ইহইয়া আত-তুরাস, সাল অনির্ধারিত), খণ্ড ৪, পৃ. ৭৬*
১১. *ফাওকুল আদা সামুহি, কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অভিধান, বৈরুত :মাকতাবাতু লুবনান, ১৯৯৬, পৃ. ৩৩৪*
১২. *সাঈদ আব্দুল্লাহ হারিব আল-মুহাইরী: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯*

কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছিল, যার মাধ্যমে বিরোধীদেরকে ইসলামের বার্তার যৌক্তিকতা ও রাষ্ট্রের অবস্থানের প্রকৃত অবস্থা বোঝানো হতো। একইসঙ্গে এটি ছিল একটি মাধ্যম, যার দ্বারা পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সন্ধি, জোট বা চুক্তি গঠনের পথ সুগম করা হতো।[১৩]

৬. রাসূল সা.এর কূটনৈতিক শিষ্টাচার: রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনা ও মীমাংসার সময় যে নম্রতা ও সৌজন্য প্রকাশ করতেন, তা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। যদিও তিনি ছিলেন দৃঢ় মনোবলের অধিকারী এবং নিজের ওপর পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী, তথাপি তাঁর কথোপকথনের পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত কোমল, কঠোরতা ও আগ্রাসন থেকে মুক্ত। তিনি কখনোই বিরোধীদের সম্পর্কে কটু কথা বলতেন না, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতেন না, বা এমন কিছু বলতেন না যা তাদের অসম্মান করে।[১৪] তিনি কখনো কারো কথা মাঝপথে থামিয়ে দিতেন না, বরং পুরো কথা শোনার পর বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিতেন। তাঁর এসব গুণ তাঁকে একজন আদর্শ কূটনীতিক ও মহান রাষ্ট্রনায়কে পরিণত করেছিল।

৩. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাঠানো চিঠিগুলোতে নির্দিষ্ট কোনো তারিখ লেখা ছিল না, কারণ সে সময়ে আরবদের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট বা একক গ্রহণযোগ্য বর্ষপঞ্জি চালু ছিল না। তবে ঐতিহাসিকগণ একমত- রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ার সন্ধি থেকে ফিরে এসে, হিজরি ৬ সালের জিলহজ মাসে বিভিন্ন রাজা ও শাসকদের কাছে চিঠি পাঠাতে শুরু করেন, যেখানে তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান।[১৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ার সময় উপলব্ধি করেন-শুধু আরবের মধ্যেই নয়, বরং বাইরের জাতিগুলোর মধ্যেও ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার সময় এসেছে। তিনি সাহাবিদের নির্দেশ দিলেন-সব মুসলমানকে একত্র করতে। একদিন ফজরের নামাজের পর তিনি সাহাবিদের দিকে তাকিয়ে কিছু সাহাবিকে বেছে নিলেন এবং তাদেরকে রাজা-বাদশাহদের নিকট দূত হিসেবে পাঠালেন। এটি ছিল হিজরি ৭ সালের মুহাররম মাসে এবং তিনি একই দিনে ছয়জন সাহাবিকে দূত হিসেবে মনোনীত করেন।[১৬]

সীল মোরহর তৈরী সিদ্ধান্ত: রাসূলুল্লাহ সা. পত্র প্রেরণ প্রসঙ্গে তার সাহাবীদের পরামর্শ করলে তারা তাকে বলেন হে আল্লাহর রাসূল সা. রাজাবাদশাগণ সাধারণত মোহরাঙ্কিত পত্র ছাড়া পাঠ করেন না। অবশেষে সীলমোহর হিসেবে আংটি তৈরীর সিদ্ধান্ত হয়। محمد رسول الله এই তিনটি শব্দের নকশা অংকিত রুপার আংটি তৈরী করা হয়। *সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৭৩* যার উপরের লাইনে الله তার নিচে رسول, তার নিচে ছিল محمد। আংটিটি রাজাবাদশাদের প্রতি লিখিত পত্র গুলোতে রাষ্ট্রীয় সীলমোহর রুপে ব্যবহৃত হয়। এটি রাসূলুল্লাহ সা. এর হাতে ও তৎপরবর্তী খলিফা হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান রা. -এর হাতে ছিল, তারাও রাষ্ট্রীয় সীলমোহর রুপে ব্যবহার করতেন । হযরত উসমান রা. যে বছর শাহাদাত বরণ করেন সেই বছরে তার হাত থেকে এ আংটিটি بئر أريس আরীস নামক কূপে পড়ে যায় যা তিন দিন অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া যায়নি।[১৭]

পত্র লেখক: রাসূলুল্লাহ সা. নিজে পত্র লিখতেন না । তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে থেকে দক্ষ, অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ

১৩. (১৩. হুসাইন সুহেইল আল-ফাতলাওয়ী। নবী মুহাম্মদের সা: কূটনীতি (আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ), বৈরুত: প্রথম সংস্করণ, ২০০১ পৃ. ৪৬

১৪. ইবনে মাজাহ- ৫২৯, আহমাদ- ১০৫৩৩

১৫. সফিউর রহমান মোবারকপুরী, আর- রাহীকুল মাখতুম, লন্ডন: আল-কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন, পৃ.৪১৩

১৬.সুহেইল হুসাইন আল-ফাতলাওয়ী: প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪: রাহমাতুল লিল আলামীন, ১ম খন্ড, পৃ. ১৭১

১৭. বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ,তা.বি.) পৃষ্ঠা ৪৪৮; ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, মাজমূআতুল ওয়াসাইকিস সিয়াসিয়্যাহ (বৈরুত: দারুন নাফাইস, ১৯৮৭ খি.), পৃ. ৫০,৫১, ৫৭ ; ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযী, যাদুল মা'আদ (বৈরুত: মুআসসিসাতুল রিসালাহ, ২০০৯খি.) পৃ. ২৯

ও আস্থাভজন সাহাবী কাতিবের (লেখক) দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি তাদেরকে যা লেখার আদেশ দিতেন কাতিবগণ তাকে তা লিখে দিতেন। রাসূলুল্লাহ সা. এর লেখকদের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কারো মতে, তাদের সংখ্যা ছিল ছাব্বিশ । কারো মতে, তাদের সংখ্যা ছিল বিয়াল্লিশ। তাদের মধ্যে চার খলিফা ও হযরত যায়িদ ইবনে ছাবিত উবাই ইবনে কা'ব রা. উল্লেখযোগ্য।[১৮]

দূত নির্বাচন : ইসলামের প্রথম কূটনীতিক হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই একজন উত্তম উদাহরণ ছিলেন। তিনি দূত ও পত্রবাহক নির্বাচনে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেন। তাঁর নির্বাচিত দূতগণ ছিলেন সেই সাহাবাগণ, যাঁরা মর্যাদা, বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁরা ছিলেন সম্মানিত, জ্ঞানী এবং দাওয়াত পৌঁছাতে সক্ষম। যে জাতির উদ্দেশ্য প্রেরিত তাদের অবস্থা ও ভাষা সম্পর্কে অবগত ছিলেন।[১৯]
ইবন হিশাম এসব দূতগণের নাম, যাদের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজা ও আমীরদের কাছে চিঠি প্রেরণ করা হয়েছিল, উল্লেখ করেছেন-

১. দিহইয়াহ ইবন খলিফা আল- কালবি রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস -এর দরবারে।
২. হাতিব ইবন আবি বালতা'আ- মিসরের বাদশা মুকাওকিস -এর কাছে ।
৩. আমর ইবন উমাইয়া আদ-দামরি - হাবশার বাদশা নাজ্জাশী -এর কাছে।
৪. আব্দুল্লাহ ইবন হুযাফাহ আস-সাহমী - পারস্য বাদশা কিসরার কাছে।
৫. শুজা' ইবন ওহাব ইবন হারিস - সিরিয়ার গভনর আবু শামার গাসসানীর কাছে।
৬. সালিত ইবন আমর ইবন হুদা আল-হানাফি ইয়ামামার শাসক হাওযা ইবন আলী এর কাছে।
৭. আল- আলা ইবন আল-হাদরামী -বাহরাইনের শাসক আল-মুনযির ইবন সাওয়ার এর কাছে।
৮. আমর ইবন আলআস ওমানের শাসক জয়কার ও 'আবদ ইবন আল-জুলান্দার -এর কাছে।

এদের ছাড়াও আরও অনেক দূত প্রেরণ করা হয়। রাষ্ট্রদূতগণ সেই সব রাজাদের নিকট অত্যন্ত দক্ষতা ও প্রজ্ঞার সাথে কথা বলেছেন, যাদের নিকট তারা গিয়েছিলেন।[২০]

পত্রের গঠনগত বৈশিষ্ট্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একটি কূটনৈতিক রীতি অবলম্বন করেছিলেন, যা আজকের আধুনিক যুগেও কূটনৈতিক চিঠিপত্র রচনার ক্ষেত্রে মান্য করা হয়।[২১]
নিচে তাঁর চিঠিগুলোর আকারগত বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো:

ক. বাসমালাহ (বিসমিল্লাহ) দিয়ে শুরু:

সাধারণত, কূটনৈতিক স্মারকলিপি (diplomatic memorandum) একটি নির্দিষ্ট ফরমেট ও নির্ধারিত শব্দাবলীতে রচিত হয়। বিষয়বস্তু ভিন্ন হলেও কাঠামো প্রায় এক। স্মারকলিপির শুরুতেই রাষ্ট্রের নিজস্ব চিহ্ন বা প্রতীক থাকে, যা ওই রাষ্ট্রকে অন্যদের থেকে আলাদা করে। প্রতীকটি সাধারণত স্মারকলিপির উপরের অংশে থাকে, যার উদ্দেশ্য- প্রেরক রাষ্ট্রকে পরিচয় করানো।
ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবরা তাদের চিঠিপত্র শুরু করত: “بإسمك اللَّهُمَّ” (তোমার নামে হে আল্লাহ!) অথবা “

১৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০৪; তারীখ তাবারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ১৭৯; আল ওজারা ওয়াল কুত্তাব, জাহশিয়ারী, পৃ. ১২
১৯. আলামিয়াতুল ইসলাম ওয়া রাসায়েলুন নাবী সা. ইলাল মুলুকে ওয়াল উমারা মুহাম্মদ আমীন শাকের, (দামেস্ক: দারুল কলাম, তা. বি.) পৃ. ৮৯ ; সাঈদ আব্দুল্লাহ হারিব আল-মুহাইরী, ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্ক, পৃ. ২৯৫
২০. ইবনে হিশাম। গবেষণা ও সম্পাদনা: মুস্তফা আস-সাক্কা, ইব্রাহিম আল-আবিয়ারী, আব্দুল হাফীয শালাবী। (বৈরুত : আস-সীরাহ আন-নবাবিয়্যাহ, খণ্ড ১, দারু ইহিইয়া আত-তুরাস, তা.বি.), পৃ. ৫৮
২১. সুহেইল হুসাইন আল-ফাতলাওয়ী: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

"باسم اللات والعزي" (লাত ও উজ্জার নামে)।[২২] রাসূলুল্লাহ ﷺ শুরুতে "باسمك اللهم" লিখতেন, যেমন চারটি চিঠিতে দেখা যায়। এরপর কুরআনের আয়াত "بسم الله مجراها"[২৩] অবতীর্ণ হলে তিনি "বিসমিল্লাহ" লিখতে শুরু করেন।[২৪]

পরে "قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ..."[২৫] আয়াত অবতীর্ণ হলে, রাসূল ﷺ তাঁর চিঠিগুলোতে লিখতে থাকেন: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ" - "পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।"[২৬] রাসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লিখে, সে যেন 'রাহমান' শব্দটি প্রসারিত করে।"[২৭] এবং আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যখন তোমরা কোনো চিঠি লেখ, তখন 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' ভালোভাবে লিখো, তাহলে তোমাদের প্রয়োজন পূরণ হবে এবং এতে আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন।"[২৮]

খ. (من فلان إلى فلان) প্রেরক ও প্রাপকের পরিচয় : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অধিকাংশ চিঠিতে তাঁর নাম এবং নবুওতের পরিচয় দিয়ে শুরু করতেন। উদাহরণ: "محمد رسول الله إلى من..." (মুহাম্মদ, আল্লাহর রাসূল এর পক্ষ থেকে ...-এর প্রতি), "هذا كتاب من محمد النبي إلى (এটি মুহাম্মদ নবীর পক্ষ থেকে একটি চিঠি...- এর জন্য), "هذا ما كتبه النبي محمد ل..." (এটি মুহাম্মদ নবী যিনি লিখেছেন ...-এর জন্য)[২৯] এভাবে, রাসূল সা. সর্বপ্রথম নিজের পরিচয় এবং প্রেরকের মর্যাদা তুলে ধরতেন।[৩০]

রাসূল ﷺ-এর এমন ধারা অবলম্বনের কারণ ছিল:
রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে কথা বলছেন-সুতরাং রাষ্ট্রীয় পরিচয় দেওয়া জরুরি ছিল।
নবী হিসেবে তাঁর মর্যাদা সর্বোচ্চ, তাই কোনো ব্যক্তির নাম তিনি নিজের নামের আগে দেননি।
এটি ছিল ইসলামের শক্তি ও মর্যাদার প্রকাশ।
প্রাপক (যাকে চিঠি প্রেরণ করা হচ্ছে) - তার নাম ও উপাধি নির্ধারণ
যখন কোনো রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের রাজার নিকট কূটনৈতিক স্মারকলিপি পাঠায়, তখন তারা প্রাপকের নাম, পদমর্যাদা এবং তার পছন্দনীয় উপাধি যেমন-'সম্রাট', 'মহামান্য', 'মহোদয়' ইত্যাদি ব্যবহার করে। রাসূল সা.-ও এমন রীতি অনুসরণ করতেন। তিনি যাদের পত্র পাঠাতেন, তাদের নামের সঙ্গে তাদের পদমর্যাদা বা রাজারূপে মর্যাদা উল্লেখ করতেন। যেমন, 'রোমান সম্রাটের নেতা' (عظيم الروم), 'পারস্যের মহারাজ' (عظيم فارس), ইত্যাদি।[৩১]

গ. (التحية) শুভেচ্ছাবাক্য : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পত্রে সর্বপ্রথম তাজিম ও সম্ভাষণ উল্লেখ করতেন। যেহেতু অধিকাংশ প্রাপক তখনো মুসলিম ছিলেন না, তাই তিনি "السلام عليكم" ব্যবহার না করে বলতেন: "السلام

২২. *সুবহুল আ'শা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১১*
২৩. *সূরা হুদ: ৪১*
২৪. *সুবহুল আ'শা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১১*
২৫. *সূরা ইসরা: ১১০*
২৬. *ইবনে সা'দ, ত্ববাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৪; আল-ওজারা ওয়াল কুত্তাব, পৃ. ১৪, ইহকামু সুনআতিল কালাম, ইবন আব্দুল গফুর (বৈরুত: দারুস সাকাফাহ, ১৯৯৬), পৃ. ৫৫; সুবহুল আ'শা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১৯*
২৭. *আলবানী, সিলসিলা জায়িফা- ২৬৯৯; আবুল কাসেম আল জুরযানী, তারিখ জুরযান, পৃ. ৪৪০*
২৮. *শাওকানী, আলফাওয়ায়েদুল মাজমুআহ, হাদীস নং ২৭৭: জাইনুদ্দিন আল-মুনাবী, ফাইজুল ক্বাদীর, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৩৩*
২৯. *আলী আল-আহমাদী আল-মায়ানজী: মাকাতীবুর রাসূল, প্রথম সংস্করণ, দারুল হাদীস লিততিবাহ ওয়া নাশর, প্রকাশনা স্থান অনির্দিষ্ট, ১৯৯৮, পৃ. ৩*
৩০. *সুহেইল হুসাইন আল-ফাতলাওয়ী: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২*
৩১. *মুহাম্মদ রেজা, মুহাম্মদ সা. (বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ২০০২), পৃ. ২৬৩*

السلام على من اتبع الهدى وآمن "৩২" "হিদায়াত অনুসরণকারীর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক" "على من اتبع الهدى ৩৪) " .....بالله و رسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده. "যিনি আল্লাহে বিশ্বাস করেন তাঁর প্রতি শান্তি"[৩৩] কখনো তিনি লিখতেন: "سلم أنت" "তুমি নিরাপদ হও"[৩৪] "السلام عليك" - "তোমার প্রতি সালাম" "أحمد الله لك" "আমি আল্লাহর প্রশংসা করি তোমার জন্য" এরপর তিনি লিখতেন: "أما بعد" যার মাধ্যমে মূল বিষয়ের দিকে প্রবেশ করতেন।

এই সম্ভাষণ কেবল একটি প্রথা নয়, বরং এটি ছিল উচ্চ নৈতিকতার প্রতীক। এটি প্রাপকের মন গলাত এবং দূরত্ব ও কঠোরতা কমাত। এটি বোঝাত যে প্রাপক একজন সম্মানিত, শিক্ষিত, মার্জিত ও কূটনৈতিক আচরণবিশিষ্ট নবীর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন।

ঘ. (التحميد) আল্লাহর প্রশংসা : রাসূল সা. তার পত্রে সালাম ও সম্ভাষণ উল্লেখ করার পর আল্লাহর প্রশংসা করে বলতেন -

فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو[৩৫] যেমন খালিদ ইবন ওয়ালীদ[৩৬] ও আল-মুনযির ইবন সাবী[৩৭] এর প্রতি পাঠানো পত্রে দেখা যায়। আবার কখনও প্রশংসামূলক বাক্য ছেড়ে দিতেন।[৩৮]

ঙ. বিষয়বস্তু উপস্থাপন : সালাম ও অভিবাদনের পর বিষয়বস্তুর উপস্থাপন পরিলক্ষিত হয়। সরাসরি ইসলাম গ্রহণের দিকে আহবান জানান। যেমন, أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإن عليكم إثم الأريسيين । কিছু পত্রে কোরআনের আয়াত উদ্ধৃতি দিতেন। যেমন, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ[৩৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চিঠির অন্তর্নিহিত দিক

ক. ভাষার সরলতা ও স্পষ্টতা : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চিঠিগুলোর প্রতিটি শব্দ ও বাক্য সুচারুরূপে নির্বাচিত এবং যথাযথ স্থানে বসানো হতো। পাঠক এসব পাঠে কোনো জটিলতা অনুভব করতেন না। বাক্যগুলো এমনভাবে গঠিত হতো যাতে একটি বাক্যের পর আরেকটি স্বাভাবিক প্রবাহে চলে আসে। ফলে পুরো চিঠিটি অনায়াসে পাঠযোগ্য হতো।

খ. প্রাপকের পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষা নির্বাচন : চিঠির ভাষা ও কাঠামো সবসময় প্রাপকের ধর্ম, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো। যেমন, রাসূল ﷺ কিসরা (ফারসের সম্রাট) -এর কাছে লেখা চিঠিতে বলেছিলেন, "فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة..." "আমি আল্লাহর রাসূল, সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত।"[৪০] এটি এই কারণে যে কিসরা কোনো আসমানি ধর্ম সম্পর্কে জানতেন না, তাই এমন পরিচয় দেওয়া জরুরি ছিল।

গ. সংক্ষিপ্ততা (الإيجاز) : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চিঠিতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহ ভাষা ব্যবহার করতেন।

---

৩২. রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি পত্র, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২৬০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৭৩; আহমদ যাকী সাফওয়াত, জামহ-ারাতু রাসায়িলিল আরাব , ১ম খন্ড (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, তা.বি.) পৃ. ৩৭-৩৯: আল- কালকাশান্দী, সুবহুল আ'শা, ৬ খণ্ড (কায়রো: দারুল কুতুব, ১৯৩৪ খ্রি.), পৃ. ৩৭৭।)

৩৩. জামহারাতু রাসায়িলিল আরাব, পৃ. ৪০: সুবহুল আ'শা, ৬ খ., পৃষ্ঠা.৩৭৮

৩৪. জামহারাতু রাসায়িলিল আরাব , পৃ. ৪৫: সুবহুল আ'শা, ৬ খণ্ড , পৃ.৩৭৬; উসদুল গাবাহ, ৪র্থ খণ্ড পৃ. ৪১৭, মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ , মাজমুআতুল ওয়াসাইকিস সিয়াসিয়্যাহ, পৃ. ১৪৮

৩৫. সুবহুল আ'শা, ৬ খণ্ড , পৃ.৩৫২

৩৬. আল-বিদায় ওয়ান নিহায়া , ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৯৮

৩৭. তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫

৩৮.সুবহুল আ'শা, ৬ খণ্ড , পৃ. ৩৫২

৩৯. সূরা আল- ইমরান, ৩ : ৬৪

৪০. পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট প্রেরিত পত্র; জামহরাতু রাসায়িলিল আরব, পৃ. ৪০

ছোট্ট কয়েকটি বাক্যে অনেক গভীর ও বিস্তৃত অর্থ প্রকাশ করতেন। বেশিরভাগ চিঠিই কয়েক লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, তার মধ্যে ছিল বিস্তৃত অর্থ, গভীর দাওয়াত এবং শক্ত বার্তা। এ ধরনের সংক্ষিপ্ততা রাষ্ট্রীয় চিঠিপত্রের একটি কাম্য বৈশিষ্ট্য-একদিকে যেমন এটি প্রাপকের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, অন্যদিকে বিষয়বস্তুর সংহততা বজায় রাখে।

ঘ. চিত্রাত্মক ভাষার ব্যবহার : রাসূল ﷺ কখনো চিঠিতে উপমা ও চিত্রভাষা ব্যবহার করতেন, যাতে বিষয়টি সহজে বোধগম্য হয় এবং মনের ওপর প্রভাব ফেলে। যেমন, হুযা ইবন আলীর নিকট চিঠিতে তিনি লিখেন, "واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر" -"জেনে রাখো, আমার ধর্ম ছড়িয়ে পড়বে উটের খুর ও ঘোড়ার খুর যত দূর পৌঁছায়।"[৪১]

এতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, ইসলাম এমন পরিপূর্ণ ও বিশ্বজনীন ধর্ম যা তাঁর দেশ এবং আরও বহু দেশে ছড়িয়ে পড়বে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চিঠিতে الخف و الحافر উট ও ঘোড়ার খুর) শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন, যেগুলো ছিল সেই সময়ের যাতায়াত ও যুদ্ধের প্রধান বাহন। এই শব্দগুলোর মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, ইসলামের প্রসার হবে এমন স্থানে পর্যন্ত যেখানে মানুষের পা পৌঁছাতে পারে-অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বত্র। আরেকটি চিঠিতে এসেছে বাক্য, أجعل لك ما تحت يديك -"আমি তোমার অধীন যা আছে তা তোমার জন্য রেখে দিবো"[৪২] এই বাক্য দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, যদি শাসক ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার রাজত্ব ও শাসব নব্যবস্থা বজায় থাকবে। এই চিঠির ভাষা সেই ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান ও সাংস্কৃতিক রুচি অনুযায়ী রচিত হয়েছিল, যিনি ছিলেন তাঁর জাতির একজন কবি ও বাগ্মী।

পত্রের কূটনৈতিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া:

১. ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া : নাজাশী (আবিসিনিয়া) ইসলাম গ্রহণ করেন, হিরাক্লিয়াস (রোম) পত্র গ্রহণ ও ইতিবাচক মনোভাব, মুকাওকিস (মিশর) সম্মানজনক প্রতিক্রিয়া ও উপহার প্রেরণ।

২. বিরূপ প্রতিক্রিয়া : খসরু পারভেজ (পারস্য) : চিঠি ছিঁড়ে ফেলে। নবী ﷺ বলেছিলেন, "مزق الله ملكه كما مزق كتابي"- "আল্লাহ তার রাজত্ব টুকরো টুকরো করুন যেভাকে সে আমার চিঠি টুকরো টুকরো করেছে।"[৪৩]

হাওজা বিন আলী (ইয়ামামা) চতুর ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ না করলেও সদয় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। যারা সম্মান দেখিয়েছেন, তারা নিরাপদ ছিলেন; যারা অবজ্ঞা করেছেন, তাদের রাজ্য অচিরেই পতনের দিকে গিয়েছে। ইতিহাস এই ভবিষ্যত বাণীগুলোর সত্যতা প্রমাণ করেছে।

পত্রাবলির কূটনৈতিক গুরুত্ব

ইসলামের নতুন দীন প্রচার ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি যখন বাস্তবতা লাভ করে, তখন বিশ্ববাসীকে এর অস্তিত্ব ও লক্ষ্য সম্পর্কে জানানো অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশ্বের বিভিন্ন রাজা, আমির ও গোত্রপ্রধানদের নিকট কূটনৈতিক বার্তা পাঠান, যা মুসলিম রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিপক্বতা ও অগ্রগতির দিক নির্দেশ করে। তিনি ছিলেন দৃঢ় বিশ্বাসে-তাঁর দাওয়াতের শক্তি, বার্তার শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহর সাহায্য তাঁর সাথে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ অবগত ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল, শাসকদের দুর্নীতি, নৈতিক ও ধর্মীয় সংকট, এবং জনগণের ওপর তাদের জুলুম-নির্যাতন সম্পর্কে। তাই তিনি সময়কে উপযুক্ত মনে করলেন, শাসকদের ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানোর জন্য, যাতে তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে, এবং ভালোকে আদেশ ও মন্দকে নিষেধ করতে পারে।

---

৪১. ইমামার অধিপতি হাওযার প্রতি প্রেরিত পত্র; জামহরাতু রাসায়িলিল আরব, পৃ. ৪৮

৪২. প্রাগুক্ত

৪৩. সহীহুল বুখারি- ৬৪

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কূটনৈতিক কৌশলের বিশেষ দিকগুলো:

ক. **দাওয়াত না পৌঁছলে বিচার হবে না :** আল্লাহ তাদের হিসাব নেবেন না, যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছায়নি। তাই রাজা-বাদশাহদের উদ্দেশ্যে বার্তা প্রেরণ মানে হলো-তাদের কাছে বার্তাটি পৌঁছে দেওয়া এবং তারা যেন দায়ী থাকে আল্লাহর সামনে। কেননা ইসলামের বার্তা সবার জন্য।

খ. রাজন্যবর্গের মনোভাব নরম হওয়া : যদি রাজার কাছে কোনো আহ্বান না পাঠানো হয়, তাহলে সে তা অবহেলা বা অপমান হিসেবে নিতে পারে। কিন্তু সরাসরি যোগাযোগ তাদের শত্রুতা কমিয়ে দেয়। অনেক রাজা ইসলাম গ্রহণ না করলেও রাসূলের দূতকে সম্মান জানায় এবং উপহার পাঠায়। আর যারা বিরোধিতা করে, তারাও বুঝে নেয়, আরব জগত থেকে একটি নতুন শক্তি উঠে আসছে যা তাদের ক্ষমতার জন্য হুমকি হতে পারে।

গ. ইসলাম শান্তির বার্তা দেয় : দূতাবলির মাধ্যমে এই বার্তাই পৌঁছে দেওয়া হয় যে, ইসলাম কোনো রাজ্য দখল করতে আসেনি বরং ন্যায়ের আহ্বান জানায়। যদি রাজারা ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের রাজত্ব অক্ষুণ্য থাকবে এবং তারা ইসলামী নীতিমালায় শাসন করতে পারবে।

ঘ. ইসলাম একটি সভ্য ও আধুনিক ধর্ম : এই বার্তাগুলো শাসকদের জানিয়ে দেয়-ইসলাম কেবল যুদ্ধ বা শক্তির মাধ্যমে প্রসারিত হয় না, বরং এটি কূটনৈতিক পদ্ধতি ও যুক্তিনির্ভর আলোচনার মাধ্যমে কাজ করে।

ঙ. রাজন্যবর্গ ছিল ইসলামের দরজা : রাজা ও নেতাদের মাধ্যমে ইসলাম রাষ্ট্রে প্রবেশ করে। তারাই ছিল সঠিক প্রবেশদ্বার, যাদের মাধ্যমে সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সহজ হয়।

চ. বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রসার : এই কূটনৈতিক পত্রাবলির মাধ্যমে ইসলাম অনেক দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে, এমন সব জায়গায়ও পৌঁছে যায় যা মদীনার কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে। অন্য কোনো যোগাযোগ পদ্ধতি এই পরিমাণ ব্যাপক প্রসার ঘটাতে পারেনি। এর মাধ্যমেই ইসলাম একটি বৈশ্বিক ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়

ছ. কূটনৈতিক বার্তাবাহকগণ রাষ্ট্র সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অর্জন করেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রেরিত দূতরা যেসব দেশে কূটনৈতিক বার্তা নিয়ে গিয়েছিলেন, সেসব দেশ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এসব অভিজ্ঞতা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, কিছু ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐসব রাষ্ট্রে তাঁর দূতদেরকে গভর্নর বা প্রশাসনিক প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেন।

জ. ইসলাম গ্রহণের পরও কূটনৈতিক বার্তার আদান-প্রদান অব্যাহত ছিল : রাজা-বাদশাহদের নিকট প্রেরিত কূটনৈতিক বার্তাগুলোর সফলতার ফলস্বরূপ, এই বার্তার আদান-প্রদান ইসলামে প্রবেশের পরেও অব্যাহত ছিল। এই কূটনৈতিক বার্তাগুলো পরবর্তীতে নির্দেশনা ও রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি পরিচালনার একমাত্র মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। আমরা বলতে পারি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই দূতীয়তাগুলো ছিল অত্যন্ত কার্যকর ও সুপরিকল্পিত প্রচারমূলক কর্মকাণ্ড, যা ইসলামের ইতিহাসে এক দৃঢ় ও নির্ধারক পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত। এগুলো ছিল আন্তর্জাতিক দাওয়াতি প্রচারের একটি জোরালো মাধ্যম।

পরিশেষে বলতে চাই, আল্লাহর দাওয়াত দেওয়া ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের মূল কাজ। তিনি কেবল তাঁর জাতিকেই নয়, পুরো আরব উপদ্বীপকে ইসলাম সম্পর্কে জানানো ও প্রচার করেছিলেন। তাতেই তিনি থেমে যাননি; বরং তিনি তাঁর দায়িত্ব হিসেবে বিশ্বের সকল রাজা-বাদশা ও নেতাদের নিকট ইসলামের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। কারণ তিনি ছিলেন সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত নবী, ইসলাম হল বিশ্বজনীন দ্বীন, এ দ্বীন কেবল আরবদের জন্য নয়, বরং মানবজাতি ও জ্বীন জাতির জন্যও প্রযোজ্য। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর যুগের সমস্ত রাজা-বাদশাহদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। তিনি প্রেরণ করেছেন দাঈ ও দূতদের; যাঁরা কূটনৈতিক দক্ষতা ও ইসলামী দাওয়াতে অভিজ্ঞ ছিলেন, যাঁরা সেই বার্তা বুঝিয়ে বলার দায়িত্ব পালন করেছেন।

التوحيد أولا
তাওহীদ দিয়েই শুরু

শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
ফাতাওয়া বিষয়ক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

ভূমিকা: দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম নির্ভেজাল তাওহীদের শিক্ষা গ্রহণ করা অপরিহার্য। এ জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম তাঁর মাক্কী জীবনের সম্পূর্ণ সময় মুশরিকদের বাতিল আকীদাহ বর্জন করে নির্ভেজাল তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এবং এ পথে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। কারণ ইসলামে তাওহীদ বিহীন আমলের কোন মূল্য নেই।

আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে, তাঁর দ্বীন ও নাবী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উপরই দুনিয়া ও পরকালীন জীবনে সৌভাগ্য অর্জন নির্ভর করে। এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের প্রতিই মানুষের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর প্রভুত্ব, উলুহিয়্যাত, তাঁর অতি সুন্দর নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করবে, ততক্ষণ সে প্রকৃত শান্তি অর্জন করতে সক্ষম হবে না। মানুষের মনে স্রষ্টার অস্তিত্ব, তাঁর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী, তাঁর সৃষ্টি ও কর্মসমূহ, সৃষ্টির সূচনা ও পরিসমাপ্তি, সৃষ্টিজগতের সকল সৃষ্টির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক, তাকদীর এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবন এবং তাতে সংঘটিতব্য বিষয়াদি সম্পর্কে যেসব সন্দেহ ও প্রশ্ন জাগ্রত হয়, তার জবাবের জন্য স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ইসলামী আকীদাহ অপরিহার্য। পৃথিবীতে মুসলিমদের বিজয়, সাফল্য, প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভের মূলে ছিল তাদের সঠিক আকীদাহ-বিশ্বাস। যতদিন মুসলিমদের মধ্যে তাওহীদ সুদৃঢ় ছিল, ততোদিন তারা সমগ্র পৃথিবীর শাসক ছিলো।

এ জন্যই কুরআন মানুষের তাওহীদ পরিশুদ্ধ করার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। নাবী-রাসূলদের দাওয়াতের মূল বিষয়ই ছিল আকীদার সংশোধন। তারা সর্বপ্রথম যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাতেন, তা হলো এককভাবে আলাহর এবাদত করা এবং অন্যসব বস্তুর এবাদত বর্জন করা। মক্কাতে একটানা তেরো বছর অবস্থান করে নাবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকীদাহ সংশোধনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

কুরআন ও সুন্নাহ্য় আল্লাহর সত্ত্বা, তাঁর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী, ফেরেশতা, আখেরাত ইত্যাদি গায়েবী বিষয়কে সাবলীল করে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলামের গৌরবময় যুগে মুসলিমদের তা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি। রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তারা বিষয়গুলো শুনে তা সহজভাবেই বুঝে নিয়েছেন এবং বিশ্বাস করেছেন। আর এ বিষয়গুলো বোধশক্তি ও যুক্তির মাধ্যমে বুঝার কোনো সুযোগ নেই। অহীর উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। সেই সঙ্গে গায়েবী বিষয়গুলো মানুষের বিবেক-বদ্ধির সাথে সাংঘর্ষিকও নয়।

তবে পরবর্তীতে যখন গ্রীক দর্শনের কিতাবাদি আরবীতে অনুবাদ করা হলো, তখন থেকেই ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারের উপর গ্রীক দর্শনের প্রভাব পড়তে থাকে। আব্বাসী খেলাফতকালে সরকারিভাবে এ কাজে উৎসাহ প্রদান করা হয়। ফলে মুসলিমদের লাইব্রেরীগুলো গ্রীক দর্শনের কিতাবে ভরপুর হয়ে যায়। মুসলিম বিদ্বানগণ গ্রীক দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

ইসলামী আকীদার উপরও গ্রীক দর্শনের প্রভাব পড়ে ব্যাপকভাবে। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, তাঁর কার্যাবলী, সৃষ্টির সূচনা ও সমাপ্তি, পরিণাম, কিয়ামত, হাশর-নাশর, মানুষের আমলের ফলাফল এবং এ জাতীয় অন্যান্য গায়েবী বিষয়গুলো জানার জন্য কুরআন-সুন্নাহ্‌র পথ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। চিন্তা-ভাবনা ও আন্দাজ-

অনুমান করে এ বিষয়গুলো জানা অসম্ভব। আলাহর সত্তা ও গুণাবলীর ধারে কাছে পৌঁছানো মানুষের বিবেক ও বোধশক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে মানুষের কোনো অভিজ্ঞতাও নেই। এ সব বিষয় চোখেও দেখা যায় না। কুরআন সুস্পষ্ট করেই বলে দিয়েছে, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ "তাঁর সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"[১]। কাজেই এ বিষয়ে আলাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উপর নির্ভর করাই সঠিক আকীদার উপর টিকে থাকার একমাত্র মাধ্যম।

তাওহীদ অর্থ: التوحيد অর্থ হলো, এককভাবে আল্লাহর এবাদত করা এবং তাঁকে ব্যতীত অন্য কারো এবাদত বর্জন করা। অন্তরের মাধ্যমেও তাওহীদ বা এককভাবে আল্লাহর এবাদত হয়ে থাকে। যেমন অন্তর দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর কাছে আশা-আকাঙ্খা করা, তাঁর প্রতি ভরসা করা, তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করা এবং তাঁর জন্য একনিষ্ঠ হওয়া। এগুলো অন্তরের আমল।

জবান দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ করা, তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা, তাঁর বড়ত্ব প্রকাশ করা, তাঁর একত্ব বর্ণনা করা এবং তাঁর প্রশংসা করার মাধ্যমেও তাওহীদ বাস্তবায়ন হয়ে থাকে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল যেমন সালাত আদায় করা, সিয়াম রাখা, হজ্ব পালন করা, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, যাকাত দেয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজের বাধা প্রদান করার মাধ্যমেও তাওহীদ বাস্তবায়ন হয়ে থাকে।

উপরোক্ত সবগুলো বিষয়ই এবাদত। এগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্যই এমনভাবে বাস্তবায়ন করা আবশ্যক যেন তাতে কোনো শির্ক না থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

"বলো, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট অহী পাঠানো হয় এই মর্মে যে, তোমাদের ইলাহ মাত্র এক। অতএব যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎ আমল করে এবং তার প্রভুর এবাদতে কাউকে শরীক না করে"।[২]

এখানে শুধু একথা বলেই শেষ করা হয়নি, সে যেন সৎ আমল করে; বরং এর সাথে বাড়িয়ে বলেছেন, "তার প্রভুর এবাদতে যেন কাউকে শরীক না করে"। কারণ সৎ আমলের মধ্যে শির্ক প্রবেশ করলে সেটাকে নষ্ট ও বাতিল করে দেয়।

তাওহীদ কুরআনের মূল বিষয়: ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর কিতাবে তাওহীদের কথা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে এমন সূরা খুব কমই পাওয়া যাবে, যাতে তাওহীদের আলোচনা নেই। আল্লাহ তা'আলা কোথাও তাওহীদ বাস্তবায়নের আদেশ দিয়েছেন আবার কোথাও এর প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। বিশেষ করে কিছু কিছু মাক্কী সূরা আছে, যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু তাওহীদের আলোচনা করেছে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কুরআনের প্রত্যেক আয়াতেই রয়েছে তাওহীদ, রয়েছে তাওহীদের প্রমাণ এবং রয়েছে এর প্রতি জোরালো আহবান। কেননা কুরআনে রয়েছে আল্লাহ সম্পর্কে সংবাদ, রয়েছে তার কাজ-কর্মের সংবাদ এবং রয়েছে তাঁর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর সংবাদ। আর এটাই হচ্ছে ইলম ও খবর সম্পর্কীয় তাওহীদ।

আর না হয় রয়েছে তাতে তাওহীদের প্রতি আহবান। তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই। সেই সঙ্গে তিনি ব্যতীত যেসব জিনিসের এবাদত করা হয় তা বর্জন করার আহবান। আর এটা হচ্ছে তাওহীদুল ইরাদা ওয়াত্ তালাব

১. সূরা আশ শূরা - ৪২/১১
২. সূরা আল কাহাফ - ১৮/১১০

(কামনা ও বাসনা) সম্পর্কীয় তাওহীদ। আর না হয় কুরআনে রয়েছে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ বাস্তবায়নের ব্যাপারে তাঁর প্রতি অনুগত থাকার আবশ্যকতা। আর এটা হচ্ছে তাওহীদের অধিকার এবং পরিপূরক।

আর না হয় কুরআনে রয়েছে, তাওহীদপন্থী বান্দদের জন্য আল্লাহ তাআলার সম্মান-মর্যাদার বর্ণনা। আর রয়েছে তাতে ঐসব নেয়ামতের বর্ণনা, যা তাদেরকে দুনিয়াতে প্রদান করা হয়েছিল এবং যা কিছু তাদেরকে প্রদান করা হবে আখেরাতে। আর এটা হচ্ছে তাওহীদ বাস্তবায়নের পুরস্কার স্বরূপ।

আর না হয় রয়েছে কুরআনে মুশরিকদের সংবাদ রয়েছে তাতে ঐসব শাস্তির সংবাদ, যা মুশরিকদেরকে দুনিয়ার জীবনে শির্কের শাস্তি স্বরূপ প্রদান করা হয়েছিল এবং যা কিছু তাদের জন্য আখেরাতে অপেক্ষা করছে। আর এটা হচ্ছে তাওহীদ বর্জনকারীদের সংবাদ।

না হয় তাতে রয়েছে হালাল ও হারামের বিবরণ। এটা হলো, তাওহীদের হকসমূহের বিবরণ। অতএব পুরা কুরআনেই রয়েছে তাওহীদের বর্ণনা, তাওহীদের অধিকার এবং তাওহীদ বাস্তবায়নকারীদের বিনিময় এবং তা বিনষ্টকারীদের শাস্তির বর্ণনা।[৩]

তাওহীদের মর্যাদা ও গুরুত্ব:

প্রথমত: তাওহীদ ইসলামের সর্বপ্রধান মূলভিত্তি: তাওহীদের সাক্ষ্য প্রদান ও আল্লাহর উবুদীয়্যাতের স্বীকৃতি প্রদান এবং তাঁর ব্যতীত অন্যের উবুদীয়্যাত অস্বীকার করা ব্যতীত ইসলামে প্রবেশ করা অসম্ভব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ

"ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। ১. এ কথার স্বাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল ২. সালাত প্রতিষ্ঠা করা ৩. যাকাত প্রদান করা ৪. মাহে রামাযানে সিয়াম পালন করা এবং ৫. সাধ্য থাকলে আল্লাহর ঘরের হজ্জ পালন করা।"[৪]

দ্বিতীয়ত: তাওহীদ সর্বপ্রথম ফরয: জানা আবশ্যক যে, মুসলিমের উপর সর্বপ্রথম তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করা জরুরী। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদে বলেন,

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾

"তুমি জেনে নাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। অতঃপর তোমার গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করো"।[৫] তাওহীদের বিরাট মর্যাদা থাকার কারণেই সমস্ত আমলের উপর এটাকেই প্রাধান্য দেয়া উচিৎ। তাওহীদ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ার কারণেই রাসূলগণ তওহীদ দিয়েই তাদের দাওয়াত শুরু করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

"নিশ্চয়ই আমি নুহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র এবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো সত্য মাবুদ নেই। তা না করলে আমি তোমাদের উপর একটি মহা দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি। একই সূরার ৬৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾-"আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদেরই ভাই হুদকে। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র এবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ

৩. মাদারিজুস সালিকীন - ৩/৪১৭

৪. সহিহুল বুখারী - ৮ ও সহিহ মুসলিম - ১৬

৫. সূরা মুহাম্মাদ - ৪৭/১৯

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ– "আর সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদেরই ভাই সালেহকে। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই"।[৬] আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ –"আমি মাদায়েনের প্রতি তাদের ভাই শুআইবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই"।[৭] সূরা হুদের আরো কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, নাবীগণ সর্বপ্রথম তাওহীদ দিয়েই তাদের দাওয়াত শুরু করেছেন এবং এই তাওহীদের দিকেই নিজ নিজ উম্মতদেরকে আহবান জানিয়েছেন।

সর্বশেষে আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নাবীকে এমন জাতির কাছে প্রেরণ করলেন, যারা নাবী-রাসূলদের দ্বীনকে ভুলে গিয়ে নানা প্রকার শির্কে লিপ্ত হয়েছিল। এমনকি আল্লাহর সম্মানিত ঘর কাবা শরীফেও তারা মূর্তি ঢুকিয়েছিল। অতঃপর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাঝে প্রেরিত হলেন। তিনি মক্কাবাসীদেরকে বললেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ تُفْلِحُوا - "হে লোক সকল! তোমরা বলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এতে তোমরা সফল হবে"।[৮]

সুতরাং সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষের উপর এটিই সর্বপ্রথম ওয়াজিব। আরব, অনারব, জিন-ইনসান, রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল অধিবাসীই এক আল্লাহর এবাদত করবে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ঘোষণা দিবে, তাঁর সাথে অন্য কিছুর এবাদত করবেনা। কোন ফেরেশতা, পাথর, কবর, অলী বা অন্য কারো এবাদত করবেনা। কেননা সকল প্রকার এবাদতের হকদার একমাত্র আল্লাহ। এতে অন্য কারো কোন অংশ নেই। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় ১৩ বছর অবস্থান করে মানুষকে এই পবিত্র কালেমার দাওয়াত দিলেন এবং এই পথে মক্কাবাসীদের পক্ষ হতে নানা রকম যুলুম-নির্যাতন সহ্য করলেন। অতঃপর মদীনায় হিজরত করে সেখানে ১০ বছর বসবাস করে মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে দাওয়াত দিলেন এবং আল্লাহর রাস্তায় সর্বোত্তম জিহাদ করলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুআয রাযি. কে ইয়ামানে পাঠালেন, তখন তিনি বললেন,

«إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فليكن أول ما تدعو إليه شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

"তুমি এমন এক কাওমের কাছে যাচ্ছ যারা আহলে কিতাব। সর্ব প্রথম যে বিষয়ের দিকে তুমি তাদেরকে আহ্বান জানাবে তা হচ্ছে, "লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ্-এর সাক্ষ্য দান করা"। অন্য বর্ণনায় আছে, তুমি তাদেরকে এককভাবে আল্লাহর এবাদত করার আহ্বান জানাবে। এ বিষয়ে তারা যদি তোমার আনুগত্য করে তবে তাদেরকে জানিয়ে দিও যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরয করেছেন। এ ব্যাপারে তারা যদি তোমার কথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দিও যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন যা বিত্তশালীদের কাছ থেকে নিয়ে গরীবদেরকে দেয়া হবে। তারা যদি এ ব্যাপারে

৬. *সূরা আরাফ - ৭/৭৩*
৭. *সূরা আরাফ -৭/ ৮৫*
৮. *মুসনাদে আহমাদ -১৬০২৩, হাসান*

তোমার আনুগত্য করে তবে তাদের উৎকৃষ্ট মালের ব্যাপারে তুমি খুব সাবধান থাকবে। আর মজলুমের বদ দুআকে পরিহার করে চলবে। কেননা মজলুমের ফরিয়াদ এবং আল্লাহ তা'আলার মাঝখানে কোনো পর্দা নেই"।[৯]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর দাওয়াতকে পূর্ণতা দান করলেন এবং মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে সেই দাওয়াত সাফল্য অর্জন করল। তাঁর জীবদ্দশাতেই মক্কা-মদীনাসহ আরবের বিশাল অংশে তাওহীদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো। লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করল। অতঃপর তিনি মৃত্যু বরণ করলেন। তাঁর পরে সাহাবীগণও এই তাওহীদের প্রচার ও প্রসারে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লেন। সমগ্র আরব ভূমি শির্ক থেকে পবিত্র হল। ইরাক ও মিশর পর্যন্ত ইসলামের বিজয় সম্প্রসারিত হলো। এই তাওহীদের বদৌলতেই মুসলিমগণ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। তাদের জন্য আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়িত হলো। আল্লাহ তাআলা বলেন,
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ- "তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। যদিও এতে মুশরিকরা অসন্তুষ্ট হয়"।[১০]

তৃতীয়ত: তাওহীদ ব্যতীত আমল কবুল হয় না: তাওহীদ হচ্ছে আমল বিশুদ্ধ ও কবুল হওয়ার মূল শর্ত। এবাদতে তাওহীদ না থাকলে সেটাকে এবাদত হিসেবে নাম দেয়া ঠিক নয়। যেমন বিনা পবিত্রতায় আদায়কৃত সালাতকে সালাত নাম দেয়া ঠিক নয়। এবাদতে শির্ক প্রবেশ করলে এবাদত বাতিল হয়ে যায়। যেমন অযু করার পর বায়ু বের হলে অযু নষ্ট হয়ে যায়। অতএব তাওহীদ বিহীন এবাদত শির্কে পরিণত হয়ে যায় এবং আমলকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেয়। শির্ক নিয়ে মৃত্যু বরণ করলে জাহান্নামে চিরকাল থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ –
তোমার কাছে এবং ইতিপূর্বেকার সমস্ত নাবীর কাছে এ অহী পাঠানো হয়েছে যে, যদি তুমি শির্কে লিপ্ত হও তাহলে তোমার আমল বাতিল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। অতএব, তুমি শুধু আল্লাহরই এবাদত করো এবং তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাও।[১১]

চতুর্থত: তাওহীদ দুনিয়াতে সঠিক পথ ও আখেরাতে নিরাপত্তা লাভের মাধ্যম: আল্লাহ তা'আলা বলেন, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ-"যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত"।[১২]

মারফু সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এবং অন্যান্য সাহাবীদের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হলে সাহাবীগণ বলতে লাগলেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের নফসের উপর জুলুম করেনি? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন তোমরা এ আয়াতে যুলুম দ্বারা যা বুঝেছ, তা সঠিক নয়। এখানে যুলুম দ্বারা শির্ক উদ্দেশ্য। তোমরা কি আল্লাহর প্রিয় বান্দা লুকমান আলাইহিম সালাম এর কথা শুনোনি? তিনি তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ- "হে প্রিয় বৎস! আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা মহা যুলুম"।[১৩]

---

৯. সহিহুল বুখারী - ১৪৫৮, সহিস মুসলিম - ১৯
১০. সূরা আল ফাতাহ - ৪৮/২৮
১১. সূরা আয যুমার - ৩৯/৬৫-৬৬
১২. সূরা আনআম - ৬/৮২
১৩. সহিহুল বুখারি - ৪৬২৯, সহিস মুসলিম - ১২৪

ইমাম ইবনে কাছীর উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এসব লোকদের মধ্য হতে যারা একমাত্র আল্লাহর এবাদত করবে ও তার সাথে কাউকে শরীক করবে না তারা কিয়ামতের দিন নিরাপত্তা পাবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তারাই সঠিক পথ পাবে। যে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে তাওহীদ পালন করবে সে পূর্ণ নিরাপত্তা পাবে এবং পূর্ণ সঠিক পথ পাবে ও বিনা আযাবে জান্নাতে যাবে।[১৪]

সুতরাং এই আয়াত থেকে জানা গেল, যে ব্যক্তি শির্ক থেকে মক্ত থাকবে না তার জন্য নিরাপত্তা ও হেদায়াত অর্জন করা কোন ক্রমেই সম্ভব হবে না। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি শির্ক থেকে বেঁচে থাকবে, ঈমান ও ইসলামের উপর টিকে থাকা অনুপাতে তার জন্য নিরাপত্তা ও হেদায়াত অর্জিত হবে। যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে যে, সে জীবিত অবস্থায় কবীরা গুনাহ্ করেনি, পূর্ণ নিরাপত্তা ও হেদায়াত কেবল তার জন্যই অর্জিত হবে। আর যেই তাওহীদপন্থী গুনাহ করে তাওবা না করেই আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে তাওহীদ অনুপাতে নিরাপত্তা ও হেদায়াত প্রাপ্ত হবে এবং গুনাহর অনুপাতে নিরাপত্তা ও হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হবে।

পঞ্চমত: তাওহীদ জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের মাধ্যম: সাহাবী উবাদা ইবনে সামেত রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ، وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ

"যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দান করল যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, তিনি তাঁর এমন এক কালিমা যা তিনি মরিয়াম এর প্রতি প্রেরণ করেছেন এবং তিনি তাঁরই পক্ষ থেকে প্রেরিত রুহ বা আত্মা। জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, তাকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাত দান করবেন। তার আমল যাই হোক না কেন"।[১৫]

ষষ্ঠত: তাওহীদ দুনিয়া আখেরাতের বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার মাধ্যম: ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ভয়-ভীতির সময় তাওহীদই আল্লাহর দুশমন ও তাঁর বন্ধু উভয়েরই আশ্রয়স্থল। তাওহীদ তাঁর দুশমনদেরকে দুনিয়ার কঠিন ও ভয়াবহ বিপদ থেকে উদ্ধার করে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আনকাবুতের ৬৫ নং আয়াতে বলেন, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ - "তারা যখন জলযানে আরোহন করে, তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌কেই ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা শরীক করতে থাকে"। আলাহ তাআলা এখানে সংবাদ দিয়েছেন যে, মক্কার মুশরিকরা জলপথে ভ্রমণের সময় যখন বিপদে পড়ত, তখন আল্লাহর জন্য দ্বীনকে খালেস করে তাঁর নিকট দুআ করত। কিন্তু তিনি যখন তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে স্থলে উঠাতেন, তখন তারা দ্বিতীয়বার শির্কে লিপ্ত হত। মোটকথা মুশরিকদের উপর কোন মসীবত আসলে ইখলাসের সাথে তারা আল্লাহর কাছে দুআ করত। কিন্তু সুখ-শান্তিতে থাকার সময় আল্লাহর সাথে অন্যান্য বস্তুকে শরীক করত।

আর তাওহীদ আল্লাহর অলীদেরকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের কঠিন ও ভয়াবহ বিপদ থেকে উদ্ধার করে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এটাই তাঁর রীতি। তাওহীদের মত আর কিছুই দুনিয়ার বিপদ থেকে উদ্ধার করে না। ইউনূস আলাইহিস সালাম মাছের পেটে গিয়ে যে দু'আটি করেছিলেন, বিপদগ্রস্ত কোনো লোক তা পাঠ করলে তাওহীদের কারণে আল্লাহ তাআলা তার কষ্ট দূর করবেন। শির্কই মানুষকে মহা বিপদে ফেলে। তাওহীদই

১৪.তাফসির ইবনে কাসীর, সূরা লুকমানের - ১৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

১৫. সহিহুল বুখারী - ৩৪৩৫, সহিস মুসলিম - ২৮

তা থেকে উদ্ধার করে। অতএব তাওহীদ সমস্ত সৃষ্টির ভয়-ভীতি ও বিপদের আশ্রয় এবং তাদের ত্রাণকর্তা।

সপ্তমত: তাওহীদের জন্যই আল্লাহ তা'আলা জিন-ইনসান সৃষ্টি করেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ– "আমি জিন এবং মানুষকে একমাত্র আমার এবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি"।[১৬] সুতরাং আল্লাহর এবাদত বাস্তবায়নের জন্য এবং তাঁকে ছাড়া অন্যের এবাদত বর্জন করার জন্যই রাসূলদেরকে পাঠানো হয়েছে, আসমানী কিতাবগুলো নাযিল করা হয়েছে, শরীয়ত প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, বর্তমানে আমরা এমন একটি সমাজে বসবাস করছি, যেখানে বলতে গেলে প্রায় সবাই মুসলিম এবং সবাই তাওহীদের বাণী লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সবসময় পাঠ করে। অতএব এখানে তাওহীদ নিয়ে ব্যস্ত থাকা আবশ্যক, না থেকে দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া, আমল করা ও দাওয়াত দেওয়া আবশ্যক? আমরা কি এখনো মক্কী জীবনে আছি যে, সবকিছু বাদ দিয়ে, দ্বীন কায়েমের আন্দোলন বাদ দিয়ে শুধু তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে যাবো? এই প্রশ্নের জবাব বিভিন্ন আলেম বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন। আমাদের সকলের পরিচিত বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীছের সুযোগ্য সভাপতি উপমহাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও আলেম আল্লামা ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী রাহিমাহুল্লাহকেও এই প্রশ্নটি করা হয়েছিল। তিনি জবাবে বলেছেন, আমাদের অবস্থা মক্কী জবীনের চেয়েও শোচনীয় ও ভয়াবহ। কারণ, সে সময়ের লোকেরা তাওহীদের কালেমাটির অর্থ বুঝতো; কিন্তু পাঠ করতো না। আর আমাদের সমাজের অধিকাংশ লোক এটি পাঠ করে কিন্তু এর অর্থ বুঝে না। দরগা, মাযার, কবরপূজা ও সুফীদর্শন মুসলিমদের মাঝে কত গভীরভাবে প্রবেশ করেছে তা সহজেই অনুমেয়। সে সঙ্গে আরো বলা যেতে পারে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কাতে ১৩ বছর তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার পর সেখানে সফলতা না পেয়ে মদীনায় হিজরত করেছেন। মদীনাতে তিনি তাওহীদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিরাট সফলতা পেয়েছেন এবং তাওহীদ ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। তখন কি তিনি তাওহীদের দাওয়াত বর্জন করেছিলেন? তিনি কি তাঁর প্রতিটি জুমআর খুতবায় ও ভাষণে সবার আগে তাওহীদের কথা বলেন নাই? তিনি কি মুআয বিন জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামানে পাঠনোর সময় সবার আগে তাওহীদের দাওয়াত দিতে বলেন নাই? আপনি কি এমন কোনো মসজিদ দেখাতে পারবেন, যেখানে জুমআর খতীব সবার আগে তাওহীদের কথা বাদ দিয়ে অন্য কথা বলেন? মক্কা ও মদীনাসহ সমস্ত মসজিদের একই অবস্থা। সেখানের সব দাওয়াতী কার্যক্রম তাওহীদ দিয়েই শুরু হয়। তাই আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বর্তমানে তাওহীদের দাওয়াত দেয়া অত্যন্ত জরুরী। আমাদের কথার অর্থ এটিই নয় যে, বাকীসব বিষয় একেবারেই বর্জন করে শুধু তাওহীদের কথাই বলবো, এটি আমাদের উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ্য হলো, তাওহীদ সবার আগে, তাওহীদ দিয়েই শুরু করবো ও তাওহীদ দিয়েই শেষ করবো।

---

১৬. *সূরা যারিয়াত - ৫১/ ৫৬*

মোঃ রেজাউল ইসলাম

সহ-সাংগঠনিক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ও সাবেক সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

দক্ষ নেতৃত্ব, প্রশিক্ষিত কর্মী ও সুসংগঠিত কাঠামো : শুব্বানের উত্তরণের পথ

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ

"তোমরা তাদের (শত্রুদের) বিরুদ্ধে প্রস্তুত কর যা কিছু সম্ভব শক্তি দিয়ে।"[১]

ইসলামী আদর্শে গড়ে ওঠা একটি সংগঠন হিসেবে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ শুধু একটি নাম নয়, বরং তা হলো এক অঙ্গীকার-যুব ও ছাত্রদের ঈমানী নেতৃত্বে প্রস্তুত করার একটি পথচলা। আমাদের ইতিহাস গৌরবময়, কিন্তু ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা উন্নয়ন ও সুসংগঠিত কাঠামো।

নববী সংগঠন: ইসলামের সূচনালগ্নে কাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গি

রাসূল ﷺ এর জীবনের শুরু থেকেই আমরা সংগঠনের মৌলিক ভিত্তি দেখতে পাই। দারুল আরকাম ছিল ইসলামের প্রথম সাংগঠনিক কেন্দ্র, যেখানে তিনি গোপনে সাহাবীদের দ্বীনি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। মদীনায় এসে রাসূল ﷺ মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র ও দাওয়াহ কাঠামো তৈরি করেন- যেখানে নেতৃত্ব, কর্মী প্রস্তুতি, জবাবদিহি ও কৌশলগত অগ্রগতির স্পষ্ট নির্দেশনা ছিল।

নববী মডেল থেকে আমাদের শেখার কিছু বিষয়: নবী কারীম ﷺ-এর রাষ্ট্রীয় ও দাওয়াহ মডেল আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ পথনির্দেশনা। বিশেষত যুব নেতৃত্ব, প্রশিক্ষণ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গঠনে তাঁর পদ্ধতি অতুলনীয়।

১. যুব নেতৃত্ব গঠন: মু'সআব ইবনে উমায়র রাযি. কে মাত্র ২৫ বছর বয়সে মদীনায় প্রেরণ করা হয় ইসলামের প্রথম দাঈ ও সংগঠক হিসেবে। তিনি আনসারদের হৃদয়ে ঈমান জাগান এবং ইসলামের সামাজিক ভিত্তি গড়ে তোলেন। মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. কে মাত্র ২৮ বছর বয়সে নাবী ﷺ ইয়ামানে পাঠান বিচারক ও দাঈ হিসেবে। **তার** জ্ঞানের স্বীকৃতিস্বরুপ নাবী ﷺ বলেন: أعلَمُ أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل "আমার উম্মতের মধ্যে হালাল-হারামের জ্ঞান সবচেয়ে বেশি মু'আয ইবনে জাবালের।"[২]

২. কর্মীবাহিনী গঠন ও প্রশিক্ষণ: নবী ﷺ মসজিদে নববীকে মাদরাসা বানান যেখানে তাকওয়া, হিকমাহ ও জ্ঞানচর্চার প্রশিক্ষণ হত। সাহাবীদের অধিকাংশ ছিলেন যুবক। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (১৩ বছর), আবদুল্লাহ ইবনে উমর (১৮ বছর), পরবর্তীতে যাঁরা পরিণত হন ইমাম ও মুহাদ্দিসে।

৩. পরামর্শমূলক নেতৃত্ব ও জবাবদিহিতা: বদরের সময়, এমনকি হিজরতের পরিকল্পনায়ও নবী ﷺ সাহাবীদের শূরা (পরামর্শ) গ্রহণ করেন, যদিও তিনি ছিলেন ওয়াহীপ্রাপ্ত রাসূল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ -"তুমি তাদের সাথে পরামর্শ করো।"[৩] এই তিনটি মূলস্তম্ভ - যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন, ধার্মিক ও দক্ষ কর্মীবাহিনী তৈরি, এবং জবাবদিহিমূলক কাঠামো-আজকের সংগঠনগুলোর জন্যও একইভাবে অনুকরণীয়।

দক্ষতা বৃদ্ধি: নেতৃত্ব ও কর্মীদের জন্য সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ: জমঈয়তের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন কর্মীদের মানোন্নয়ন এবং নেতৃত্বের উন্নয়ন। আধুনিক দুনিয়ায় শুধু ঈমান ও নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়; একজন আদর্শ দাঈ বা নেতা হতে হলে তাকে হতে হবে বহুস্তরীয় দক্ষতার অধিকারী।

---

১. সূরা আল-আনফাল, ৮ : ৬০
২. বাইহাকি- ১২৫৪৯, সহিহ
৩. সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫৯

দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ:

১. ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন ও নেতৃত্ব গঠন : এর জন্য প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস, বক্তৃতা ও উপস্থাপন কৌশল, দ্বীনি শিষ্টাচার ও আচরণে ভারসাম্য।

২. টিমওয়ার্ক ও ব্যবস্থাপনা: কাজ ভাগ করে দেওয়া, দায়িত্বে জবাবদিহি রিপোর্টিং ও মূল্যায়নের সংস্কৃতি।

৩. ডিজিটাল এবং মিডিয়া দক্ষতা: সোশ্যাল মিডিয়ায় দাওয়াহ, ডিজিটাল পোস্টার/ভিডিও প্রেজেন্টেশন গুগল ফর্ম, স্প্রেডশিট, ইমেইল ক্যাম্পেইনের মতো টুল ব্যবহারে পারদর্শিতা। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ - "বল, তোমরা কাজ করো; আল্লাহ তোমাদের কাজ দেখবেন।"[৪]

সংগঠন ও কাঠামোগত ব্যবস্থা: সুন্নাহ ভিত্তিক শৃঙ্খলা গঠন। সংগঠন যদি গাড়ি হয়, তবে কাঠামো হচ্ছে তার ইঞ্জিন। মজবুত সংগঠনিক কাঠামো ব্যতীত কোনো আন্দোলন দূর পর্যন্ত যেতে পারে না।

সাংগঠনিক কাঠামোর উন্নয়নে কিছু করণীয়:

১. সেন্ট্রাল ডাটাবেইজ ও রেকর্ড সংরক্ষণ, ২. তৃণমূল পর্যায়ে সক্রিয় ইউনিট গঠন, ৩. পরিকল্পনা, বাজেট ও মূল্যায়ন সিস্টেম চালু, ৪. বার্ষিক প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সম্মেলন।

মক্কী ও মাদানী জীবনে সংগঠনের ভিন্ন রূপ আমাদের শেখায় যে পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সংগঠনের রূপান্তর জরুরি।

৪. প্রশিক্ষণের ধারা ও বিষয়বস্তু:

প্রারম্ভিক স্তর (Foundation Level): আকীদাহ ও মানহাজ, ইসলামী নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়া।

মাঝারি স্তর (Intermediate): দাওয়াহ ও বিতর্কে অংশগ্রহণ, কার্যকর নেতৃত্ব ও সময় ব্যবস্থাপনা।

উচ্চতর স্তর (Advanced): মিডিয়া কৌশল, আন্তর্জাতিক মুসলিম আন্দোলনের তুলনামূলক অধ্যয়, কৌশলগত সিদ্ধান্তগ্রহণ, (Strategic Leadership)। এই প্রশিক্ষণগুলো রিট্রিট, ওয়ার্কশপ, অনলাইন কোর্স ও মেন্টরিং সেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে।

৫. আজীবন শেখার চর্চা (Lifelong Learning): একজন দাঈ ও নেতার বৈশিষ্ট্য

ইলমের পথ কখনও শেষ হয় না। দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে প্রযুক্তিগত ও ভাষাগত দক্ষতাও গুরুত্বপূর্ণ। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, مَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ - "যে ব্যক্তি জ্ঞানের সন্ধানে কোনো পথ ধরে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"[৫]

আজীবন শেখার ক্ষেত্রসমূহ:

১. তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ
২. সমসাময়িক ইসলামিক চিন্তাবিদদের চিন্তা ও কার্যক্রম
৩. যোগাযোগ ও লিডারশিপ স্কিল
৪. তথ্য প্রযুক্তির আধুনিক ব্যবহার

৬. চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও ভবিষ্যতের রূপরেখা

আমাদের সামনে রয়েছে অনেক বাস্তবতা। যেমন,

১. কর্মীদের মাঝে উদ্যমের অভাব, ২. সামাজিক বিভাজন ও মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব, ৩. নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা না থাকা।

---

৪. সূরা আত-তাওবা, ৯ : ১০৫

৫. সহীহ মুসলিম- ২৬৯৯ আবু দাউদ- ৩৬৪১, তিরমিযি- ২৬৮২

উত্তরণের কৌশল:

১. মুক্ত আলোচনার সংস্কৃতি তৈরি করা,
২. নতুন নেতৃত্ব তৈরি করতে সিনিয়রদের মেন্টরিং,
৩. প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার শেখানো,
৪. শিক্ষা ও আত্মসমালোচনার পরিবেশ গড়ে তোলা।

নেতৃত্ব একটি আমানত, সংগঠন একটি দায়িত্ব। জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের মতো দ্বীনী সংগঠন কেবল একটি অবস্থানে পৌঁছে থেমে থাকার জন্য নয়, বরং ধারাবাহিক উন্নতির জন্য। **১. দক্ষ নেতৃত্ব, ২. প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী, ৩. শক্তিশালী কাঠামো, এবং ৪. আজীবন শিক্ষার** মানসিকতা-এই চারটি ভিত্তির উপর সংগঠনের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠে।

আমরা যারা পূর্বে বা বর্তমানে নেতৃত্বে রয়েছি, আমাদের দায়িত্ব ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এমনভাবে গড়ে তোলা-যাতে তারা নববী আদর্শে গঠিত নেতৃত্ব, প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা ও জবাবদিহিমূলক চরিত্র নিয়ে সমাজে দীপ্ত আলোকবর্তিকা হয়ে উঠতে পারে।

"رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ"

"হে আল্লাহ! আমাকে আপনার অনুগ্রহের শোকর আদায়ের তাওফিক দিন।"

প্রফেসর ড. মো. লোকমান হোসেন
আল কোরআন বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

মব সন্ত্রাস: ইসলামের দৃষ্টিতে এর কারণ ও প্রতিকার

১. ভূমিকা:

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা হল মব সন্ত্রাস বা উগ্রপন্থা। সাধারণত কোনো অপরাধ বা অপরাধীকে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় বিচার না করে, উত্তেজিত জনতা নিজেরাই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করার নামই মব সন্ত্রাস। এ ধরনের ঘটনা সাধারণত আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা বা অপরাধের প্রতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানো থেকেই ঘটে।

এ ধরনের সামাজিক ব্যাধি মানবিক মূল্যবোধ, শান্তি ও সাম্যের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। বিভিন্ন কারণে এসব মানবতাবিরোধী ও সমাজ বিধ্বংসী ব্যাধির উৎপত্তি হয়ে থাকে এবং সমাজের আনাচে কানাচে বাঁসা বেঁধে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এমন ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে চাইলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে এর কারণ কি এবং কোথায় কিভাবে এর বিস্তার ঘটে থাকে। সময় মত এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিতে না পারলে এ ব্যাধি মারাত্মক আকার ধারণ করে থাকে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এর মধ্যে ধর্মের আবহ যেমন বিদ্যমান তেমন সমাজ ও রাষ্ট্রের যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়ও সে বদ্ধপরিকর। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই এখানে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মব সন্ত্রাসের সংজ্ঞা, কারণ, প্রভাব এবং প্রতিকার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২. মব সন্ত্রাসের সংজ্ঞা:

মব সন্ত্রাস (Mob Violence) এর সংজ্ঞা: মব (Mob) অর্থ উত্তাল জনতা বা উচ্ছৃঙ্খল জনতা। আর Violence বা সন্ত্রাস হল রাজনৈতিক, আদর্শিক বা ব্যক্তিগত কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনগণের মধ্যে ভয়ভীতি এবং ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সহিংসতা ও নৃশংসতার ব্যবহার। এক কথায় মব সন্ত্রাস হলো এমন এক ধরনের সহিংসতা যেখানে উত্তেজিত জনতা কোনো ব্যক্তিকে বা গোষ্ঠীকে বিচার বহির্ভূতভাবে আক্রমণ, নির্যাতন বা হত্যা করে। এটি একটি স্বতঃস্ফূর্ত এবং আবেগপ্রবণ সামাজিক আচরণ যেখানে আইনের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব থাকে। মব সন্ত্রাস (Mob Violence) কে মব জাস্টিস' (Mob Justice) ও বলা হয়। এটি একটি অবজ্ঞাসূচক শব্দ। জাস্টিস (Justice) অর্থ বিচার বা ন্যায়বিচার। 'মব জাস্টিস' অর্থ উত্তাল জনতা বা উচ্ছৃঙ্খল জনতার বিচার। একে উচ্ছৃঙ্খল গণবিচার, গণপিটুনি, মব রুল বা মবোক্রেসি বলেও প্রকাশ করা হয়। 'মব জাস্টিস' (Mob Justice) বলতে আইন জনতার নিজের হাতে তুলে নেওয়াকে বোঝানো হয়। সাধারণত কোনো অপরাধ বা অপরাধীকে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় বিচার না করে, উত্তেজিত জনতা নিজেরাই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করে। এ ধরনের ঘটনা সাধারণত আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা, বা অপরাধের প্রতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানো থেকে ঘটে থাকে। মব সন্ত্রাসের পরিণতি সাধারণত অনেক গুরুতর ও ধ্বংসাত্মক হয়, যা ব্যক্তি, সমাজ এবং আইনি ব্যবস্থার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। বিচারব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়। অপরাধের সংস্কৃতি বৃদ্ধি পায়। এসব পরিণতির কারণে মব সন্ত্রাসকে দমন করতে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সরকার ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

৩. ইসলামের দৃষ্টিতে মব সন্ত্রাস: ইসলামের দৃষ্টিতে মব সন্ত্রাস হল অবিচার, অস্থিরতা এবং অন্যের অধিকার হরণ বা আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া। এটা উগ্রপন্থা (الغلو/Extremism) এর একটি বাহ্যিক রূপ। ইসলাম সর্বদা আইনের শাসন ও সুবিচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। সুতরাং মব সন্ত্রাস ইসলামে স্পষ্টভাবে হারাম তথা নিষিদ্ধ।

৪. ইসলামের দৃষ্টিতে মব সন্ত্রাসের কারণ: ইসলামের দৃষ্টিতে মব সন্ত্রাসের পিছনে নানাবিধ কারণ নিহিত আছে। যেমন: মনস্তত্ত্ব, গোষ্ঠীগত উন্মাদনা, হতাশা, বিভ্রান্তি, বৈষম্য, বেকারত্ব, গুজব ইত্যাদি। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ ব্যাখ্যা করা হলো:

৪.১. সীমালঙ্গন করা: ইসলামের দৃষ্টিতে মহান আল্লাহ জগতের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি প্রত্যেক সৃষ্টিকে একটি সীমারেখা দিয়ে পাঠিয়েছেন। প্রত্যেক সৃষ্টি তার সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করাই তার জন্য মঙ্গলকর। সীমালংঘন করলে তার যেমন ক্ষতি তেমনি অন্যের জন্যও তা ক্ষতির কারণ। এজন্যই ইসলাম যেকোনো ক্ষেত্রে সীমালংঘন করাকে অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে। পবিত্র কোরআনে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে: **وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ -"তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"[১]**

এ প্রসঙ্গে সূরা মায়েদায় (আয়াত ২৮-৩১) একটি প্রনিধানযোগ্য ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে: হযরত আদম আলাইহিস সালামের দুই সন্তান-হাবিল ও কাবিল একদা উভয়ে আল্লাহর দরবারে কোরবানি পেশ করলো। তবে হাবিলের কুরবানী কবুল হলো কিন্তু কাবিলের কুরবানী কবুল হলো না। এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে কাবিল নিজের দোষক্রুটির প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে বরং হাবিলকে দোষারোপ করল এবং তাকে হত্যা চেষ্টায় অগ্রগামী হলো। এ দেখে হাবিল বলল- তুমি আমাকে বিনা বিচারে/বিনা দোষে হত্যা করলেও আমি তোমাকে এভাবে হত্যা করতে রাজি নই। তবুও কাবিল সীমালংঘন করে আপন ভাইকে হত্যা করল এবং ইহকাল ও পরকাল হারালো। একথার সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে: - فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ-"অতঃপর তার প্রবৃত্তির কুপ্ররোচনা তার জন্য আপন ভাইকে হত্যা করা সহজ করে দিল এবং তাকে সে মেরে ফেলল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।"[২]

৪.২. গুজবে কান দেয়া: গুজব ও বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য মব সন্ত্রাসকে উস্কে দেয়। উগ্রপন্থা মব সন্ত্রাসের আদর্শিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এজন্য ইসলাম কখনোই যেন কেউ গুজবের পিছনে না পড়ে সেজন্য সতর্কবাণীসহ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ-**"হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ আনয়ন করে, তবে তা** যাচাই করে নাও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা না জেনে শুনেই কোন জাতির ক্ষতি করে বসবে এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।"[৩]

৪.৩. সংস্কৃতি,আদর্শ বা ধর্মীয় ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা: ধর্মীয় কিংবা সামাজিক যেকোনো বিষয়েই অতিরঞ্জন ও চরমপন্থা গ্রহণ করাকে ইসলাম মব সন্ত্রাসের একটি অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করে। এজন্য ইসলাম একে নিন্দনীয় ও বর্জনীয় হিসেবে গণ্য করে পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন: إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ

১.সূরা আল বাকারা, ২ : ১৯০
২. সূরা আল মায়েদা, ৫ : ৩০
৩. সূরা আল হুজরাত, ৪৯ : ৬

-"ধর্মে বাড়াবাড়ি করা থেকো দূরে থাকো, কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগণ ধর্মে বাড়াবাড়ির কারণেই ধ্বংস হয়েছে।"[৪] পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ "হে কিতাবধারীগণ! তোমরা তোমাদের ধর্মে বাড়াবাড়ি করো না।"[৫]

পবিত্র কোরআনে আরও বলা হয়েছে: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ-"ধর্মে কোন বাড়াবাড়ির স্থান নেই"[৬]

৪.৪. আইনের শাসনের দুর্বলতা: যখন মানুষ মনে করে যে, প্রচলিত আইন ব্যবস্থা অপরাধীদের শাস্তি দিতে ব্যর্থ হচ্ছে বা বিচার প্রক্রিয়ায় আস্থা কমে যায়, তখন তারা নিজেরাই বিচার করতে উৎসাহিত হয়।

৪.৫. সামাজিক অস্থিরতা ও অবিশ্বাস: সমাজে যখন অস্থিরতা বা নিরাপত্তাহীনতার বোধ তৈরি হয়, তখন মানুষ সহজেই উত্তেজিত হয়ে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়।

৪.৬. রাজনৈতিক বা গোষ্ঠীগত উস্কানি: কখনো কখনো রাজনৈতিক বা গোষ্ঠীগত স্বার্থে জনতাকে উস্কানি দিয়ে মব সন্ত্রাস ঘটানো হয়।

৪.৭. আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা: কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সময় মতো পদক্ষেপ না নেওয়া বা নিষ্ক্রিয়তাও মব সন্ত্রাস সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

৫. সমাজের উপর এর কুপ্রভাব: মব সন্ত্রাস সমাজে এবং রাষ্ট্রে বিভিন্নভাবে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যেমন: ৫.১. আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ, ৫.২. নিরীহ মানুষের প্রাণহানি, ৫.৩. ধর্মীয় ও সামাজিক বিভাজন,

৫.৪. অস্থিরতা ও আতঙ্ক সৃষ্টি ইত্যাদি।

৬. ইসলামের দৃষ্টিতে এর প্রতিকার: রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে মব সন্ত্রাসকে দূরীভূত করার জন্য ইসলামের রয়েছে সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। নিম্নে তার কিছু আলোকপাত করা হলো।

৬.১. ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা: শিশু ও তরুণদের মধ্যে সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা ও ন্যায়বোধ গড়ে তোলা। প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরা, যাতে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি অপব্যাখ্যা বন্ধ হয়। মসজিদ, মাদ্রাসা ও গণমাধ্যমের মাধ্যমে শান্তির শিক্ষা সমাজের আনাচে-কানাচে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

৬.২. আইনের কার্যকর প্রয়োগ: মব সন্ত্রাসে অংশগ্রহণকারীদের শাস্তি নিশ্চিত করা। অনলাইন-অফলাইন উসকানিদাতাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া। আইনের শাসনের প্রতি আস্থা বৃদ্ধির জন্য বিচারপ্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখা। ইসলামী আইন অনুযায়ী, গণপিটুনিতে জড়িত সকল ব্যক্তিই অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৬.৩. গণসচেতনতা ও গণমাধ্যমের ভূমিকা: সমাজ ও রাষ্ট্রে গুজব প্রতিরোধে সত্য যাচাই (Fact-checking) এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। পাশাপাশি এ ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজও অব্যাহত রাখতে হবে। সেই সাথে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও গণমাধ্যমের সচেতন প্রচারণা চালিয়ে যেতে হবে। এছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হোক কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান- সকল কর্মস্থলেই শান্তি ও সহাবস্থানের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৬.৪. যুব সমাজের ইতিবাচক সম্পৃক্ততা: তরুণদের নেতৃত্বের বিকাশ ও তাদের সুস্থ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক

৪. সুনান ইবনে মাজাহ- ৩০২৯, সহীহ
৫. সূরা আন নিসা, ৪: ১৭১
৬. সূরা আল বাকারা, ২: ২৫৬

কর্মকাণ্ডে যুক্ত করা। তরুণদের আইটি, বিজ্ঞান, মানবিক ও ধর্মীয় শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তোলা। স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম ও সামাজিক উদ্যোগে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা রাখা।

৬.৫. আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সামাজিক সম্প্রীতি: ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বোঝাপড়া ও সহাবস্থানের চর্চা করা। আন্তঃধর্মীয় শান্তি সম্মেলন, সামাজিক উৎসব ও অভিন্ন মানবিক কার্যক্রমের প্রসার ঘটানো।

৬.৬. প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিরোধ: সামাজিক মাধ্যমে গুজব ও বিদ্বেষ ছড়ানো প্রতিরোধে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মানবসম্পদ ব্যবহারের সমন্বয় সাধন করতে হবে। পাশাপাশি ডিজিটাল লিটারেসি বা প্রযুক্তি সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৭. উপসংহার: মব সন্ত্রাস বা উগ্রপন্থা মানবসভ্যতার জন্য এক গভীর সংকট। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা, আইন প্রতিষ্ঠা, প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার এবং যুব সমাজের ইতিবাচক ভূমিকা এই সংকট উত্তরণে সহায়ক হতে পারে। সামাজিক ও ধর্মীয় ঐক্য, সচেতনতা ও শিক্ষার মাধ্যমে আমরা সহিংসতামুক্ত, মানবিক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে পারি। এই মর্মে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন ভূমিকা পালন করতে হবে।

মুস্তাফিজুর রহমান
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ
মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, জেলা শাখা

তথ্যপ্রযুক্তির যুগে দাওয়াহ: তরুণদের সম্ভাবনা ও ঝুঁকি

আকাশ ফুঁড়ে নেমে আসা এক অদৃশ্য শক্তি যেন বিশ্বকে আজ হাতের মুঠোয় পুরেছে। এই শক্তি হলো তথ্যপ্রযুক্তি, যা মানুষের জীবনধারার প্রতিটি স্পন্দনকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করছে। একুশ শতকের এই বিশ্বায়িত প্রেক্ষাপটে, যখন তারের জাল আর আলোর গতিতে তথ্য ছুটছে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, তখন দাওয়াহ বা দ্বীনের প্রচারের চিরায়ত রূপটিও এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। একসময় যেখানে দাওয়াত মানে ছিল মাহফিলের মিম্বর থেকে ধ্বনিত ওজস্বী ভাষণ, মসজিদের আঙিনায় নীরব তারবিয়াহ, কিংবা ব্যক্তিগত সাক্ষাতে হৃদয় থেকে হৃদয়ে কথার সেতু নির্মাণ, আজ সেখানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো হয়ে উঠেছে দাওয়াতের নতুন রণক্ষেত্র। এই যুগান্তকারী পরিবর্তন তরুণদের জন্য নিয়ে এসেছে অমিত সম্ভাবনা, কারণ তারাই প্রযুক্তির সবচেয়ে নিপুণ কারিগর। তবে, এই আলোকিত পথের বাঁকে লুকিয়ে আছে কিছু গভীর অন্ধকারও, কিছু গুরুতর ঝুঁকি, যা সচেতনভাবে মোকাবেলা করা না গেলে আলোর বদলে আঁধারই গ্রাস করতে পারে। এ যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ: সম্ভাবনা আর ঝুঁকি, দুটোই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

১. নতুন দিগন্ত: তথ্যপ্রযুক্তি যুগে দাওয়াতের অমিত সম্ভাবনা: প্রযুক্তির জয়যাত্রা দাওয়াতের কাজকে এক নতুন দিগন্তে উন্মোচন করেছে, যা এক দশক আগেও ছিল কল্পনাতীত। এর সুফলগুলো যেন সুদূরপ্রসারী নদীর মতো বয়ে চলেছে, প্লাবিত করছে জ্ঞানের পিপাসুদের হৃদয়:

প্রথমত, ব্যাপক পরিসরে পৌঁছানোর অনন্য সুযোগ: ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ফেসবুক, ইউটিউব, এক্স (টুইটার), ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, পাশাপাশি ব্লগ, পডকাস্ট এবং বিভিন্ন ডিজিটাল অ্যাপস ব্যবহার করে একজন দায়ি মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে তার বার্তা পৌঁছে দিতে পারেন। ভৌগোলিক সীমারেখা আজ আর দাওয়াতের পথে কোনো বাধা নয়। প্রত্যন্ত জনপদের কোনো তরুণ বা কোনো গৃহিণীও এখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেমদের থেকে সরাসরি বিশুদ্ধ ইসলামী জ্ঞান লাভ করতে পারছেন। সৌদি আরবের কোনো মুফতি, মিশরের কোনো শাইখ কিংবা বাংলাদেশের কোনো অভিজ্ঞ আলেম-সবার জ্ঞান এখন এক ক্লিক দূরে। এটি যেন জ্ঞানের এক অবাধ প্রবাহ, যা সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, জ্ঞানের সহজলভ্যতা ও তাৎক্ষণিকতা: তথ্যপ্রযুক্তি ইসলামিক জ্ঞানকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে এক অলৌকিক স্পর্শে। একটি সরল 'সার্চ' বা 'ক্লিক'-এর মাধ্যমে কুরআনের তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা, ফিকহি মাসআলা, ইসলামিক ইতিহাস, কিংবা বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের ইসলামিক স্কলারের লেকচার পাওয়া যাচ্ছে নিমেষেই। তরুণরা তাদের স্মার্টফোন বা ল্যাপটপ ব্যবহার করে যেকোনো সময়, যেকোনো স্থান থেকে নিজেদের পছন্দমতো বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারছে। লাইভ স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেওয়া এখন আর কোনো জটিল প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি দৈনন্দিন জীবনের এক সাধারণ অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। জ্ঞান অন্বেষণের এই সহজলভ্যতা মানুষের মধ্যে আত্মিক তৃষ্ণা সৃষ্টি করছে।

তৃতীয়ত, বহুমুখী ও আকর্ষণীয় উপস্থাপনা: প্রযুক্তির জাদুর ছোঁয়ায় দাওয়াতকে এখন কেবল মৌখিক বা লিখিত আকারে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। অ্যানিমেশন, থ্রিডি গ্রাফিক্স, শর্ট ফিল্ম, অনুপ্রেরণামূলক ডকুমেন্টারি, ইনোগ্রাফিক্স, অডিও-ভিডিও লেকচার, পডকাস্ট-এমন বহু সৃজনশীল মাধ্যমে দাওয়াতকে আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলা সম্ভব হচ্ছে। তরুণ প্রজন্ম, যারা ভিজ্যুয়াল কন্টেন্টে অভ্যস্ত এবং দ্রুত তথ্যে

আগ্রহী, তাদের কাছে এই ধরনের দাওয়াত অনেক বেশি আবেদনময়। জটিল বিষয়গুলোকেও সহজবোধ্য ও আনন্দদায়ক উপায়ে উপস্থাপন করা যায়, যা জ্ঞানের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে। এটি যেন এক শিল্পীর তুলিতে আঁকা দাওয়াতের ক্যানভাস।

চতুর্থত, পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার নবদিগন্ত: অনলাইন ফোরাম, গ্রুপ চ্যাট, মেসেজিং অ্যাপস এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোর মাধ্যমে দায়ি ও শ্রোতাদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হচ্ছে। প্রশ্নোত্তরের সেশন, মতামত আদান-প্রদান এবং সমমনা ব্যক্তিদের নিয়ে ভার্চুয়াল কমিউনিটি গড়ে তোলা এখন সহজ। এর মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ শুধু একমুখী থাকে না, বরং পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ও আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে আরও ফলপ্রসূ হয়। বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতির দায়িদের মধ্যে সহযোগিতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হচ্ছে, যা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একাত্মতা বাড়াতে সাহায্য করছে।

পঞ্চমত, বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান সকলের জন্য উন্মুক্ত: তথ্যপ্রযুক্তি আন্তর্জাতিক মানের ইসলামিক স্কলার এবং গবেষকদের জ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকিহ এবং আধুনিক গবেষকদের আলোচনা এখন অনলাইনেই পাওয়া যায়, যা পূর্বে দুর্লভ ছিল। মাদ্রাসা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরেও সাধারণ মানুষ এই জ্ঞান লাভ করতে পারছে। এটি তরুণদেরকে বিশুদ্ধ আকিদা ও সহীহ মানহাজের দিকে ফিরিয়ে আনতে এবং বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

২. আলোর বিপরীতে আঁধার: তরুণদের জন্য গুরুতর ঝুঁকি: প্রযুক্তির এই সুবিশাল আলোকচ্ছটা যেমন মানবজাতিকে আলোকিত করছে, তেমনি এর অপরিকল্পিত বা অসতর্ক ব্যবহার তরুণদের জন্য গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করতে পারে, বিশেষ করে দাওয়াতের ময়দানে। এই ঝুঁকিগুলো যেন আঁধারের অদৃশ্য প্রেতের মতো, যা প্রদীপের নিচেই লুকিয়ে থাকে:

প্রথমত, ভুল তথ্য ও বিভ্রান্তির অবাধ বিস্তার: ইন্টারনেটে জ্ঞানের পাশাপাশি ভুল তথ্য, ভিত্তিহীন প্রচারণা এবং বিকৃত ব্যাখ্যার যেন এক অবাধ সমুদ্র। যাচাই-বাছাই ছাড়া যেকোনো তথ্য গ্রহণ করলে তরুণরা সহজেই বিভ্রান্ত হতে পারে, যা তাদের আকিদা ও ইমানকে দুর্বল করে দেয়। অনেক সময় কিছু অসাধু চক্র ইসলামের নামে চরমপন্থা, উগ্রবাদ বা বিভেদ সৃষ্টিকারী মতবাদ প্রচার করে, যা তরুণদের ভুল পথে চালিত করতে পারে এবং সমাজে অস্থিরতা তৈরি করতে পারে। সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করার এই অপচেষ্টাগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও বিপজ্জনক।

দ্বিতীয়ত, অযোগ্য ও প্রমাণহীন তথ্যের ছড়াছড়ি: সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোতে অনেকেই ইসলামী বিষয়ে মন্তব্য করে বা ফতোয়া দেয়, যাদের হয়তো যথেষ্ট জ্ঞান, যোগ্যতা বা ইসলামী বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য নেই। তরুনরা সহজেই এমন অপ্রমাণিত বা দুর্বল তথ্যের শিকার হতে পারে, যা তাদের আকিদা বা আমলের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। কে সত্য বলছে আর কে মিথ্যা, কে যোগ্য আর কে অযোগ্য, তা নির্ধারণ করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। এতে ইসলামের পবিত্রতা ক্ষুন্য হয় এবং ভুল ধারণার জন্ম হয়।

তৃতীয়ত, অতিরিক্ত সময় অপচয় ও ভয়াবহ আসক্তি: ইন্টারনেটের অবাধ ব্যবহার তরুণদের জন্য ভয়াবহ আসক্তির কারণ হতে পারে। দাওয়াতী কন্টেন্ট খুঁজতে গিয়ে বা ইসলামিক গ্রুপে যুক্ত হয়ে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয় করে ফেলতে পারে, যা তাদের দৈনন্দিন পড়ালেখা, পারিবারিক বা সামাজিক দায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। অকারণে স্ক্রল করা, বিনোদনমূলক কন্টেন্টে ডুবে যাওয়া, অথবা

গেমিংয়ে আসক্ত হয়ে পড়া - এ সবই মূল্যবান সময় ও মেধার অপচয় ঘটায়। এটি যেন এক অদৃশ্য কারাগার, যেখানে তরুণরা স্বেচ্ছায় বন্দি হয়।

চতুর্থত, অনলাইন বিতর্ক ও বিভেদের বৃদ্ধি: অনলাইনে মুক্ত আলোচনার নামে অনেক সময় শালীনতা ও ধৈর্যের সীমা লঙ্ঘিত হয়। বিভিন্ন মাযহাব, আকিদা বা ফিকহি বিষয়ে বিতর্ক এত বেশি বেড়ে যায় যে তা ব্যক্তিগত বিদ্বেষে পরিণত হয়। তরুণরা এই বিতর্কের জালে জড়িয়ে পড়ে তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে এবং মানসিক অস্থিরতার শিকার হয়, যা তাদের মধ্যে অনৈক্য, ঘৃণা ও বিভেদ তৈরি করে। গঠনমূলক আলোচনার পরিবর্তে তা ব্যক্তিগত আক্রমণ ও অপবাদের রূপ নেয়, যা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের পরিপন্থী।

পঞ্চমত, নৈতিক অবক্ষয় ও ফিতনার বিস্তার: ইন্টারনেটে পর্নোগ্রাফি, অশ্লীলতা এবং অনৈতিক কন্টেন্টের সহজলভ্যতা তরুণদের জন্য মারাত্মক নৈতিক ঝুঁকি তৈরি করে। দাওয়াতী কন্টেন্ট দেখতে গিয়ে অসাবধানতাবশত বা কৌতূহলবশত তারা এমন কন্টেন্টের সংস্পর্শে আসতে পারে, যা তাদের চরিত্র ও নৈতিকতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তাদের অন্তরকে কলুষিত করে। ফিতনার এই যুগে আত্মসংযম ও তাকওয়ার অনুশীলন ছাড়া এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন।

ষষ্ঠত, গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার ঝুঁকি: ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হওয়া, ফিশিং (Phishing) বা হ্যাকিংয়ের শিকার হওয়াও অনলাইন কার্যক্রমের বড় ঝুঁকি। তরুণরা অসচেতনভাবে ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করে বা অনিরাপদ লিংকে ক্লিক করে নিজেদের সাইবার ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে। এতে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য চুরি হতে পারে, যা পরবর্তীতে ব্লাকমেইল বা অন্যান্য অপরাধের কারণ হতে পারে।

সপ্তমত, 'ক্লিকটিভিজম' ও বাস্তব বিমুখতা: অনলাইনে দাওয়াতি কাজ করে অনেকেই এক ধরনের আত্মতৃপ্তি লাভ করেন, যাকে 'ক্লিকটিভিজম' বলা হয়। তারা মনে করেন শুধু অনলাইনে পোস্ট শেয়ার বা কমেন্ট করাই দাওয়াতের সবটুকু। এর ফলে তারা বাস্তব জীবনে দাওয়াতি কার্যক্রম, ব্যক্তিগত ইবাদত (যেমন মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া, আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ নেওয়া) বা সামাজিক দায়িত্ব (যেমন প্রতিবেশীর হক আদায়, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া) থেকে দূরে সরে যেতে পারে। বাস্তব দুনিয়ায় নেমে মানুষের কাছে সরাসরি দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার মানসিকতা কমে যেতে পারে। এটি দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করে।

৩. তরুণদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো ও ঝুঁকি মোকাবেলা: বিচক্ষণতার পথে তথ্যপ্রযুক্তির এই দ্বিমুখী বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করে তরুণদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে এবং ঝুঁকি মোকাবেলা করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। এ যেন কাঁটা বিছানো পথে গোলাপ তোলার মতো এক সূক্ষ্ম কৌশল:

প্রথমত, শিক্ষিত ও সচেতন হওয়া: তরুণদের প্রথমেই জানতে হবে কীভাবে সঠিক তথ্য যাচাই করতে হয়। নির্ভরযোগ্য সূত্র, বিজ্ঞ আলেম এবং প্রমাণিত ওয়েবসাইটের তালিকা তাদের কাছে থাকতে হবে। যেকোনো তথ্য শেয়ার করার আগে তার সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। 'যাচাই করো' - এই মূলমন্ত্রটি তাদের প্রতিটি অনলাইন কার্যক্রমে অনুসরণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, যোগ্য দায়িদের প্রস্তুতি ও প্রজ্ঞা: যারা অনলাইনে দাওয়াতের কাজ করবেন, তাদের কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে গভীর পাণ্ডিত্য এবং সমকালীন বিশ্বের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। তাদের উপস্থাপনা হতে হবে আকর্ষণীয়, স্পষ্ট, যুক্তিপূর্ণ এবং শালীন। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ করে তোলার জন্য তাদের

নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি, যাতে তারা যুগের চাহিদা মেটাতে পারে।

তৃতীয়ত, পরিবার, প্রতিষ্ঠান ও সমাজের সম্মিলিত ভূমিকা: পরিবার, মাদরাসা, মসজিদ এবং ইসলামী সংগঠনগুলোর উচিত তরুণদের প্রযুক্তি ব্যবহারে সঠিক নির্দেশনা দেওয়া। তাদেরকে শুধু ইন্টারনেটের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক না করে, এর সঠিক ও ইতিবাচক ব্যবহার শেখানো উচিত। ইন্টারনেট ব্যবহারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, সময়সীমা এবং অভিভাবকদের পর্যবেক্ষণ জরুরি। সমাজের সকল স্তরে সচেতনতা বাড়ানো অপরিহার্য।

চতুর্থত, গুণগত মানসম্পন্ন কন্টেন্ট তৈরি ও প্রচার: নির্ভরযোগ্য ইসলামিক প্রতিষ্ঠান ও স্কলারদের উচিত উচ্চ গুণগত মানের, আকর্ষণীয়, প্রমাণভিত্তিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামিক কন্টেন্ট তৈরি করা। এতে তরুণরা ভুল তথ্যের দিকে ঝুঁকবে না এবং সঠিক জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী হবে। ভিডিও, পডকাস্ট, ইনোগ্রাফিক্স, ই-বুক - প্রতিটি ফরম্যাটেই উন্নত মানের কন্টেন্ট তৈরি করতে হবে।

পঞ্চমত, ইতিবাচক অনলাইন পরিবেশ তৈরি: তরুণদের উচিত অনলাইনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নেওয়া, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং অনর্থক বিতর্ক এড়িয়ে চলা। বিভেদ ও উগ্রতা ছড়ানো হয় এমন গ্রুপ বা পেজ থেকে দূরে থাকতে হবে এবং অন্যদেরকেও এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিতে হবে। অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোকে যেন সুস্থ জ্ঞানচর্চা ও ভ্রাতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ষষ্ঠত, ব্যক্তিগত ভারসাম্য বজায় রাখা: প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তরুণদের ব্যক্তিগত ভারসাম্য বজায় রাখা শিখতে হবে। অনলাইন জগতে অতিরিক্ত সময় ব্যয় না করে বাস্তব জীবনে ইবাদত, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, পারিবারিক দায়িত্ব এবং পড়ালেখার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। প্রযুক্তির ব্যবহার যেন তাদের বাস্তব জীবনের দায়িত্ব থেকে দূরে সরিয়ে না দেয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

সপ্তমত, সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ: ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা এবং সাইবার ঝুঁকি সম্পর্কে তরুণদের সচেতন করতে হবে। শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার, অপরিচিত লিংকে ক্লিক না করা এবং নির্ভরযোগ্য এন্টি-ভাইরাস সফটওয়্যার ব্যবহারের বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি। অনলাইন ফিশিং, হ্যাকিং এবং ব্যক্তিগত তথ্য চুরির বিষয়ে তাদের জ্ঞান দিতে হবে।

তথ্যপ্রযুক্তির যুগে দাওয়াতের জন্য কিছু বিখ্যাত ওয়েবসাইট ও অ্যাপস:

1. IslamQA.info (আরবি, ইংরেজি ও অন্যান্য): শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ কর্তৃক পরিচালিত এটি একটি জনপ্রিয় প্রশ্ন-উত্তরের ওয়েবসাইট। এখানে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিভিন্ন ফিকহি মাসআলা এবং ইসলামিক বিষয়ে বিস্তারিত উত্তর দেওয়া হয়। এটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিমদের মধ্যে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য হিসেবে পরিচিত।
2. IslamWeb.net (আরবি, ইংরেজি ও অন্যান্য): কাতারে অবস্থিত এই ওয়েবসাইটটি ইসলামিক জ্ঞানের এক বিশাল ভাণ্ডার। এখানে ফতোয়া, কুরআন, হাদীস, ইসলামিক আর্টিকেলের বিশাল সংগ্রহ রয়েছে। এটি বিভিন্ন ভাষায় ইসলামিক তথ্য সরবরাহ করে।
3. Sunnah.com (ইংরেজি): হাদীস অধ্যয়নের জন্য এটি একটি অন্যতম সেরা ওয়েবসাইট। এখানে সহীহ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ সহ হাদীসের প্রধান প্রধান কিতাবগুলো ইংরেজিতে পাওয়া যায়, যা গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য অত্যন্ত সহায়ক।

4 Quran.com (আরবি, ইংরেজি ও অন্যান্য): কুরআনুল কারীম অধ্যয়নের জন্য এটি একটি অসাধারণ প্ল্যাটফর্ম। এখানে কুরআনের বিভিন্ন অনুবাদ, তাফসীর এবং কারীদের সুললিত তেলাওয়াত পাওয়া যায়। এর ইন্টারফেস খুবই ইউজার-ফ্রেন্ডলি।

5 IslamHouse.com (বিভিন্ন ভাষা): এটি বিভিন্ন ভাষায় ইসলামিক বই, আর্টিকেল, অডিও ও ভিডিও লেকচারের একটি বিশাল সংগ্রহশালা। বিভিন্ন অমুসলিমদের কাছে ইসলামকে সহজভাবে উপস্থাপনের জন্যও এটি কাজ করে।

6 Islamic Online University (IOU) / Salafi Online University (Dr. Bilal Philips): ড. বিলাল ফিলিপস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই অনলাইন বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে এবং স্বল্প খরচে ইসলামিক কোর্স ও ডিগ্রি প্রোগ্রাম অফার করে। এটি অনলাইনে উচ্চমানের ইসলামিক শিক্ষা লাভের এক অনন্য সুযোগ তৈরি করেছে।

7 Yaqeen Institute (ইংরেজি): ড. ওমর সুলাইমান (Omar Suleiman) পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানটি আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়কে বিশ্লেষণ করে এবং বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলোর ইসলামিক সমাধান নিয়ে কাজ করে। তাদের গবেষণাভিত্তিক আর্টিকেল ও ভিডিও খুবই জনপ্রিয়।

8 Al-Islam.org (ইংরেজি, ফার্সি ও অন্যান্য): শিয়া ইসলামের উপর গবেষণামূলক বই, আর্টিকেল, ভিডিও এবং অডিও লেকচারের একটি বিশাল সংগ্রহ এখানে পাওয়া যায়। যদিও এটি শিয়া মতাদর্শের, তবে ইসলামিক জ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্ল্যাটফর্ম।

9 Zad Academy (ইংরেজি): এটি একটি বিনামূল্যে অনলাইন ইসলামিক প্রোগ্রাম অফার করে যা আকীদা, সিরাহ, ফিকহ, তাফসীর, হাদীস এবং আরবি ভাষা সহ ৭টি মূল বিষয়ে একটি বিস্তৃত ইসলামিক পাঠ্যক্রম সরবরাহ করে।

10 ২. জনপ্রিয় ইসলামিক অ্যাপস (Popular Islamic Apps):

11 Muslim Pro (বিভিন্ন ভাষা): এটি বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় ইসলামিক অ্যাপগুলোর মধ্যে একটি। এতে রয়েছে সঠিক সালাতের সময়, আজানের নোটিফিকেশন, কিবলা কম্পাস, কুরআন, দু'আ, হাদীস, মুসলিম রেস্টুরেন্ট ও মসজিদের লোকেশন ইত্যাদি।

12 Athan (বিভিন্ন ভাষা): এটিও সালাতের সময় ও আজানের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি অ্যাপ। এর সাথে কুরআন, দু'আ, হাদীস, কিবলা, ইসলামিক ক্যালেন্ডার এবং বিভিন্ন ইসলামিক কন্টেন্ট থাকে।

13 Quran Majeed (বিভিন্ন ভাষা): কুরআনের জন্য একটি অত্যন্ত ফিচার-সমৃদ্ধ অ্যাপ। এতে কুরআনের বিভিন্ন তেলাওয়াত, অনুবাদ (বিভিন্ন ভাষায়), তাফসীর, তাফসীরের অডিও, এবং মুখস্থ করার সরঞ্জাম রয়েছে।

14 Hadith Collection / Hadith Companion (ইংরেজি, আরবি): সহীহ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ সহ হাদীসের প্রধান কিতাবগুলো এই অ্যাপে সুন্দরভাবে সাজানো থাকে। হাদীস গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য এটি খুবই কার্যকর।

15 Hisn al-Muslim (বিভিন্ন ভাষা): এটি প্রতিদিনের মাসনুন দু'আ ও যিকরের একটি বিশাল সংগ্রহ। সকাল-সন্ধ্যার যিকর, ঘুমানোর দু'আ, বিভিন্ন বিপদ-আপদে পড়ার দু'আ ইত্যাদি এখানে পাওয়া যায়।

16 Al Quran (Tafsir & by Word) (বিভিন্ন ভাষা): এই অ্যাপটি কুরআনের প্রতিটি আয়াতের

শব্দ-দ্বারা-শব্দ অনুবাদ এবং তাফসীর সরবরাহ করে, যা কুরআনের গভীর অর্থ বুঝতে সাহায্য করে।

17 Learn Quran Tajwid (বিভিন্ন ভাষা): কুরআন সঠিকভাবে তেলাওয়াত শেখার জন্য এই অ্যাপটি খুব সহায়ক। এতে তাজবীদের নিয়মাবলী, মাখরাজ, এবং ধাপে ধাপে তেলাওয়াত শেখার কোর্স রয়েছে।

18 Muslim Dawah (Al Quran Majeed, Prayer Time) (বিভিন্ন ভাষা): এই অ্যাপটিতে কুরআন, সালাতের সময়, আজান, কিবলা, দু'আ, হাদীস, তাসবীহ, মসজিদ ফাইন্ডার সহ দাওয়াহর জন্য প্রয়োজনীয় অনেক ফিচার রয়েছে।

19 Everything Islam (ইংরেজি): এই অ্যাপটিতে কুরআন, প্রবন্ধ, ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার গল্প, ওযু-গোসলের নিয়ম, ইসলামিক কুইজ এবং বিভিন্ন ইসলামিক প্রশ্ন-উত্তরের মতো বিভিন্ন শিক্ষামূলক কন্টেন্ট রয়েছে।

উপসংহার:

তথ্যপ্রযুক্তি যুগ দাওয়াতের ক্ষেত্রে এক অপার বিপ্লব নিয়ে এসেছে। এটি তরুণ প্রজন্মের জন্য অসীম সম্ভাবনা তৈরি করেছে, যেখানে তারা সহজেই জ্ঞান অর্জন করতে পারছে এবং বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে দাওয়াতের বার্তা পৌঁছে দিতে পারছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে এর ঝুঁকিগুলো সম্পর্কে গভীর সচেতনতা এবং বিচক্ষণতার সাথে তা মোকাবেলা করা অপরিহার্য। তরুণদের হাতে যখন বিশুদ্ধ জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার একত্রিত হবে, তখন তা জাহেলিয়াতের সকল অন্ধকার দূর করে এক উজ্জ্বল জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে। দাওয়াতকে শুধু ডিজিটালাইজড করলেই হবে না, এর সাথে আত্মার গভীর সংযোগ থাকতে হবে, যা মানুষকে সত্যিকার অর্থেই হেদায়েতের পথে পরিচালিত করবে। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টাই ইসলামী দাওয়াতকে তথ্যপ্রযুক্তি যুগে সফলতার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে দেবে, এবং ইনশাআল্লাহ, এক সোনালী ভবিষ্যৎ নির্মাণে সাহায্য করবে।

বনু ইসরাঈল ও জায়নবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হাসিবুল আলম

অধ্যয়নরত, হাদীস বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব

বাস্তবতা ১: ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ হচ্ছে কোনো জনসমষ্ঠির সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সুন্নাহ। আল্লাহ তায়ালার সুন্নাহ কখনও পরিবর্তন হয় না।

বাস্তবতা ২: নাবী সাঃ বলেছেন, "আমরা অবশ্যই আমাদের পূর্ববর্তী জাতির ভুল পদাংক অনুসরণ করেই নিজেরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ব।"[১]

উপরোক্ত বাস্তবতা খেয়ালে রাখার পর নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বনু ইসরায়েল হচ্ছে আমাদের পবিত্র কুরআন মাজীদে সবচেয়ে আলোচিত জনগোষ্ঠীর নাম। তাদের ইতিহাস ও চিন্তা, উভয়েরই ধারা সম্পর্কে জ্ঞান ও বুঝ অর্জন করা আমাদের জন্য আবশ্যক। মোটামুটি দুটি লক্ষ্য সামনে রেখে বনু ইসরায়েলের ইতিহাস ও **চিন্তাধারা বুঝা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ,**

১.আল্লাহ তায়ালার পরীক্ষা, দয়া, শাস্তি ঠিক কীভাবে কোনো জাতির উপর সামষ্টিকভাবে জারী করা হয়ে থাকে, সেটা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

২. ঠিক কী কী ভাবে চিন্তা ও সিদ্ধান্ত নেয়ার ফলে সেই জাতি আল্লাহ তায়ালার কালামে প্রসংশিত ও নিন্দিত হয়েছে সেটা নিরুপন করতে শেখা।

আজকে আমরা সংক্ষিপ্ত পরিচিতিমূলক পদ্ধতিতে বনু ইসরায়েলের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোর উপস্থাপন নিয়ে কাজ করবো।

প্রাথমিক পরিচিতির দাবী রক্ষার্থে এবং লেখনীর কলেবর বৃদ্ধি থেকে দূরে থাকার নিমিত্তে তথ্যের বিশুদ্ধতা, তথ্যসূত্রের উল্লেখ ইত্যাদি থেকে দূরে থেকেছি। ফলে ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এই লেখনী যথেষ্ট নয় বলে মনে করছি। আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট তাওফীক প্রার্থী

পরিচয়: ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সন্তান ও তাদের বংশধর:

1.Reuben: رؤوبين (রুবেন)
2.Simeon: شمعون (শামউন)
3.Levi: لاوي (লাউই)
4.Judah: يهوذا (ইয়াহুদা)
5.Issachar: يساكر (ইয়াসাখির)
6.Zebulun: زبولون (যাবলুন)
7.Dan: دان (দান)
8.Naphtali: نفتالي (নাফথালি)
9.Gad: جاد (গাদ/জাদ)
10.Asher: آشر (আশের)
11.Benjamin: بنيامين (বেনইয়ামিন) ও
12. Joseph: يوسف (ইউসুফ)

পরবর্তীতে দুটি বিভাজিত নাম পাওয়া যায়, Ephraim: أفرايم (ইভ্রায়েম) এবং Manasseh: مناس (মানাসা)

ধর্মীয় পরিচয় : মূসা আঃ এর শরীয়তের অনুসারী।

ধর্মীয় গ্রন্থ : ইয়াকুব আঃ এর সুন্নাহ, সিনাই উপত্যকায় প্রাপ্ত ১০টি মৌলিক বিধান (covenant), তাওরাত, দাউদ আঃ এর যাবূর, সুলাইমান, উজাইর আঃ এর ফিরিয়ে আনা তাওরাত, ঈসা আল মাসীহ আঃ এর ইঞ্জিল।

অন্যায় ও বিদআত এর নমুনা: ১. ধর্মগুরুদের অন্ধ অনুসরণ, ২. তালমূদ, ৩. বিদআত এর প্রকৃতি, ৪. নাসারাদের সাথে দ্বিমত ও মাসীহকে অস্বীকার।

---

১. *সহীহুল বুখারি- ৩৪৫৬*

সিনাই পাহাড়ে প্রাপ্ত ১০টি বিধান: ১. শিরক করা যাবে না, ২. আল্লাহ তা'আলার কোন মূর্তি বা প্রতিকৃতি বানানো যাবে না,৩. আল্লাহ তা'আলার নামে অযথা দুনিয়াবী স্বার্থে কসম খাওয়া যাবে না,৪. পিতা মাতার হক্ব আদায় করা আবশ্যক,৫-৯. চুরি করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, অন্যায়ভাবে হত্যা, ব্যাভিচার, প্রতিবেশীকে হিংসা করা, ১০. শনিবারের পবিত্রতা রক্ষা করা আবশ্যক।

'নিন্দিত ধর্মগুরু' শ্রেণীর পরিচয় ও তালমূদের ইতিহাস: এটা অত্যন্ত বিস্তৃত একটি অধ্যায় যা স্বতন্ত্র একটি লেখনীর দাবী রাখে। তবে আমরা সংক্ষিপ্ত করে বলছি:

ইতিহাসের ধাপ

***এক.* ইবরাহীম আলাইহিস সালাম:** তিনি ছিলেন ইরাকের উর নামক অঞ্চলে এবং তাওহীদের দাওয়াতী ময়দানের প্রতিকূল বাস্তবতায় নিজ দায়িত্ব শেষ করেন। তাঁর ক্বউম তাঁকে অমান্য করে, এমনকি হত্যাচেষ্টা করে। পিতা আযর তাকে বিতাড়িত করে। ফলে তিনি হিজরত করেন। তিনি ইরাক ত্যাগ করে কানআন তথা ফিলিস্তিনে আসেন তথা কানআনী জনগোষ্ঠীর মাঝে বসবাস শুরু করেন এবং হক্বের দাওয়াহ জারী রাখেন। অতঃপর ইবরাহীম আঃ এর দুই সন্তানের এক সন্তান ইসমাইল এর ইতিহাস গড়ে ওঠে মক্কাতুল মুকাররমায়, যে ইতিহাসের বিস্তর আমাদের সীরাহর কিতাবগুলোতে সুস্পষ্টভাবে মওজুদ। অপর সন্তান ইসহাক্ব আঃ কানআনের ভূমিতেই ছিলেন।

***দুই.* ইয়াকুব আলাইহিস সালাম:** ইসহাক্ব আঃ এর সন্তানের নাম হচ্ছে ইয়াকুব তথা ইসরায়েল। তিনি বসবাস করতেন মিশর থেকে পূর্ব দিকে কানআন অঞ্চলে। তিনিই বনু ইসরায়েল এর পিতা এবং ইয়াহুদীরা নিজেদের পরিচয়কে তার বংশধর দিকে সম্বোধিত করে। ইয়াকুব আঃ এর ১২ সন্তান থেকে বনু ইসরায়েল এর ১২টি গোত্র বিকাশ লাভ করে। উল্লেখ্য যে, ইয়াকুব আঃ এর সন্তান ইউসুফ আঃ হারিয়ে যাওয়া থেকে মিশরের শাসনের কেন্দ্রে পৌঁছা ও সেটার সূত্র ধরে ইসরায়েল পরিবার কানআন অঞ্চল থেকে হিজরত করে মিশরে চলে আসার বিস্তৃত ইতিহাস আমাদের পবিত্র কুরআনের সূরা ইউসুফ এবং তদসম্পৃক্ত তাফসীরসমূহে সবিস্তার আলোচিত রয়েছে।

***তিন.* মিশর : ইউসুফ - মূসা আলাইহিমাস সালাম** (প্রায় ২১৫ বছর), Hyksos vs Copt. (হাইকসস ও কিবতিদের লড়াই): মিশরের রাজনীতিতে ইউসুফ আঃ যে রাজশক্তির মন্ত্রণালয়ে কোষাগারের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন, সে রাজশক্তিকে ইতিহাসে অনেকে Hyksos হিসেবে চিনে থাকে। তারা আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ষোল শতক থেকে মিশরের শাসনক্ষমতার অধিকারী ছিলো এবং ফেরাউন শক্তির নিকট পরাজিত হয়ে ক্ষমতা হারায় আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব পনেরো শতকে।

Hyksos দের অধীনে বনু ইসরায়েল নিরাপত্তার সাথে বসবাস করেছে প্রায় ২১৫ বছর। কিন্তু ক্ষমতার পালাবদল - তথা কিবতীদের মিশর দখলের মধ্য দিয়ে বনু ইসরায়েলের উপর জুলুম ও বালা-মুসিবতের অধ্যায় নেমে আসে, বিজয়ী কিবতী শক্তির হাতে বনু ইসরায়েল দাসে পরিণত হয়।

***চার.* মূসা আলাইহিস সালাম:** এই কঠিন সময়েই জন্মগ্রহণ করেন মূসা আঃ ও তাঁর ভাই হারুন আঃ। মূসা আঃ এর জন্মগ্রহণ, কিবতীদের রাজপ্রাসাদে বেড়ে ওঠা, ভুলবসত অপরাধী স্বগোত্রীয় এক ব্যক্তির প্ররোচনায় কিবতী ব্যক্তিকে আঘাতের ফলে মৃত্যু, প্রাণরক্ষার্থে পূর্ব দিকের মাদইয়ান অঞ্চলে চলে যাওয়া এবং সেখানেই এক নেককার বুজুর্গের কন্যার সাথে বিবাহবন্ধন এবং মিশরে ফেরার পথে সিনাই উপত্যকায় নবুয়তের

গুরুদায়িত্ব লাভ, কঠিন সময়ে কউমের নেতৃত্ব , স্বজাতী ও শত্রুদের মাঝে তাওহীদ ও হক্বের দাওয়াহ আঞ্জাম দেয়া থেকে সমুদ্র বিভাজিত হয়ে হিজরত ও কিবতীদের সলিল সমাধির ইতিহাস আমাদের পবিত্র কুরআন ও তাফসীরের কিতাবগুলোতে বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার রহমতে অবশেষে বনু ইসরায়েল মূসা আঃ এর নেতৃত্বে যখন মিশর থেকে সাইনা অঞ্চলে হিজরত করতে সক্ষম হন, তখন শুরু হয় ইতিহাসের নতুন অধ্যায়। বনু ইসরায়েলের চিন্তার গঠনে ইতিহাসের এই ধাপটা সবচেয়ে বেশী প্রভাব সৃষ্টি করেছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। মূসা আঃ কে কিতাব দেয়ার পরবর্তীতে সাইনা অঞ্চলে বনু ইসরাইল থেকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ আনুগত্যের ওয়াদা করিয়ে নেন, কিন্তু পাশাপাশি তাদের উপর সাইনা এর পাশে ফিলিস্তিনে বসবাসরত মুশরিক জাতি আমালেকদের বিরুদ্ধে জিহাদের বিধান দেয়া হয় এবং জেরুসালেম আল কুদস বিজয়ের ওয়াদা করা হয়। সেজন্য জেরুসালেম ও আশেপাশের অঞ্চলকে ইয়াহুদীদের মধ্যকার জায়নবাদীরা Promised Land বলার মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রবঞ্চিত করে থাকে। দুই ব্যক্তি ইউশা বিন নুন এবং কালিব ইউক্বিনা ব্যতিত বনু ইসরায়েল এর বাকীরা মূসা আঃ এর আনুগত্য না করে জিহাদ থেকে বিরত থাকে, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ৪০ বছর মরুভূমিতে যাযাবরের মত জীবনযাপনের শাস্তি দেন। ততোদিনে মূসা আঃ ও হারুন আঃ এর মৃত্যু হয়।

***পাঁচ.* ইউশা বিন নূন (Joshua) এর দায়িত্ব গ্রহণঃ** মূসা আঃ এর পর আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে ইউশা বিন নূন দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

1st exodus (প্রথম প্রস্থান/নির্বাসন)ঃ 1st temple and Palestine, Conquest of Jericho (আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ১৪০০শ)

ইউশা বিন নূন এর আল-কুদসে (জেরুসালেম) বনু ইসরাঈল প্রবেশ করে। দেয়াল, দূর্গ ও নিরাপত্তাবেষ্টিত শহর ছিলো আল কুদস। এক সপ্তাহব্যাপী অবরোধ যুদ্ধের পর যখন শুক্রবারের সূর্য অস্তমিত হবার উপক্রম হয় তখন ইউশা বিন নুন এর দোয়ায় সূর্য বেশ কিছুক্ষণের জন্য থামিয়ে দেয়া হয়, যাতে করে শহর বিজয় করা সম্ভব হয়। উল্লেখ্য যে,বনু ইসরায়েলের জন্য শনিবার যুদ্ধ করা শরীয়তে বৈধ ছিলো না। বনু ইসরাঈল আল কুদস বিজয়ের পরে সেখানে বারোটি গোত্র মিলে **১২** টি প্রশাসনিক অঞ্চল হিসেবে এক নেতার অধীনে সম্মিলিত রাষ্ট্র গঠন করে।

***ছয়.* বিপর্যয় :** ইউশা বিন নূন আ. এর মৃত্যুর পর বনু ইসরায়েলের গুনাহ ও অবাধ্যতা বেড়ে যায় এবং তাদের উপর আমালেকাদের দিক থেকে আক্রমণ আসে। তারা বিপর্যস্ত হয়, ঘর-বাড়ি সন্তান হারিয়ে আল কুদস থেকে বিতাড়িত হয়, এমনকি তাবূত তথা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির আলামত বাক্সটি হারিয়ে ফেলে। কোনো কোনো ইতিহাসের বর্ণনায় রয়েছে যে, আমালেকা সম্প্রদায় তাদের তাওরাত-কিতাবাদী কেড়ে নেয়। এভাবে বিপর্যয়ের চূড়ান্ত মাত্রার কাছাকাছি পৌঁছাতে তাদের ৪০০ বছরের মতো লেগে যায়।

***সাত.* পুনরুত্থান (আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ১০০০শ)ঃ** স্যামুয়েল বিন বা'লী। বনি ইসরায়েল তাদের নবী স্যামুয়েল এর নিকট আরজ করেন যেন আল্লাহ তায়ালার ফায়সালায় তাদের জন্য জিহাদ ফরজ করা হয় এবং একজন বাদশাহ নিয়োগ দেয়া হয়; যার পতাকাতলে জিহাদ করে নিজেদের হারানো অধিকার পুনরুদ্ধার করা হবে। অতঃপর তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার আদেশে তালুতকে বাদশাহ নিসেবে মনোনীত করা হয়। তিনি জিহাদে নামার আগে বনু ইসরায়েলের আনুগত্য ও সততার পরীক্ষা নেন এবং তাদেরকে জর্ডান ও ফিলিস্তিনের মধ্যকার নদী থেকে পানি পান করতে নিষেধ করেন। ৩১৩ জন বাদে বাকীরা এই আনুগত্যের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়।

আট. দাউদ আঃ: তালুতের নেতৃত্বে আমালেকা রাজা জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় বনু ইসরায়েলের মধ্য থেকে আমালেকা সরদার জালুতের মুখোমুখি হন তরুণ দাউদ আঃ, তিনি তখন রাখাল হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং বয়সে ছিলেন টগবগে যুবক।

পরবর্তীতে তিনি নবুওয়তের দায়িত্ব লাভ করেন এবং বনু ইসরায়েলের বাদশাহ মনোনিত হন। রাজত্ব, জিহাদ, ন্যায়বিচার, ইবাদত, প্রজ্ঞা ইত্যাদি সকল দিকের গুণে আল্লাহ তায়ালা তাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্য লোহাকে নমনীয় করে দেন এবং তা দিয়ে তিনি উন্নত মানের বর্ম ও যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করেন। তাঁকে যাবূর নামক আসমানী কিতাব প্রদান করা হয়।

নয়. সুলাইমান আঃ: দাউদ আঃ এর সুযোগ্য পুত্র সুলাইমান আঃ কেও আল্লাহ তায়ালা নবুওয়তের দায়িত্ব দেন এবং পরবরতীতে বাদশাহ মনোনীত করেন। মু'জিযা স্বরুপ তাকে সকল প্রাণীর ভাষা বুঝার ক্ষমতা দেয়া হয় এবং জ্বীন জাতিকে তার আনুগত্যে বাধ্য করা হয়। বাতাসকে তার অনুগত করে দেয়া হয়। বনু ইসরাঈল সুলাইমান আঃ এর শাসনকালেই তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব ও অবকাঠামোর উন্নয়নের মুখ দেখে। সুলাইমান আঃ আল কুদসে বড় মসজিদ নির্মাণ করেন, যেখানে তাবূত সংরক্ষিত করা হয়। যেটাকে পশ্চিমের মানুষজন Temple of Solomon বলে থাকে। সেটাই ছিল ততকালীন ক্বিবলা। ইয়াহুদীরা অত্যন্ত অপবাদ রটনায় অভ্যস্ত জাতি হিসেবে এই নবীর বিরুদ্ধেও মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। তার নামে মুশরিক নারীকে বিবাহ, মূর্তিপূজা, মূর্তি তৈরী, যাদু চর্চা ইত্যাদি কুফরী কাজের মিথ্যা অপবাদ দেয়। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে দাউদ আঃ এবং সুলাইমান আঃ এর প্রশংসা করেছন।

দশ. বিভাজন (আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৯০০ সাল): সুলাইমান আঃ এর মৃত্যুর পর বনু ইসরায়েলের মধ্যে আবার অন্তঃদ্বন্দের জের ধরে ১০০ বছরের মধ্যেই তাদের রাষ্ট্র ২ভাগে বিভাজিত হয়ে যায়। উত্তর দিকের অঞ্চলের নাম ছিল ইসরায়েল, ১০টি গোত্র মূল নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসরায়েল রাজ্য গঠন করে। দক্ষিণ দিকের রাষ্ট্রের নাম ছিল জুদায়া, যেখানে বাকী দুই গোত্র বিনয়ামিন ও ইয়াহুদা মূল রাষ্ট্রের অনুগত থাকে।

উত্তর দিকের ইসরায়েল রাজ্য - ইলইয়াস আঃ - ইয়াসা' আ.: উত্তর দিকের ইসরায়েল রাজ্যে শিরক তথা বা'ল মূর্তির পূজা দেখা দেয় এবং তাদের মধ্যকার নবী ইলইয়াস আঃ তাদেরকে এই অন্যায় থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন এবং আল্লাহ তায়ালার সাথে সাইনা অঞ্চলে কৃত ওয়াদা রক্ষার কথা স্বরণ করিয়ে দিতে থাকেন। তার মৃত্যুর পর এই দায়িত্ব নবী ইয়াসা' আঃ পালন করে যান।

উত্তর দিকের ইসরায়েল রাজ্য - এসিরীয়দের আক্রমণ (আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৭০০শ): পূর্ব দিক থেকে ধেঁয়ে আসা আধিপত্যবাদী ও বর্ধনশীল এসিরীয় সাম্রাজ্যের ২বারের বেশী আক্রমণের পর অবশেষে আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৭২০ সালে ইসরায়েল রাজ্য পরাজিত ও বিলুপ্ত হয়ে এসিরীয় সাম্রাজ্যের করতলগত হয়।

10 Lost Tribes of Israel (ইসরাঈলের দশটি উপগোত্রের বিলুপ্তি): এই আক্রমণের ফলে সামারিয়া'র ১০টি গোত্রের ইতিহাস ও পরিচিতি বিলুপ্তির শিকার হয়।

দক্ষিণ দিকের জুদায়া রাজ্য : ইসরায়েল রাজ্যের বিপরীতে জুদায়া রাজ্যের গোত্রগুলোর মাঝে শিরকের অভিযোগ পাওয়া যায় না। তাদের রাজধানী ছিলো আল-কুদস। যেখানে সুলাইমান আঃ এর তৈরী বিশালাকৃতির মসজিদ ছিলো এবং তাবূত বাক্সটি সম্মানের সাথে সংরক্ষিত ছিলো।

খৃষ্টানদের তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য নবীগণের সুখ্যাতি ছিলোঃ Isaiah: إشعيا (Isha'ya), Daniel: دانيال (Daniyal), Ezekiel: حزقيال (Hazqiyal), Jeremiah: إرميا (Irmiya)| তারা সত্যিই নবী ছিলেন নাকি ইবাদতগুজার সালেহীন বান্দা ছিলেন, সে বিষিয়ে আমরা মুসলিমরা শরীয়তের সুস্পষ্ট দলীলের অভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনা।

2nd exodus (দ্বিতীয় প্রস্থান/নির্বাসন): জুদায়া ও ইসরায়েল উভয় রাজ্য-ব্যাবিলনীয়দের আক্রমণ (আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৫৮৬ সাল): এসিরীয়দেরকে উৎখাত করে গড়ে ওঠে আরেকটি সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তি, যাদেরকে ইতিহাসের বিচারে নব্য-ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য বলা যায়। সরদার ২য় নেবুচাদনাজ্জার এর নেতৃত্বে পুরো এসিরীয় সাম্রাজ্যের দখল নিয়ে তারা বনি ইসরায়েলের প্রাণকেন্দ্র জুদায়া রাজ্য পর্যন্ত কুক্ষিগত করে নেয় এবং তারা সুলাইমান আঃ এর তৈরী করা মসজিদ ধ্বংস করে দেয়, তাবূত ধ্বংস করে দেয়। অনেক সংখ্যক ইয়াহুদীর পলায়ন, বিতাড়ন ও হতাহতের ঘটনা ঘটে। অনেক ইয়াহুদীদেরকে দাস বানিয়ে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়।

***এগারো.* ফার্সিদের অধিগ্রহণ (আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৫৩৯ সাল):** ইতিহাসে Syrus The Great (মহান সাইরাস) হিসেবে পরিচিত একজন কল্যাণকামী বাদশাহ এর উত্থান ঘটে ফারসী জাতির মধ্য থেকে, যিনি ব্যাবিলন আক্রমণ করে বনু ইসরায়েলকে মুক্ত করে দেন।

2nd temple

সাইরাস বনু ইসরায়েলকে ব্যাবিলন থেকে জুদায়া অঞ্চলে ফিরে গিয়ে সুলাইমান আঃ এর তৈরী মসজিদ পুনঃনির্মাণ করার অনুমতি দেন। ইয়াহুদীরা এর পর থেকে ফারসী সাম্রাজ্যের অধীনে নিরাপদে বসবাস করতে থাকে।

উজাইর আঃ (আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৫৩৭ সাল): এই পুনরুত্থান ও নিরাপত্তার কালেই উজাইর আঃ বনু ইসরায়েলের মাঝে বেঁচে ছিলেন। তার মাধ্যমেই হারিয়ে যাওয়া তাওরাতের পুনরুজ্জীবন ঘটে। সম্ভবত তিনিই সুলাইমান আঃ এর তৈরী করা মসজিদের ধ্বংসাবশেষের যায়গায় ২য় মসজিদ নির্মাণ করেন। ইয়াহুদীরা তাকে "আল্লাহ তায়ালার পুত্র" নামকরণ করে এবং পবিত্র কুরআনে এমন কুফরী কথার নিন্দা করা হয়েছে।

গ্রীক আক্রমণঃ (আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৩৩২ সাল): ফারসীদের অধীনস্থ স্বায়ত্বশাসিত রাজ্য থাকা অবস্থায় গ্রীক সম্রাট ইস্কান্দার বা আলেকজান্ডার বনু ইসরায়েলের ভূমি আক্রমণ করে দখল করে নেয়। আলেকজান্ডার এর মৃত্যুর পর তার সেনাপ্রধানরা রাজ্য ভাগাভাগি করে নেয় যেগুলোকে **'হেলেনিক সাম্রাজ্যপুঞ্জ'** বলা যায়, সেগুলোর মধ্য থেকেই পরবর্তীতে একটি বিচ্ছিন্ন অংশ তৈরী হয়েছিলো যেটাকে বলা হতো **'সেলুসি সাম্রাজ্য'**। তারা ছিলো গ্রীকদের শিরকী সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। সেই সেলুসি সাম্রাজ্যের অধীনেই পরাধীন করদরাজ্য হিসেবে রয়ে যায় বনু ইসরায়েলের জুদায়া। বনু ইসরায়েলের উপর সেলুসি সাম্রাজ্য দমননীতির পথে হাটার জন্য ইতিহাসে কুখ্যাত। বনু ইসরায়েল বেশ কিছু বিদ্রোহও করে এই জালিম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। যেমন আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ১৬৭ সালের **'মাখাবি বিদ্রোহ'** থেকে সফল হয়ে বনু ইসরায়েলের স্বল্পকালীন স্বাধীন **'হাসমোনীয়'** রাজ্য গঠিত হয়। এই ইতিহাসকে কেন্দ্র করে ইয়াহূদীরা **'হানাকা'** নামক ঈদ পালন করে থাকে।

3rd exodus (তৃতীয় প্রস্থান/নির্বাসন)

বারো. রোমান আক্রমণ (আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৬৩ সাল)। পশ্চিম দিক থেকে ধেঁয়ে আসা বিশালাকায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ছিলো রোমান সাম্রাজ্য, যা কমান্ডার পম্পেই-র নেতৃত্বে একসময় মিশর এবং শাম অঞ্চল দখল করে

নেয়। ফলশ্রুতিতে জুদায়া বা বনু ইসরায়েলের ফিলিস্তিন তথা হাসমোনী রাজ্যটি রোমান সাম্রাজ্যের একটি করদরাজ্যে রুপ নেয়। মাকাদোনিয়া কেন্দ্রিক রোমান জাতি ছিলো মুশরিক জাতি।

তেরো. ঈসা আলাইহিস সালাম: মুশরিক জাতির অধীনে পরাধীন জনগোষ্ঠীর কঠিন ঐতিহাসিক বাস্তবতায় বনু ইসরায়েলের মাঝে নবী ও রাসূল ঈসা ইবনু মারইয়াম আ: আল মাসীহ এর আগমন ঘটে। নবী জাকারিয়া আ: এর তত্ত্বাবধানে বড় হন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহীয়সী মারইয়াম বিনতু ইমরান, কারণ তাকে জন্মের আগেই আল্লাহর ঘর মসজিদের জন্য উৎসরগ করেন তাঁরই মাতা। জাকারিয়া আঃ ততকালীন বাইতুল মাক্বদিসের তত্বাবধানে নিয়োজিত ব্যক্তি ছিলেন। নবী ইয়াহইয়া আ: ছিলেন তারই সন্তান। ঈসা আ: এর আগমনের সময় জুদায়া'র মতো রোমান সাম্রাজ্যের অধীনস্ত করদরাজ্যের ক্ষমতায় যারা ছিলো, তারা ইয়াকুব আ: এর বংশধর হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালার সাথে কৃত ওয়াদাসমূহের আনুগত্যের ব্যাপারে তারা গাফিল ছিলো। রোমান প্রভূদের খুশি করতে তারা আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতায় লিপ্ত হতো। উদাহরণ স্বরুপ প্রথম হেরোদ নামক ব্যাক্তির কথা বলা যায়। ঈসা আ: এর জন্মের পর তিনি দুগ্ধপোষ্য শিশু অবস্থায় দোলনায় কথা বলা ও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কৃত নবুয়তের ওয়াদার ঘটনা চারদিকে ছড়িয়ে যায় এবং ইয়াহুদীদের প্রতি কৃত আসমানী ওয়াদার সেই কাঙ্খিত "মাসীহ" যে তিনিই, এমন কথা যখন চারিদিকে প্রচার হয়-তখন "প্রথম হেরোদ" নামে পরিচিত এই ব্যাক্তি নিজ ক্ষমতা হারানোর আশংকায় **"বাইতলাহাম"**-র সকল শিশুপুত্রকে হত্যার নির্দেশ দেয়। খৃষ্টানদের বর্ণনামতে, জাকারিয়া আ: কে এমন সময়েই হত্যা করা হয় যখন আল্লাহ তায়ালা এই বিপদ থেকে মারইয়াম আ: ও ঈসা আ: কে রক্ষা করেন এবং উঁচু, নিরাপদ, বসবাসযোগ্য ভূমিতে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেন। এই জালিম শাসকের সন্তান 'হেরোদ আন্তিপাস' উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতায় এসে নিজের হারাম কাজের ধর্মীয় বৈধতা আদায়ের জন্য ইয়াহইয়া আ: কে চাপ প্রয়োগ করে। হারাম কাজকে বৈধতা না দিয়ে হক্ব কথা সুস্পষ্ট বলার জন্য ইয়াহইয়া আঃ কে হত্যা করা হয়। অতঃপর বনু ইসরায়েলের দ্বীন ও দাওয়াহ এর পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব রাসূল ঈসা ইবনু মারইয়াম আ: এর উপর কেন্দ্রীভূত হয়। ইয়াহুদীরা মনে করে থাকে যে, তারা রোমানদেরকে প্ররোচিত করে ঈসা আ: কে ক্রুশবিদ্ধ করার মাধ্যমে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের এই দাবীকে নাকচ করে দিয়ে কুরআন মাজীদে আয়াত নাজিল করেছেন। এখান থেকেই বনু ইসরায়েল ইয়াহুদী ও নাসারা বিভাজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নাসারাগণ বিশ্বাস করতেন যে, ঈসা আঃ হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালার ওয়াদাকৃত আল মাসীহ। আর ইয়াহুদীরা সেটা অবিশ্বাস করতো।

রোমানদের অধীনে বনু ইসরায়েল: ছোটখাটো পারস্পরিক বিদ্রোহ ও দমনেপীড়ণের পরও ইয়াহুদীরা রোমানদের অনুগতই ছিলো। তাদের দৃষ্টিতে ঈসা আ: কে কথিত ও কল্পিত ক্রুশবিদ্ধকরণের পর এই সম্পর্ক জটিলতায় রুপ নেয়া শুরু করে।

১ম রোমান-ইয়াহুদী যুদ্ধ (৬৬-৭৩ খৃষ্টাব্দ): একসময় ৬৬ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ইয়াহুদীদের সাথে রোমান সাম্রাজ্যের ১ম উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের ব্যাপ্তি ছিলো প্রায় ৭ বছর। ৭০ খৃষ্টাব্দের দিকে রোমান সম্রাট তিতুস জেরুসালেম দখল করতে সক্ষম হয়। শহরের দেয়াল, ভেতর শহর, ২য় সুলাইমানী হাইকাল/মসজিদ ধ্বংস করে দেয়া হয়। বিশাল সংখ্যক ইয়াহুদীদেরকে গণহত্যা করা হয় এবং প্রায় লাখের মতো ইয়াহুদীকে দাস বানিয়ে রোমে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেকেই শহর ত্যাগ করে বিভিন্ন অঞ্চলে হিজরত করে চলে যেতে বাধ্য হয়। ধ্বংসাবশেষের উপর ইলিয়া/ইলিয়ট শহর প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বার কোখবা বিদ্রোহ (১৩২ খৃষ্টাব্দ): এই বিদ্রোহও বনী ইসরাইলের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে। তাদেরকে

পুরোপুরি জেরুসালেম আল কুদস থেকে বিতাড়িত করা হয় এবং ধর্মীয় বিশেষ বিষেশ ইবাদতের মৌসুম ব্যতিত অন্য দিনগুলোতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। সম্রাট হাদ্রিয়ান ইজরায়েল ও জুদায়া ইত্যাদি নাম পরিবর্তন করে অঞ্চলটির ভিন্ন নামকরণ করে দেয়।

মুসলিম বিজয় (৬৩৮ খৃষ্টাব্দ): মুসলিমরা ইয়াহুদীদের উপর থেকে জেরুসালেমে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। কালক্রমে **১১**শ শতাব্দীর দিকে এসে দেখা যায় আল কুদস এলাকায় ইয়াহুদীদের সংখ্যা নগণ্য হয়ে গেছে।
জায়নবাদ: জায়নবাদী আন্দোলনের চিন্তক বলা যায় Theodor Herzl (থিওডর হারজেল) কে, সে প্রস্তাবনা দেয় যে "ইউরোপীয় প্রতিবেশীদের বৈরীতার হাত থেকে বাঁচতে ইয়াহুদিদেরকে ইউরোপ ত্যাগ করা উচিত এবং আলাদা ইয়াহুদীপ্রধান রাষ্ট্র বানানো উচিত।" ইয়াহুদীরা যেহেতু সংখ্যালঘু হিসেবে সব সমাজেই জুলুমের শিকার, সেহেতু অবশ্যই তাদের যেকোনো মূল্যে এমন একটি রাষ্ট্র প্রয়োজন, যেখানে তারা সংখ্যালঘু থাকবে না। Der Judenstaat (The Jewish State) বইয়ের মাধ্যমে সে তার যাবতীয় চিন্তা ও প্রস্তাবনা পেশ করে। এটা খেয়াল রাখা উচিত যে, ইতিহাসের অংশ হিসেবে শুধু আমরা তাদের কাজগুলো নিয়ে জানতে পারি। কিন্তু তাদের কাজগুলো কীভাবে এতো অনৈতিক হলো, এবং কীভাবে এতো বড় বড় অন্যায়ের দিকে তারা এগিয়ে গেল, সেটা বুঝার জন্য আমাদেরকে শুধু ইতিহাস জানার মাঝেই ক্ষান্ত দিলে হবে না। সেগুলো বুঝতে গেলে ইয়াহুদী জনগোষ্ঠির চিন্তার জগতে আত্মপরিচয়, ধর্মীয় জগত, মূল্যবোধ ইত্যাদি কীভাবে গঠিত ও বিকশিত হয়- সে বিষয়ে আলাদা অধ্যয়ন ও গবেষণা প্রয়োজন।

উসমানিয় সাম্রাজ্য ও হাশেমী শেখ পরিবারের অধীনে ফিলিস্তিন ভূমি : ১৭৯৯ সালে ফরাসি শাসক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইয়াহুদী রাষ্ট্র তৈরির প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। ১৮৪০ সালে British Revival of the Failed attempt বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে ইয়াহুদী সংখ্যাগরিষ্ট অঞ্চল তৈরীর প্রচেষ্টা যখন শুরু হয়, তখন স্থানীয় ফিলিস্তিনী ইয়াহুদী জনসংখ্যা ছিল চার শতাংশ। ১৮৪০ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচীব Lord Palmerston উসমানিয়া সাম্রাজ্যে নিয়োজিত বৃটিশ এম্বাসেডরকে চিঠি দিয়ে সুলতানকে ইয়াহুদী সেটেলমেন্ট এর ব্যাপারে রাজি করানোর জন্য নির্দেশ দেয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী Palmerston-র আহ্বানে সাড়া দেন Rothschild পরিবারের ছয় ভাইয়ের মধ্যকার একজন। তারা পরিকল্পিতভাবে জোরেশোরে ভূমি কিনে সেটেলমেন্ট এর পরিবেশ তৈরির কাজ শুরু করে। প্রাথমিক দিকে প্রায় ৩০ টি কলোনী কিনে নেয় তারা। এদিকে **১৯৮১** সালে রুশ সিজার (সম্রাট) গুপ্তহত্যার শিকার হন। দোষ গিয়ে পড়ে ইয়াহুদীদের উপর, ফলশ্রুতিতে তারা গণহত্যা ও বিতাড়নের মুখে পড়ে পোল্যান্ড, বৃটেন ইত্যাদি এলাকায় এসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করতে থাকে।

Laurence Oliphant (1829-1888) : এমতাবস্থায় বৃটিশ আইনসভার সদস্য Laurençe Oliphant এর একটি বই প্রকাশ পায়, সেখানে সে ইউরোপ থেকে পলায়নপর ইয়াহুদীদেরকে জর্ডান নদীর পূর্ব পার্শ্বস্ত Gilead এলাকায় হিজরত করে আসতে উৎসাহিত করে। জর্ডানের আরব গোত্রপতিরা এটা খেয়াল করে এবং কোয়ালিশন গঠন করে পদক্ষেপ নেয়। তারা যথাযথ তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে সুলতানের নিকট চিঠি প্রেরণ করে, এবং সমস্যাটার সমাধান করিয়ে নেয়। উসমানীয় সুলতান এই চক্রান্তমূলক সেটেলমেন্ট পরিকল্পনাকে নাকচ করেন। বৃটিশ সরকারের প্রতি তার প্রস্তাবনাটা ছিল কিছুটা এমন, এই মুহূর্তে সরাসরি আরবদের মাঝে একটি ইয়াহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার করে দেয়া সম্ভব নয়, যেহেতু আরবদের প্রতিরোধে তা সমূলে বিফল হবে।

১৮৯৭খৃ. জায়নবাদী কংগ্রেসঃ (সুইজারল্যান্ড) : ১৮৮৫ সালে জায়নবাদী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা Theodore Hertzle ছিলো পেশায় সাংবাদিক, এখানেই তিনি আলাদা ইয়াহুদীপ্রধান রাষ্ট্রের প্রস্তাব উত্থাপন করে কিছু দেশের নাম প্রস্তাব করেন। যেমনঃ উগান্ডা, আর্জেন্টিনা, ফিলিস্তিন। তারা ফিলিস্তিনের ব্যাপারে ইয়াহুদী বুদ্ধিজীবীদের মতামত পক্ষে আনতে সক্ষম হয়। তারা আরবদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে মিডিয়া ও পশ্চিমের বুদ্ধিজীবি মহলের সামনে ফিলিস্তিনকে একটি বিরাণভূমি হিসেবে চিত্রিত করতে থাকে (A Land without Nation for the Nation without Land)।

১৮৯৮খৃঃ ২য় জায়নবাদী কংগ্রেস : ফিলিস্তিনে ইয়াহুদী সেটেলমেন্ট এর ব্যাপারে উসমানিয়া সুলতানকে রাজী করানোর চেষ্টা ব্যার্থ হয়, এদিকে রথসচাইল্ড পরিবারের অর্থায়নে জমি কেনার চক্রান্ত চলমান থাকে।

1905 Aliens Act : যুক্তরাজ্য তাদের দেশে ইয়াহুদী সহ অন্যান্য অভিবাসীদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার আইন পাশ করে। এবং ইয়াহুদীদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য জায়গা হিসেবে লক্ষবস্তু বানানো হয় ফিলিস্তিনের ভূমিকে।

১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ : স্যামুয়েল হার্বার্ট ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্রিটিশ লিবারেল রাজনীতিবিদ, যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ নীতিতে, বিশেষ করে প্যালেস্টাইন ও জায়নবাদ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯১৫ সালের জানুয়ারিতে তিনি তার মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের কাছে 'দ্য ফিউচার অফ প্যালেস্টাইন' (The Future of Palestine) শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মারকলিপি বিতরণ করেন। এই স্মারকলিপিটিকে ১৯১৭ সালের বেলফোর ঘোষণার অগ্রদূত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

স্যামুয়েল, যিনি ইহুদি ও একজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জায়নবাদী ছিলেন, এই স্মারকলিপিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন:

১. সুয়েজ খাল রক্ষার জন্য ব্রিটেনের প্যালেস্টাইন দখল,

২. প্যালেস্টাইনকে ইহুদি জনগণের জন্য একটি বাসভূমি করা। তিনি এমন একটি ভবিষ্যতের কল্পনা করেছিলেন যেখানে ইহুদি জনগণ প্যালেস্টাইনে রেলপথ, বন্দর, একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের মতো অবকাঠামো তৈরি করবে।

প্রাথমিকভাবে, তার প্রস্তাবগুলি বেশ উচ্চাভিলাষী ছিল, এমনকি প্যালেস্টাইনকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাথে সংযুক্ত করার কথাও তিনি বলেছিলেন। তবে, পরে তিনি কিছু বিষয় শিথিল করেন, তাৎক্ষণিক ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি স্পষ্টভাবে নাকচ করে দেন এবং অ-ইহুদিদের প্রতি সমান আচরণের ওপর জোর দেন। স্যামুয়েলের প্রচেষ্টা জায়নবাদ এবং প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যতের প্রতি ব্রিটিশ নীতি গঠনে সহায়ক ছিল, যা বেলফোর ঘোষণার ভিত্তি স্থাপন করে এবং ১৯২০ সালে তাকে ফিলিস্তিনে প্রথম ব্রিটিশ হাই কমিশনার হিসেবে নিয়োগের পথ প্রশস্ত করে। আরবদেরকে অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি ইয়াহুদীদেরকে সংখ্যালঘু হিসেবে বিশেষ প্রয়োজনীয়তার দোহাই দিয়ে অস্ত্র বহন ও মজুত করার রাষ্ট্রীয় বৈধতার ব্যবস্থা করা হয়। জোর করে আরবীর পাশাপাশি হিব্রুকে প্রশাসনিক ভাষায় অংশীদার বানানো হয়।

বেলফোর ঘোষণা Balfour Declaration(1917) : 1919 British Mandate of Palestine উসমানিয়া খিলাফতের পতনের পর জর্ডান, লেবানন, সিরিয়াকে বৃটেন ও ফ্রান্স মিলে ভাগাভাগি করে নেয়। ১৯২০-১৯৩০ ইয়াহুদী সেটেলমেন্ট ছলে-বলে-কৌশলে প্রায় ৫ লাখ ইয়াহুদী আমদানি করা হয়।

1936 Arab Revolt : বৃটিশদের আগ্রাসী ইয়াহুদী নীতির প্রতিবাদে আরবরা বিক্ষোভ-বিদ্রোহের পথ বেছে নেয়, এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে অভূতপূর্ব ও অস্বাভাবিক বলপ্রয়োগ, হত্যা, মামলা, মৃত্যুদণ্ড দেয়ার মাধ্যমে আন্দোলনকে দমন করা হয়।

সন্ত্রাসবাদী সংগঠনসমূহ ও বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকতা : Irgun Zvai Leumi, Palmach, Lohamei Herut Israel (Lehi), Haganah এইসকল নাম হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট ও বৃটিশ সেনাবাহিনীর দ্বারা প্রশিক্ষিত ইয়াহুদীদের আধাসামরিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। ইয়াহুদীদের চলমান ভূমিদস্যুতা ও সেটার মাধ্যমে দখলকৃত জমিজমা কেন্দ্রিক গড়ে ওঠা সেটেলমেন্ট কলোনীগুলোকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বৈরীতার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে এই দলগুলো কাজ করেছে।

২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় জুড়ে নাৎসিদের উত্থান ও হিটলারের দমননীতি : এদিকে হিটলারের নাৎসি গোষ্ঠী ১ম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর ব্যর্থতার পিছনে ইয়াহুদী ও ইয়াহুদীদের সৃষ্ট, পরিচালিত কমিউনিস্ট আন্দোলনকে দায়ী করে থাকে এবং সেটার উপর ভিত্তি করে সমগ্র জার্মান ইয়াহুদীদের উপর পরিকল্পিত গণহত্যা চালায়।

উপনিবেশ শক্তির প্রস্থান-নাটক : ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর জর্ডান থেকে বৃটিশদের এবং সিরিয়া ও লেবানন থেকে ফ্রান্সের প্রস্থান ঘটে। বাকী রয়ে যায় ফিলিস্তিন। ভূমিপুত্র আরবদের থেকে বিশাল অংশ বিচ্ছিন্ন করে বহিরাগত সেটেলার ইয়াহুদীদের হাতে তুলে দেয়ার মাধ্যমে বিভাজন করে ফিলিস্তিনের ভূমিকে বিভাজন করে দেয়া হয়। যাবার আগে সকল ব্রিটিশ অস্ত্রাগারের অস্ত্র ইয়াহুদীদেরকে দিয়ে দেয়া হয়।

1947 UN Partition : বৃটিশদের পরিকল্পিতভাবে তৈরী বিবাদের অবস্থায় রেখে যাওয়া ভূমির ৫৬% ইয়াহুদিদের এবং ৪৩% ভূমি আরবদের মাঝে ভাগাভাগি করে দেয়ার প্রস্তাব করে থাকে জাতিসংঘ।

1948 Foundation of Israel State : নাক্বা ৯ শতাংশ ভূমি থেকে ৭৮ শতাংশ ভূমি দখল (১৯৪৭-১৯৪৮)। জায়নবাদী সন্ত্রাসী সেটেলার সশস্ত্র সংগঠনগুলো দশকের মতো, বা তার চেয়েও বেশী সময় নিয়ে এই অতর্কিত আক্রমণের নীল নকশা প্রস্তুত করে। জাতিসংঘের তৈরী বিভাজন প্রস্তাব প্রকাশের পর থেকে ইয়াহুদী সন্ত্রাসীদের পক্ষ থেকে সেই পরিকল্পনার বিষ্ফোরণ হয় নাক্বা নামক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে। প্রায় ১৬ হাজার ফিলিস্তিনি আরবের প্রাণনাশ ও সাড়ে ৭ লাখের বেশী ফিলিস্তিনিদের বিতাড়নের মধ্য দিয়ে এই বিপর্যয়কে স্বরণ করা যায়।

এর পর প্রায় ৩টি আরব ইজরায়েল যুদ্ধ, ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ, Oslo Accord, ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সামরিক ফ্রন্ট, পরিকল্পিত ভূমিদস্যুতায় হারিয়ে যাওয়া পশ্চিম তীর, পুরো দুনিয়ার বিরুদ্ধে একাই লড়তে থাকা গাজজাহ ইত্যাদি ইতিহাসের ধারা আজও চলমান।

হে রব্বে কারীম, গাজজাকে তুমি রক্ষা করো, আমাদের কাপুরুষতাকে ক্ষমা করো, আরেকজন উমার ও সালাহুদ্দিনকে আমাদের মাঝে প্রেরণ করো-আমীন।

ফুটনোট:

কানআন জাতীগোষ্ঠী : *সিনাই,ফিলিস্তিন, জর্ডান, সিরিয়া, ইরাক জুড়ে বসবাসকারী একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী। যাদের মাঝে দাওয়াতী কাজের জন্য ইবরাহীম আ: কে ইরাক থেকে প্রেরণ করা হয়।*

Hyksos : *মিশরের বাইরে থেকে আসা একটি শাসক শক্তি, যারা মিশরীয় ফেরাউন কিবতীদেরকে বিতাড়িত করে ক্ষমতা দখল নিতে সক্ষম হয়েছিলো।*

কিবতী Coptic : *মিশরের স্থানীয় ক্বিবতী শাসকগোষ্ঠী।*

সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর রাষ্ট্র দর্শন ও বিশ্লেষণ

আহমাদ বিন আব্দুস সালাম
অধ্যয়নরত, ইংরেজি বিভাগ (৪র্থ বর্ষ), এশিয়ান ইউনিভার্সিটি

সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী : সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী (১৭৮৬-১৮৩১) ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের একজন বিশিষ্ট ইসলামি সংস্কারক, আমীর এবং মুজাহিদ নেতা। তিনি উত্তরপ্রদেশের রায়বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং বালাকোটে শাহাদাত বরণ করেন। মূলত শিখ শাসন এবং ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ প্রভাবের বিরুদ্ধে জিহাদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তিনি পরিচিত। তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল ভারতে একটি অখণ্ড ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, যার কারণে তাঁর অনুসারীরা তাঁকে "আমিরুল মুমিনীন" হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

সৈয়দ আহমাদের প্রাথমিক জীবন কিন্তু প্রথাগত পাণ্ডিত্যপূর্ণ শিক্ষার দ্বারা চিহ্নিত ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর তিনি জীবিকার সন্ধানে লক্ষ্ণৌ "লখ্নঊ" (Lucknow) এবং দিল্লিতে কঠিন সময় পার করেন। তাঁর কর্মজীবনের মোড় ঘুরে যায় যখন তিনি ১৮১০ সালে নবাব আমির খানের সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। এই সামরিক অভিজ্ঞতা তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রচলিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ যোগ্যতার অভাব সত্ত্বেও, সৈয়দ আহমাদের নেতৃত্ব এবং প্রভাব তাঁর ব্যবহারিক সামরিক অভিজ্ঞতা, সরাসরি জনগণের মধ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষমতা এবং তাঁর সংস্কারবাদী ও রাজনৈতিক এজেন্ডার প্রতি গভীর বিশ্বাস থেকে উৎসারিত হয়েছিল। এটি সেই সময়ের ধর্মীয় নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনকে নির্দেশ করে, যেখানে ঔপনিবেশিক এবং আঞ্চলিক অমুসলিম শাসনের অধীনে অবনতিশীল সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক বা আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা থেকে সরে এসে আরও সক্রিয়, রাজনৈতিকভাবে জড়িত ভূমিকায় রূপান্তরিত হয়।

তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল ১৮২১ সালের হজ্ব যাত্রা, যেখানে তিনি হেজাজে দেড় বছর অতিবাহিত করেন। হজ্ব কেবল একটি আধ্যাত্মিক আচার ছিল না, এটি সৈয়দ আহমাদের জন্য একটি রূপান্তরমূলক আদর্শিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা হিসেবে কাজ করে। আরবে কঠোর, বিশুদ্ধতাবাদী তরীকায় মোহাম্মাদী তথা আহলে হাদীস মতাদর্শের সাথে তাঁর পরিচিতি, যা ভারতের সুফিবাদের অনুশীলনের সাথে তীব্রভাবে বিপরীত ছিল।

উনিশ শতকের ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা: উনিশ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে গভীর অস্থিরতা বিরাজ করছিল। এই সময়টি মুঘল সাম্রাজ্যের পতন এবং ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের ক্রমবর্ধমান একত্রীকরণ দ্বারা চিহ্নিত ছিল । ব্রিটিশরা পদ্ধতিগতভাবে অঞ্চল দখল করে নেয়, একটি 'সামরিক আর্থিক' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে যা তাদের বৈশ্বিক যুদ্ধগুলির অর্থায়নের জন্য কৃষি রাজস্ব ব্যবহার করত। এই যুগে কিছু অঞ্চল সরাসরি ব্রিটিশদের দ্বারা সংযুক্ত করা হয়, আবার কিছু অঞ্চল সহায়ক জোটের মাধ্যমে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

এই প্রেক্ষাপটে, পাঞ্জাবের শিখদের মতো আঞ্চলিক শক্তিগুলি ক্ষমতা লাভ করে, এবং তাদের শাসন প্রায়শই

মুসলমানদের প্রতি দমনমূলক ছিল, যা তাদের ধর্মীয় অনুশীলনে বাধা দিত। ব্রিটিশ উপস্থিতি সামাজিক ও জাতিগত বিভেদ, বারবার দুর্ভিক্ষ এবং ব্যাপক কৃষক দুর্ভোগের কারণ হয়েছিল। বিশেষত ভারতীয় মুসলমানরা শিক্ষায় পিছিয়ে পড়েছিল এবং প্রায়শই বিদেশী শাসনের সাথে সহযোগিতা থেকে বিরত ছিল। রাজনৈতিক বিভাজন, বিদেশী আধিপত্য এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক দুর্দশার এই জটিল পরিবেশ সংস্কারবাদী ও প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্য উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করেছিল।

সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর আন্দোলন কেবল একটি একক বাহ্যিক হুমকির প্রতিক্রিয়া ছিল না, বরং এটি একটি জটিল, বহু-স্তরীয় রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ছিল। শিখ সাম্রাজ্যের তাৎক্ষণিক, স্থানীয় অত্যাচার, যা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুশীলনে বাধা দিত, এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার ব্যাপক, ক্রমবর্ধমান পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জ-এই উভয়ই তাঁর জিহাদের জন্য একটি শক্তিশালী প্রেরণা তৈরি করে। এই 'দ্বৈত নিপীড়ন' তাঁর সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য একটি স্পষ্ট, জরুরি লক্ষ্য প্রদান করে প্রাথমিকভাবে শিখরা, এবং পরোক্ষভাবে, ব্রিটিশরা। কেন তাঁর আন্দোলন, পাঞ্জাবে শুরু হলেও, একটি বৃহত্তর, সর্বভারতীয় ইসলামি রাষ্ট্রকে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে ধারণ করেছিল। এটি ইঙ্গিত করে যে অমুসলিম এবং ঔপনিবেশিক উভয় শাসনের অধীনে মুসলমানদের অনুভূত দুর্বলতা এবং ক্ষমতাহীনতা এমন একটি আমূল সংস্কার আন্দোলনের উত্থানের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল।

উপমহাদেশে বিদ্যমান ব্যাপক সামাজিক-অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং মুসলমানদের প্রান্তিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান সম্ভবত ব্রেলভীর আন্দোলনের আবেদনকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। তাঁর রাষ্ট্র দর্শন, যার মধ্যে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং একটি বিশুদ্ধ ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর "রাষ্ট্র দর্শন" কেবল একটি ধর্মতাত্ত্বিক নির্মাণ ছিল না, বরং ব্যাপক ভাবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কারাই ছিল তাঁর দর্শনের মূল।

তাঁর রাষ্ট্র দর্শনের মূল ভিত্তি : ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রভাব ও উদ্দেশ্য: প্রাচীন ভারতে চলে আসা "তরীকায় মোহাম্মাদী" আন্দোলন এর রাষ্ট্র দর্শন নিয়েই মূলত হাজিরহন সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী। নয়া উনিশ শতকের গোড়ার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই আন্দোলন ইন্দো-ইসলামি সমাজে সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কারের জন্য একটি শক্তিশালী প্রচেষ্টা ছিল, যার মধ্যে জোরালো রাজনৈতিক প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। এর মূল ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে বিশুদ্ধ করা, কুরআন ও সুন্নাহর মূল শিক্ষায় ফিরে আসা, কঠোর একেশ্বরবাদ (তাওহীদ) জোর দেওয়া এবং বিদআত (ধর্মীয় নতুন উদ্ভাবন) বা শিরক (মূর্তিপূজা) হিসেবে বিবেচিত অনুশীলনগুলিকে প্রত্যাখ্যান করা। এর মধ্যে সাধু-সন্ন্যাসীদের পূজা, মাজার পরিদর্শন, উপাসনায় মধ্যস্থতাকারীর ব্যবহার, নবীর জন্মদিন উদযাপন এবং বিস্তৃত সমাধি নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রাজনৈতিকভাবে, সৈয়দ আহমাদ রহ. লেখায় দেশে ব্রিটিশদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট সচেতনতা দেখা যায়, যার ফলে তিনি ব্রিটিশ ভারতকে 'দারুল হারব' হিসেবে বিবেচনা করেন। এই পদবি, যা অমুসলিম শাসনের অধীনে থাকা একটি অঞ্চলকে বোঝায় যেখানে মুসলমানরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে পারে না বা যেখানে ইসলামি আইন সর্বোচ্চ নয় ও জিহাদের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। ফলস্বরূপ, ব্রিটিশদের প্রচারিত ওয়াহাবি আন্দোলন যা মূলত তরীকায় মোহাম্মাদী আন্দোলন এর একটি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার প্রতিরোধ করা এবং শরিয়াহ আইন দ্বারা পরিচালিত

একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, যার লক্ষ্য ছিল মুসলিম ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা।

সৈয়দ আহমাদ রহ. তরীকায় মোহাম্মাদী আন্দোলন কে একটি স্পষ্ট, আপোষহীন আদর্শিক কাঠামো প্রদান করে যা নিছক ধর্মীয় বিশুদ্ধিকরণের বাইরে একটি ব্যাপক রাজনৈতিক কর্মসূচিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি কঠোর শরিয়াহর উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রস্তাব করে এবং অমুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য সরাসরি জিহাদের আহ্বান করে। এটি ইঙ্গিত করে যে মোহাম্মাদী তথা আহলে হাদীস আন্দোলন কেবল একটি ধর্মীয় প্রভাব ছিল না, বরং পরক্ষভাবে সামগ্রিক রাজনৈতিক আদর্শিক মতবাদ ছিল যা ব্রেলভীকে গভীর রাজনৈতিক চিন্তায় এবং বিদেশী আধিপত্যের সময়ে একটি সুসংগত এবং আমূল বিকল্প রাষ্ট্রের ধারণা প্রকাশ করতে সক্ষম করে।

ইসলামি রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থা : ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য: সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতে একটি "অখণ্ড ইসলামি রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠা করা। এই পরিকল্পিত রাষ্ট্রটি প্রাথমিক ইসলামি মডেলের উপর ভিত্তি করে কঠোরভাবে ইসলামি আইন (শরিয়াহ) দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কথা ছিল। তাঁর কৌশলগত উদ্দেশ্য ছিল প্রথমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে, বিশেষ করে পেশোয়ার উপত্যকায়, একটি শক্তিশালী ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, যা ভবিষ্যতে ব্রিটিশদের আক্রমন করতে একটি কৌশলগত ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। ব্রেলভী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া ইসলামের পুনরুজ্জীবন অসম্ভব।

ব্রেলভীর রাষ্ট্র দর্শন, যদিও ধ্রুপদী ইসলামি শাসন এবং জিহাদের ধারণার গভীরে নিহিত, তবুও আধুনিক, সম্প্রদায়-নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিচয়ের প্রাথমিক উপাদান ধারণ করে। এটি কেবল একটি সার্বজনীন খিলাফত পুনরুদ্ধারের বিষয় ছিল না, বরং এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয় ছিল যেখানে মুসলমানরা, একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে, একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (ভারত) এর মধ্যে ইসলামি আইনের অধীনে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারবে।

শরিয়াহ আইনের প্রয়োগ ও সংস্কার: উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তাঁর ঘাঁটি স্থাপনের পর, ব্রেলভী শরিয়াহ আইন বাস্তবায়নে সচেষ্ট হন। তিনি স্থানীয় পশতুন ও হাজারেওয়াল উপজাতিদের তাদের ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি ত্যাগ করে শরিয়াহ গ্রহণ করার আহ্বান জানান । পেশোয়ার বিজয়ের পর, তিনি বিদ'আত হিসেবে বিবেচিত বেশ কয়েকটি উপজাতীয় রীতিনীতি বাতিলের ঘোষণা দেন। যেমন, কনের জন্য নিয়মিত মূল্য পরিশোধ, বিধবাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া, চারটির বেশি বিবাহ করা, নারীদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং গোত্রীয় যুদ্ধকে জিহাদ হিসেবে বিবেচনা করে এর লুণ্ঠিত সম্পদকে বৈধ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে গণ্য করা ইত্যাদি।
তিনি শরিয়াহ প্রয়োগের জন্য নীতিও বাস্তবায়ন করেন, যেমন, যোগ্য তরুণীদের দ্রুত বিবাহ সম্পন্ন করা, যারা সালাত আদায় করত না তাদের বেত্রাঘাত করা।

ব্রেলভীর শরিয়াহ প্রয়োগে দীর্ঘস্থায়ী উপজাতীয় রীতিনীতি বিলোপ এবং নতুন নিয়ম (যেমন বিবাহ, নামাজ সংক্রান্ত) বাস্তবায়ন অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা 'বিপরীত ফল' দেয় এবং উপজাতিদের রীতিনীতি দুর্বল করার অভিযোগের জন্ম দেয়। এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য বিরোধিতা দেখা দেয় এবং এমনকি তাঁর সৈন্যদের হত্যা করা হয়। এটি একটি আদর্শিক ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় বড় ধাক্কা এবং প্রায়শই পুনরাবৃত্তিমূলক চ্যালেঞ্জকে তুলে ধরে।

আমিরুল মোমেনীন ও ইমামত ধারণা: সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর অনুসারীরা তাঁকে আমিরুল মুমেনীন (মুমিনদের সেনাপতি) হিসেবে জানতেন। ১৮২৭ সালের ১১ জানুয়ারি, তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ নেওয়ার পর, তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে খলিফা ও ইমাম ঘোষণা করেন। এই দাবি কেবল প্রতীকী ছিল না; তিনি বিশ্বাস করতেন যে কুফর (অবিশ্বাস) এবং ফাসাদ (দুর্নীতি) নির্মূল করার জন্য এটি অপরিহার্য।

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, তাঁর উদ্দেশ্য বস্তুগত লাভ ছিল না, বরং কুফফার (অবিশ্বাসীদের) বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করা। তাঁর প্রশাসনে, ঐতিহ্যবাহী খানদের (উপজাতীয় প্রধান) পরিবর্তে ঐতিহ্যবাহী উলামা (ইসলামি পণ্ডিত) নিয়োগ করা হয়, যা ধর্মীয়ভাবে পরিচালিত শাসন কাঠামোর দিকে একটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

কিছু পশতুন সর্দার বিশ্বাস করতেন যে "মৌলভিরা একটি রাষ্ট্র শাসন করার জন্য অনুপযুক্ত"। এটি ব্রেলভীর একটি ঐশ্বরিকভাবে অনুপ্রাণিত, কেন্দ্রীভূত ধর্মীয়-রাজনৈতিক নেতৃত্বের আদর্শিক মডেল এবং একটি বিকেন্দ্রীভূত, উপজাতীয় সমাজের শাসনের বাস্তবতার মধ্যে একটি মৌলিক উত্তেজনা প্রকাশ করে। ক্যারিশম্যাটিক কর্তৃত্ব একটি নিবেদিত অনুসারী দলকে কার্যকরভাবে একত্রিত করতে পারলেও, এটি প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় অভিজাতদের (উপজাতীয় খান এবং ঐতিহ্যবাহী উলামা যারা তাঁর প্রত্যক্ষ অনুসারী ছিলেন না) মধ্যে সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে সংগ্রাম করে।

জিহাদের দর্শন ও কৌশল : দারুল হারব ধারণা: 'দারুল হারব' ধারণা সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর জিহাদ দর্শনের একটি মৌলিক ভিত্তি ছিল। তিনি ব্রিটিশ ভারতকে 'দারুল হারব' হিসেবে গণ্য করতেন, যার অর্থ অমুসলিম শাসনের অধীনে থাকা একটি অঞ্চল যেখানে মুসলমানরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে পারে না বা যেখানে ইসলামি আইন সর্বোচ্চ নয়। ব্রেলভী এবং তাঁর অনুসারীদের জন্য, যার মধ্যে ফারায়েজি ও তিতুমীরের আন্দোলনের সদস্যরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এই পদবিটির অর্থ ছিল যে জিহাদ কেবল অনুমোদিতই নয়, বরং সকল মুসলমানের জন্য একটি বাধ্যতামূলক কর্তব্য। এই ধর্মতাত্ত্বিক কাঠামো তাঁদের বিদ্যমান ক্ষমতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য চূড়ান্ত ন্যায্যতা প্রদান করে।"

ব্রেলভীর আন্দোলন কর্তৃক ভারতকে 'দারুল হারব' ঘোষণা সরাসরি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে জিহাদ একটি বাধ্যতামূলক ধর্মীয় কর্তব্য। এটি কেবল একটি ধর্মতাত্ত্বিক ঘোষণা ছিল না, বরং একটি গভীরভাবে রাজনৈতিক বিবৃতি ছিল, যা বিদ্যমান অমুসলিম এবং ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহকে বৈধতা দিতে সাহায্য করে। এটি প্রদর্শন করে যে ব্রেলভীর রাষ্ট্র দর্শন কীভাবে জিহাদ কে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক কৌশলে রূপান্তরিত করে। সমসাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশকে 'দারুল হারব' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার মাধ্যমে, তিনি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক পদক্ষেপের জন্য একটি শক্তিশালী বার্তা প্রদান করেন, যা কার্যকরভাবে মুসলিমদের জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর জন্য একত্রিত করে।

শিখ ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম: তাঁর জিহাদ আন্দোলন শুরু করেন, প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশ এবং শিখদের লক্ষ্য করে। তাঁর তাৎক্ষণিক এবং সবচেয়ে সুস্পষ্ট শত্রু ছিল ব্রিটিশ এবং রঞ্জিত সিংয়ের অধীনে সম্প্রসারণশীল শিখ সাম্রাজ্য, যিনি পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে (NWFP) মুসলমানদের প্রতি দমনমূলক নির্যাতনের অভিজান চালান। তরীকায় মোহাম্মাদী আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল শিখদের

অত্যাচার থেকে এবং ইংরেজদের হাত থেকে এই অঞ্চলগুলিকে মুক্ত করা। তবে, ব্রেলভী ব্রিটিশ শাসনকেও ইসলামের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য হুমকি হিসেবে দেখতেন, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এটিকে প্রতিরোধ করে সমগ্র ভারতে মুসলিম ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করার ইচ্ছা পোষণ করতেন।

তিনি রঞ্জিত সিংকে একটি বিখ্যাত চরমপত্র পাঠান, যেখানে ইসলাম গ্রহণ, জিজিয়া (জনগণের উপর কর) পরিশোধ দাবি জানানো হয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁর চরিত্র এবং ব্যাপক বিদ্রোহ অনুপ্রাণিত করার সম্ভাবনার কারণে ওয়াহাবি আন্দোলনকে একটি গুরুতর রাজনৈতিক হুমকি হিসেবে ক্রমবর্ধমানভাবে দেখতে শুরু করে। ব্রেলভী প্রাথমিকভাবে শিখদের বিরুদ্ধে তাঁর সামরিক প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করেন, যখন একই সাথে কিছু মুসলিম নবাব "ব্রিটিশদের সম্মতি" নিয়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। এটি ব্রেলভীর একটি জটিল এবং সূক্ষ্ম কৌশলগত পদ্ধতি প্রকাশ করে, যেখানে তিনি তাৎক্ষণিক, স্পষ্ট হুমকি (শিখ নিপীড়ন) কে অগ্রাধিকার দেন, যখন ব্রিটিশ শাসনের প্রতি একটি ধারাবাহিক, দীর্ঘমেয়াদী আদর্শিক বিরোধিতা বজায় রাখেন। আর্থিক সহায়তার জন্য 'ব্রিটিশ সম্মতি' একটি জটিল ভূ-রাজনৈতিক খেলাকে নির্দেশ করে যেখানে ব্রিটিশরা প্রাথমিকভাবে ব্রেলভীর আন্দোলনকে শিখ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি সম্ভাব্য কার্যকর প্রক্সি হিসেবে দেখেছিল, সম্ভবত তাঁর রাষ্ট্র দর্শনে অন্তর্নিহিত বৃহত্তর, আরও ব্যাপক উপনিবেশ-বিরোধী এজেন্ডাকে অবমূল্যায়ন বা ভুল গণনা করে।

সামরিক সংগঠন ও কৌশল: তাঁর রাষ্ট্র দর্শন বাস্তবায়নের জন্য, মুজাহিদীনদের কুরআন, সহীহ্ হাদীসের শিক্ষা এবং কুস্তি, তীরন্দাজ এবং রণকৌশল, প্রতিযোগিতাসহ শারীরিক ব্যায়াম উভয় ক্ষেত্রেই কঠোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। তারা মনোবল এবং আদর্শিক প্রতিশ্রুতি বাড়ানোর জন্য "রিসালা জিহাদ" এর মতো কিতাব লেখার কাজেও হাত দিয়েছিলেন। একটি উল্লেখযোগ্য প্রাথমিক বিজয়ে, ব্রেলভী এবং ১,৫০০ অনুসারী ১৮২৬ সালের ২১ ডিসেম্বর আকোরা খট্টকের যুদ্ধে ৪,০০০ শিখ সৈন্যের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করেন। তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য, তিনি ঐতিহ্যবাহী খানদের পরিবর্তে উলামাদের নিয়োগ করেন এবং জিহাদের অর্থায়নের জন্য একটি ইসলামিক কর ব্যবস্থা চালু করেন।ব্রেলভীর সেনাবাহিনীতে "জ্ঞানী আলেম এবং মুমিনরা" এর উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল, যাদের কোরআন হাদীসের প্রচার এবং জিহাদ উভয় ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।

সামরিক পরাজয় ও বালাকোটের যুদ্ধঃ ১৮৩১ সালের ৬ মে বালাকোটের জিহাদের ময়দানে হাজিরহন সৈয়দ আহমাদ শহীদ রহ.। ব্রেলভীর মুজাহিদীন বাহিনী, ইতিমধ্যেই দুর্বল এবং অভ্যন্তরীণ বিরোধিতার সম্মুখীন অবস্থায় শের সিং এর নেতৃত্বে শিখ সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়। মুজাহিদীনরা ছিল শারীরিক ভাবে দুর্বল ক্লান্ত তবুও জিহাদের সজ্জায় সজ্জিত হয়েছিল কিন্তু মুজাহিদবাহিনী সংখ্যায় ছিল অনেক কম। এই বিধ্বংসী যুদ্ধে সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী নিজে, শাহ ইসমাইল এবং ইসলামি আন্দোলনের অন্যান্য বিশিষ্ট নেতারা নিহত ও শিরশ্ছেদ হন। তাঁর মৃত্যুর পর আন্দোলন প্রাথমিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেও, পরবর্তীতে তাঁর অনুসারীরা জিহাদ আন্দোলন কে পুনরুজ্জীবিত করেন। তবে, বালাকোটের যুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় এবং তাঁর তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক চিন্তায় অনেক বড় পরিবর্তন নিয়ে আসে।

এই পরাজয় ইঙ্গিত করে যে, অভ্যন্তরীণ বিভেদ এবং বাহ্যিক কৌশলগত চাল উপস্থিত থাকলে, স্থানীয় সমর্থন ছাড়া সামরিক ব্যর্থতা অনিবার্য।

সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর জিহাদ আন্দোলনের প্রধান ঘটনাবলী

বছর	ঘটনা	তাৎপর্য
১৭৮৬	সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর জন্ম।	তাঁর জীবনের সূচনা।
১৮১০	নবাব আমির খানের সেনাবাহিনীতে যোগদান।	সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জন।
১৮২১	হজ্ব তীর্থযাত্রা।	ওয়াহাবি মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর বিশুদ্ধতাবাদী ও জঙ্গি দৃষ্টিভঙ্গির দৃঢ়ীকরণ।
১৮২৩	হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তন; ব্রিটিশ ভারতকে দারুল হারব ঘোষণা।	জিহাদের ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপন।
১৮২৬	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে (হুন্দ ও জাইদা) অপারেশনাল ঘাঁটি স্থাপন; জিহাদ আন্দোলন শুরু।	শিখ ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা।
১৮২৬ (২১ ডিসেম্বর)	আকোরা খট্টকের যুদ্ধ।	শিখদের বিরুদ্ধে মুজাহিদীনদের প্রথম উল্লেখযোগ্য বিজয়।
১৮২৭ (১১ জানুয়ারি)	নিজেকে খলিফা ও ইমাম ঘোষণা; পেশোয়ার অঞ্চলে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।	ধর্মীয়-রাজনৈতিক কর্তৃত্বের দাবি ও শরিয়াহ প্রয়োগের সূচনা।
১৮২৭ (মার্চ)	শাইদু যুদ্ধ।	শিখদের বিরুদ্ধে মুজাহিদীনদের প্রথম বড় পরাজয়।
১৮৩০ (নভেম্বর)	অভ্যন্তরীণ বিরোধিতার কারণে পেশোয়ার থেকে পিছু হটা।	স্থানীয় উপজাতিদের অসন্তোষ ও বিশ্বাসঘাতকতার ফল।
১৮৩১ (৬ মে)	বালাকোটের যুদ্ধ (সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী ও শাহ ইসমাইলের শাহাদাত; আন্দোলনের একটি বড় সামরিক বিপর্যয়)	উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনের সূতিকাগার।
১৮৬৩	আম্বেলার যুদ্ধ।	ব্রেলভীর অনুসারীদের দ্বারা ওয়াহাবি আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়, ব্রিটিশদের ব্যাপক ক্ষতি।

সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর রাষ্ট্র দর্শনের উত্তরাধিকার ও প্রভাব: সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর রাষ্ট্র দর্শন, যদিও তাঁর জীবদ্দশায় সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি, তবে ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামি চিন্তাধারা ও আন্দোলনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

পরবর্তী ইসলামি পুনরুজ্জীবনবাদী ও জিহাদি আন্দোলন: এডওয়ার্ড মর্টিমারসহ বিভিন্ন আধুনিক গবেষক

মনে করেন যে, সৈয়দ আহমদ বেরলভী তাঁর জিহাদি কর্মকাণ্ড এবং কঠোর শরিয়াহ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে প্রচেষ্টা চালান, তা পরবর্তীকালের ইসলামপন্থী আন্দোলনের প্রাথমিক রূপরেখা নির্ধারণ করে দেয়। অলিভিয়া রয় তাঁকে প্রথম আধুনিক ইসলামি নেতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যিনি ধর্মীয়, সামরিক ও রাজনৈতিক উপাদানসমূহকে একত্রিত করে একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তিনি কেবল জনসাধারণকেই নয়, বরং শাসকদের প্রতিও জিহাদের আহ্বান জানান।

তাঁর আন্দোলন ছিল একাধারে সামাজিক সংস্কারমুখী এবং সামরিক কৌশলে জনপ্রিয় সংহতির উপর নির্ভরশীল, যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও শিখ শাসকদের মতো অমুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সৈয়দ আহমদ তাঁর প্রতিষ্ঠিত আমিরাতকে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় বিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন এবং মুসলমানদের জিহাদে উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ গ্রন্থ রচনা করেন।

তাঁর শাহাদাত ইসলামি দৃষ্টিতে এক উচ্চ মর্যাদার প্রতীক (শহীদ) হিসেবে বিবেচিত হয় এবং তা পরবর্তীকালে বহু ইসলামি আদর্শবাদী ও জিহাদি কর্মীর প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে। তাঁর আহ্বান ছিল ইসলামের মূলনীতি ও পবিত্রতার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং পশ্চিমা ও শিয়া প্রভাব মুক্ত একটি বিশুদ্ধ ইসলামি সংস্কৃতি গঠনের, যা আফগানিস্তানের তালেবানসহ মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার বহু আহলেহাদীস এবং হানাফি সংগঠনের আদর্শিক ভিত্তি হয়ে ওঠে।আল-কায়দা তাদের মতাদর্শে সৈয়দ আহমদের জিহাদি আন্দোলনের স্পষ্ট প্রভাব বহন করে, যা পূর্ব আফগানিস্তান ও খাইবার পাখতুনখোয়া অঞ্চলে পরিচালিত হয়েছিল।

উপসংহার

সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর রাষ্ট্র দর্শন উনিশ শতকের ভারতীয় উপমহাদেশের এবং বিপ্লবী রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করে। তাঁর দর্শন ছিল একটি বিশুদ্ধতাবাদী ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার উপর কেন্দ্রীভূত, যা শরিয়াহ আইন দ্বারা পরিচালিত হবে এবং শিখ ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে অর্জিত হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাওহীদের বিশুদ্ধিকরণ, বিদআত ও শিরকের বিরোধিতা, এবং সুফিবাদের সংস্কারের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মুসলিম সমাজের নৈতিক ও ধর্মীয় অবক্ষয় তাদের রাজনৈতিক দুর্বলতার মূল কারণ, এবং একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই অবক্ষয় দূর করা সম্ভব।

তাঁর রাষ্ট্র দর্শনের বাস্তবায়নে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে একটি ঘাঁটি স্থাপন করেন এবং নিজেকে খলিফা ও ইমাম ঘোষণা করে শরিয়াহ আইন প্রয়োগের চেষ্টা করেন। তাঁর সংগঠন ছিল জনপ্রিয় এবং আদর্শিকভাবে অনুপ্রাণিত, যা জিহাদের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। তবে, তাঁর কঠোর শরিয়াহ প্রয়োগ এবং উশর করের মতো অর্থনৈতিক নীতিগুলি স্থানীয় উপজাতীয় রীতিনীতি এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় তীব্র অভ্যন্তরীণ বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। রঞ্জিত সিংয়ের কৌশলগত চাল এবং মুসলিম নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর আন্দোলনকে আরও দুর্বল করে তোলে, যা শেষ পর্যন্ত বালাকোটের যুদ্ধে তাঁর শাহাদাত এবং আন্দোলনের পরাজয়ের কারণ হয়।

ব্যর্থতা সত্ত্বেও, সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর রাষ্ট্র দর্শন একটি গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী উত্তরাধিকার রেখে গেছে। তাঁকে আহলেহাদীস, আহল-ই-হাদিছ,মোহাম্মদী এবং দেওবন্দি আন্দোলনের মতো পরবর্তী ইসলামি সংস্কারবাদী আন্দোলনগুলির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাঁর জিহাদের ধারণা এবং কঠোর শরিয়াহ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আধুনিক ইসলামপন্থী এবং জিহাদি আন্দোলনগুলির জন্য একটি

গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে, যা দক্ষিণ এশিয়া এবং এর বাইরেও বিভিন্ন সংগঠনের মতাদর্শকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর আন্দোলন, যদিও স্বল্পস্থায়ী ছিল, তবে উপমহাদেশে ভবিষ্যৎ ইসলামি রাজনৈতিক ও সংস্কারবাদী আন্দোলনগুলির জন্য আদর্শিক ও ব্যবহারিক ভিত্তি স্থাপন করেছিল। তাঁর রাষ্ট্র দর্শন তাই কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, বরং একটি চলমান আলোচনার বিষয় যা ধর্ম, রাজনীতি এবং সামাজিক পরিবর্তনের জটিল সম্পর্ককে তুলে ধরে।

যেসকল বই এর সাহায্য নেয়া হয়েছে;

1. Syed Ahmed Barelvi's beliefs-Romela Zaynab
2. উপমহাদেশে ওহাবী মতবাদ প্রতিষ্ঠায় সৈয়্যদ আহমদ বেরলভী-মাওলানা এম. এ. মান্নান
3. Barelvi Movement-Muslim Socio Religious Reform Movement-Modern India History Notes
4. THE INDIAN SUBCONTINENT - A Brief History of the World Since 1500
5. Indian Subcontinent, 1750-1947 - UCL Discovery
6. Syed Ahmed QuesAns 1 | PDF | Jihad | Punjab
7. বৃটিশ শাসনামলে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তন, ১৮৫৮
8. Why Did Syed Ahmad Wish To Revive Islam in The Sub-Continent?
9. Wahabi Movement, Year, History, Objectives, UPSC Notes
10. The Wahhabi Movement in India - 1st Edition - Qeyamuddin Ahmad
11. The forgotten future: Sir Syed and the birth of Muslim nationalism in South Asia - Dawn
12. Compare and contrast the achievements in movements for the reform of Shah Waliullah and Syed Ahmad Barelvi?
13. What was the role of Syed Ahmed Brailvi in the revival of Islam in the subcontinent?
14. An Analysis Of The Effects And Implications Of Syed Aḥmad Shahīd's Movement Of Jihād: A Continuous Struggle In Its Different

আব্দুল্লাহ মাহমুদ আযহারী
এমফিল গবেষক
আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়

আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় : জ্ঞানের প্রাচীনতম বাতিঘর

পূর্বকথা: প্রাচীন সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র মিশরের রাজধানী কায়রোতে, জান্নাতি নদী নীলনদের অদূরে, হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য লালন করে দাঁড়িয়ে আছে এক ঐতিহাসিক প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়। মিশরিদের ভাষায়, কাবাতুল ইলম বা জ্ঞানের ক্বাবা'। ফাতেমী শাসকদের হাতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।পরবর্তীতে ফাতেমিদের পতন ঘটে, কিন্তু আল-আযহার সগৌরবে আজ অবধি টিকে রয়েছে।এরপর আসে আইউবি শাসন। তাদেরও পতন হয়েছে কিন্ত আল-আযহার আজও টিকে রয়েছে। এরপর আসে উসমানীদের শাসন। তাদেরও পতন হয়েছে কিন্ত আল-আযহার আজও সমুজ্জ্বলে দণ্ডায়মান। মাঝে কিছু দিন ফ্রান্সের নেপোলিয়ন,তারপর ব্রিটিশরা এবং সর্বশেষ ব্রিটিশ-ফ্রান্স যৌথভাবে মিসরের ওপর প্রভুত্ব চালায়।তাদেরও পতন হয়েছে, আল-আযহার টিকে রয়েছে। আল-হামদুলিল্লাহ। বিখ্যাত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শোনেননি,এমন লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু এর ইতিহাস-ঐতিহ্য-রাজনীতি ও বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে হয়তো অনেকেরই জানা নেই। আমি বিষয়ে সংক্ষেপে তবে তথ্যবহুল চমকপ্রদ কিছু কথা তুলে ধরার প্রয়াস পাবো। বি-ইযনিল্লাহি তা'য়ালা।

আল-আযহারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস: প্রাচীন আল-আজহারের গোড়াপত্তন: ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয় খিলাফতের কাছ থেকে ফাতেমি শাসক আল-মুইজ-লি-দ্বীন মিশর জয় করে নেন। এরপরই মিশরকে ফাতেমি সালতানাতের রাজধানী করা হয়। ফাতেমি রাজধানী হওয়ার পর পরই মিশরকে ঢেলে সাজানো হয়। নতুন রাজধানী নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয় ফাতেমি সেনানায়ক জাওহর সিসিলিকে। তিনি আব্বাসীয় আমলের মিশরকে সংস্কার করে গড়ে তোলেন ফাতেমি প্রশাসনিক কার্যালয়, নির্মাণ করেন নান্দনিক অট্টালিকা ও বিভিন্ন স্থাপত্য। শহরের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় আল-কাহিরাহ বা কায়রো।

শাসক আল-মুইজ লিদিনাল্লাহ ৯৭০ সালে আল আযহার মাসজিদ নির্মাণকাজ শুরু করেন। ৯৭২ সালে এর নির্মাণ সম্পন্ন হয়। প্রথমে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় আল-আজহার মসজিদ নামে পরিচিত ছিল। এটি কায়রোর প্রথম মসজিদ। দৃষ্টিনন্দন আল আজহার মসজিদে এক সাথে ২০ হাজার মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারে।

মাসজিদ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠা: ৯৯৮ সালের পর আল-আজহারকে তাই নতুন করে সাজানো হয়। ইসমাইল-ই শিয়া মতবাদের পাশাপাশি যোগ হয় আরবি সাহিত্য, আরবি ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি বিষয়সমূহ। নির্দিষ্ট করে শিক্ষাব্যবস্থার নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রক্রিয়ার যা যা থাকা প্রয়োজন মোটামুটি তার সবই যুক্ত করা হয়। খলিফা মুইজ-লি-দ্বীনের প্রতিষ্ঠিত আল-আজহারের ছোট খানকা রূপান্তরিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। এভাবে মসজিদটি ধীরে ধীরে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠে।

ফাতেমি শাসকগণ মূলত বাগদাদের সুন্নি মতাদর্শী শাসকের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক বিজয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্ত ক্রুসেড বিজেতা সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবির হামলার মধ্য দিয়ে মিশরে শিয়া ফাতেমীয় শাসনের পতন ঘটলে আল আযহার শিক্ষা কেন্দ্র তথা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু সুন্নী মতাদর্শ কেন্দ্রিক পড়াশোনাই গুরুত্ব পেতে থাকে। সেই থেকে আজ পযন্ত আল আজহার আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতাদর্শের অনুসারী।

বিশ্ব জ্ঞানের কেন্দ্র: অন্যদিকে মুসলীম বিশ্বের পূর্বাঞ্চলে মোংগলীয়দের হামলা এবং স্পেনে মুসলমানদের শক্তি হ্রাস পাবার ফলে ঐসব এলাকা থেকে শিক্ষানুরাগীরা আবারও আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে থাকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়টি নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়। মোঙ্গলদের উত্থানের সাথে আল-আজহারের পরিবর্তনের সম্পর্ক কোথায়? সম্পর্ক আছে। কারণ মোঙ্গল বাহিনী তখন পুরো মধ্য-পৃথিবী ধ্বংস করে দিলেও মিশরে পৌঁছাতে পারেনি। ফলে বাগদাদভিত্তিক মুসলিমদের যে শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল, তারা সকলেই মিশরে আশ্রয় গ্রহণ করে। আসলে আশ্রয় নয় ঠিক, বাগদাদসহ মোঙ্গল রোষানলে বেঁচে যাওয়া অধিকাংশ মানুষই মিশরে স্থানান্তরিত হয়।

এতে করে তৎকালের অধিকাংশ জ্ঞানী ব্যক্তি ও বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সমন্বয়ে মিশর যেমন বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে, তেমনই আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ও পৌঁছে যায় এক অনন্য উচ্চতায়। সেই সাথে সুন্নি মুসলিমদের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্রের খেতাবটাও জুটে যায় তখন থেকেই। তৎকালের বিখ্যাত মুসলিম আলেমরা আজহারে শিক্ষকতা করেছেন। সেখান থেকে পড়াশোনা শেষ করে মুসলিম বিশ্বে বিখ্যাত হয়েছেন এমন আলেমদের সংখ্যাও অনেক।

আধুনিক আল-আযহার: সূচনাকালে আল আজহারে বিভাগ ছিলো ৫টি। তাহলো,ইসলামি ধর্মতত্ত্ব,ফিকহ বা ইসলামী আইনশাস্ত্র,আরবি ভাষা ও সাহিত্য,ইসলামিক জ্যোতির্বিজ্ঞান,ইসলামিক দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা। ১৯৬১ সালে মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসের আল আজহারের হাজার বছরের অবকাঠামো ও ঐতিহ্য ভেঙ্গে আধুনিক অনেক বিভাগ স্থাপন করলে আধুনিক আল আযহারের যাত্রা শুরু হয়।
সেই সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে ইতিহাস, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, মেডিসিন, চিকিৎসা ও প্রকৌশলের মতো বিষয় সংযোজন করেন। ওই বছরই প্রথমবারের মতো নারীদেরও আল আজহারে পড়ার সুযোগ দেয়া হয়। এরপর গত ৬০ বছরে আল আজহারের আরও বিস্তার ও আধুনিকায়ন ঘটেছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৮১টি অনুষদ। যার ৪০টি মেয়েদের জন্য ও ৪১টি ছেলেদের জন্য। অনুষদগুলোর অধীন ৩৫৯টি বিভাগ রয়েছে। এ ছাড়া ৯টি ইনস্টিটিউটও রয়েছে। রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ৪২টি সেন্টার, ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল ও ২৭টি প্রশাসনিক ইউনিট।

শিক্ষার্থীদের জন্য ১৫ হাজার ১৫৫ শ্রেণিকক্ষ রয়েছে। শিক্ষকের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষক যুক্ত আছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯ হাজারের বেশি কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন এ প্রতিষ্ঠানে।
১২৭ টি দেশ হতে শিক্ষার্থীরা এখানে পড়াশুনা করে। আরবি সাহিত্য ও ইসলামী ধর্মতত্ত্বের প্রাচীন ও প্রধান কেন্দ্র। এটা বিশ্বের প্রাচীনতম ডিগ্রী গ্রান্টিং বিশ্ববিদ্যালয়।

আল-আযহারে বিখ্যাত আলিমগণ: মামলুক সুলতান রকনুদ্দিন বাইবার্সের শাসনামলে বিশ্বের সমসাময়িক প্রখ্যাত মুসলিম পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই আল আজহারে শিক্ষকতা করতেন অথবা কোনো এক সময়ে আল আজহারে স্বল্প সময়ের জন্য এসেছিলেন। মামলুক শাসকদের প্রখর তত্ত্বাবধানে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। মামলুক শাসনামলে আল আজহারে শিক্ষকতা করা বিখ্যাত পন্ডিতদের মধ্যে রয়েছেন,

ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানি ৮৫২হি., ইমাম আস সাখাবী ৯০২ হি., ইমাম বদর উদ্দীন আল-আইনি ৮৫৫হি., ইমাম ইজ্জুদ্দিন ইবনে আব্দুস সালাম ৬৬০হি., ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন ৮০৮হি. (রাহিমাহুমুল্লাহ)।

আল আযহার ও শিয়া: এটা সত্য, সূচনালগ্নে আল-আযহারের প্রতিষ্ঠা-কার্যক্রমের সূচনা শিয়াদের হাতে হয়েছিল। কিন্তু সালাহুদ্দিন আইয়ুবির নেতৃত্বে আল-আযহারের সেই সূচনালগ্নেই শিয়াদের প্রভাব-প্রতিপত্তি পূর্ণরূপেই বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে বাস্তব সত্য হচ্ছে, আল-আযহারের মৌলিক ইতিহাসের সাথে শিয়াদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। আইয়ুবি যুগের পরবর্তী সময়ে শুরু হয় নতুন এক আল-আযহার যাত্রার। যুগে যুগে আল-আযহার থেকে যেসকল বিদগ্ধ আলিমরা তৈরি হয়েছেন, তারা সবাই ছিলেন আহলুস সুন্নাহর প্রকৃত অনুসারী। কাজেই সূচনালগ্নে শিয়াদের সেই সম্পৃক্ততার অভিযোগে আল-আযহারকে কোনোভাবেই শিয়াদের বলয়ভুক্ত বলার সুযোগ নেই।

আল-আযহার সবসময়ই শিয়া ও যে কোনো ভ্রান্ত মতবাদের বিপক্ষে কঠোর-নীতি অবলম্বন করেন। শিয়া মতবাদের বিরুদ্ধে বহু সংখ্যক গ্রন্থ লিখেছেন আযহারি স্কলারগণ। আযহারের ফতোয়া বোর্ড শিয়াদের বিরুদ্ধে কড়া ফতোয়া দিয়েছে। কোনো শিক্ষার্থীর যদি শিয়া অথবা ভিন্ন কোনো ভ্রান্ত মতবাদের সাথে যেকোনো ধরনের সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হয় তাৎক্ষণিক তাকে আল-আযহার থেকে বহিষ্কার করা হয়।
সুতরাং আল-আযহারে শিয়া মাযহাব পড়ানো হয়, শিয়া শিক্ষক-ছাত্র রয়েছে ইত্যাদি যা বলা হয়ে থাকে তা সবই মিথ্যা।

আল আযহার ও সালাফিগণ: আল আযহার ও সালাফি চিন্তাধারার মাঝে আকিদা ও মানহাজগত বৈপরীত্য রয়েছে। কিছু বিরোধ সত্তেও অন্যান্য বহু বিষয়ে আযহারের সাথে সালাফি মতাদর্শের সামঞ্জস্যতা রয়েছে। আযহার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আশয়ারী আকিদাহ লালন করে ও শিক্ষা দেয়। তথাপি গোড়াপত্তন থেকেই আযহারে সালাফি স্কলারগণ ছিলেন যা আজ অবধি বিদ্যমান। গত এক হাজার বছরে যুগে যুগে বহু বিখ্যাত সালাফি আলিম আযহারে পড়াশুনা এবং শিক্ষকতা করেছেন। শত শত আলমদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক আলিমদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল:

শাইখ মাহমূদ খাত্তাব আস-সুবকী (১২৭৪-১৩৫২ হি.)
শাইখ আহমাদ বিন মুস্তাফা আল-মারাগী (১৩৭১ হি.)
মুহাদ্দিস শাইখ আল্লামা আহমাদ শাকির (১৩০৯-১৩৭৭ হি.)
শাইখ ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ দাররায (১৩১২-১৩৭৭ হি.)
শাইখ মুস্তাফা আস-সিবায়ী (১৩৩৩-১৩৮৪ হি.)
শাইখ ফুয়াদ বিন আব্দুল বাকী (১২৯৯-১৩৮৮ হি.)
শাইখ আল্লামা ড. মুহাম্মাদ খলীল হাররাস (১৩৩৪-১৩৯৫ হি.)
শাইখ মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহাবী (১৩৩৩-১৩৯৮ হি.)
শাইখ আব্দুর রাযযাক আফীফি (১৩২৩-১৪১৫ হি.)
শাইখ মুহাম্মাদ খালিদ ছাবিত (১৩৩৮-১৪১৬ হি.)
শাইখ মুহাম্মাদ আল-গাজালী (১৩৩৫-১৪১৬ হি.)
শাইখ সায়্যিদ সাবিক (১৩৩৩-১৪২০ হি.)
শাইখ আতিয়্যাহ সালিম (১৩৪৬-১৪২০ হি.)
শাইখ মান্না' আল-ক্বাত্তান (১৩৪৫-১৪২০ হি.)
শাইখ সলীহ বিন আব্দুল আযীয আলু মানসুর (১৩৫৫-১৪২৯ হি.)

শাইখ মুহাম্মাদ সুলাইমান আল-আশকার (১৩৪৮-১৪৩০ হি.)
শাইখ উমার সুলাইমান আল-আশকার (১৩৫৬-১৪৩১ হি.)
শাইখ মুস্তাফা আযমী (১৩৫০-১৪৩৯ হি.)
শাইখ ড. মুক্তাদা হাসান আযহারী (১৯৫১-২০০৯ খ্রি.)
শাইখ জিয়াউর রহমান আযামী (১৯৪৩-২০২০ খ্রি.)
ড. ফ আব্দুর রহিম (১৯৩৩-২০২৩ খ্রি.) সহ আরও বহু আলিম

এছাড়া সৌদি আরব সহ অন্যান্য আরব দেশের ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান সমূহে আল-আযহার বহু সংখ্যক আলিমদের শিক্ষিক হিসেবে প্রেরণ করে ইলমি খাতে বিরাট অবদান রেখেছে। এবং বর্তামানেও তা চলমান।
হাজার বছর ধরে জ্ঞান বিজ্ঞানের বহু শাখা ও বিশ্ব মুসলিমদের ইলমি খেদমাতের উপহার স্বরূপ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় সর্বোচ্চ চার বার মুসলিমবিশ্বের নোবেল খ্যাত কিং ফাইসাল অ্যাওয়ার্ড লাভ করে।

শেষকথাঃ ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক-বাহক আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বে জ্ঞানের আলো জ্বেলে সারা বিশ্বব্যাপী বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের একটা প্রতীক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃত। পাশাপাশি প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই বিশ্ববিদ্যালয় অসংখ্য ইসলামি স্কলার, ধর্মতাত্ত্বিক এবং চিন্তাবিদ তৈরি করেছে, যেই স্কলারেরা ইসলামী চিন্তাধারার বিকাশে সারা দুনিয়াজুড়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। নবী ইউসুফ ও মুসা আ.-এর স্মৃতিবিজড়িত তীর্থভূমি এবং একসময়ের ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও দ্বীনি ঐতিহ্যের সূতিকাগার বহু সাহাবি ও মনীষীর পদধূলিতে ধন্য এই শহরে স্থাপিত আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় আজও অধুনা বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইলমের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র।

তথ্যসূত্র :

১. *আল আযহার ফি আলফি আম, ড মুহাম্মদ আব্দুল মুনয়িম।*
২. *প্রকাশক: মাকতাবাতুল কুল্লিয়াত আল আযহারিয়াহ, ১৯৮৭।*
৩. *আল জামি আল আযহার আশ শারীফ, মুহাম্মদ সাইয়েদ হামদি।*
৪. *আল আযহারঃ জামিয়ান ওয়া জামিয়াতান, আব্দুল আজিজ মুহাম্মদ।*
৫. *আল হাদিস ওয়াল মুহাদ্দিসুন ফিল আযহার, উসামা মাহমুদ আযহারি।*
৬. *মাজাল্লাতুল আযহার।*
৭. *সওতুল আযহার।*
8. *The Legacy and History of Al-Azhar University - Sh. Ahmed Saad al-Azhari.*
9. *HISTORY OF AL-AZHAR.*
10. *www.azhar.eg*

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

জেলা দায়িত্বশীলদের নাম ও তথ্য–২০২৫ ঈসায়ী

ক্র: নং-	জেলা/শি: প্র:	সভাপতি/আহবায়ক	মোবাইল	সেক্রেটারী/যুগ্ম আহবায়ক	মোবাইল
১	ঠাকুরগাঁও	মো: মাসউদ রেজা	০১৭৭৯-৮৮১৫৫৭	মো: জুয়েল রানা	০১৭২৮-৯৬৫৩২৩
২	দিনাজপুর	এনামুল হক মাদানী	০১৭৫৫-৪৮৫৬১৫	মো: বুরহান উদ্দীন	০১৭৩৪-৮৮৩৪৫৩
৩	জয়পুরহাট	আব্দুল ওয়াহাব	০১৮২৯-০২০৪৮২	হাফেয আব্দুল কাইয়ুম	০১৭২৪-৩২৬০৮৬
৪	পঞ্চগড়	মো: তানযীমুল বারী	০১৬৮২-৩৩৮৫৬২	মো: মহসিন আলী	০১৭৫০-৫৮০৭৩৯
৫	জামালপুর	মো: রফিকুল ইসলাম	০১৭২৭-৮৭৩০৫৪	মো: সফিউল্লাহ	০১৭৯০-২৭০৬৯৩
৬	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	মো: আব্দুল মালেক	০১৭২৭-৭৪৭৪৬২	মো: আবু রায়হান	০১৭৪৫-৭০৬১১৮
৭	রাজশাহী	আব্দুল মোমিন	০১৭৬৩-০০০৯৮৯	শহিদুল্লাহ আল ফারুক	০১৭৪৪-৯৬১১৮১
৮	নওগাঁ পশ্চিম	মো: হাফিজুর রহমান	০১৭২২৩৭৪৮৫১	মো: আব্দুল বাকী	০১৭৩৩-২৮৪৭৭৪
৯	নওগাঁ পূর্ব	মো: লুৎফর রহমান	০১৭৬৮-৯১৫৩৯৮	মো: আবু বকর সিদ্দিক	০১৭৬৭-২৪৯৮৯৬
১০	নাটোর	আব্দুল মোতাকাব্বির	০১৭১৫-৩৭৮৪৩৪	হাফেয ইউনুস	০১৭৬৪-২৭৭২৯৩
১১	টাঙ্গাইল	মো: রায়হান কবির	০১৯২০-৬০৯৬৮৫	ড আব্দুল্লাহ আল মানসুর	০১৭১০-৬৮৯৬৬৩
১২	রংপুর	আব্দুর রহমান	০১৭২৩-৬১৬০৭৬	মুহা: এমদাদুল হক	০১৩০৭-৩২৩০৯৬
১৩	নীলফামারী	মো: আসাদ বিন সিরাজ	০১৭১৭-৭৩৯৫৫৩	আব্দুর রউফ	০১৭১৯-২৮১৮২৮
১৪	গাইবান্ধা	মুহা:মতিউর রহমান	০১৭৩৫-৯৬৩৮৩১	মো: মিজানুর রহমান	০১৭১০-০৮০৩৪৭
১৫	কুড়িগ্রাম	সানোয়ার হোসেন	০১৭২০-৯৮৪১৫২	আব্দুর রহমান	০১৯৩১-৮১৭১৮২
১৬	ময়মনসিংহ	হাফেয শফিকুল হাসান	০১৭৪১-৬৪৮০৭৯	দিদারুল ইসলাম	০১৮৮৪-০৩৪০০১
১৭	পাবনা	মুহা: ইমরান হোসেন	০১৭৩৮-৭৯০৭৯২	আল আমিন	০১৭৮৮-২৭৭৪০০
১৮	সিরাজগঞ্জ	মুহা: রুহুল আমীন	০১৭৪৪-৮২৮৫২০	মুহা: বাকিবিল্লাহ	০১৭৬৩-৭৫২৫৯৩
১৯	বগুড়া	মো. নাজির আহমাদ	০১৭২৫-২৬৯৭৬৩	মো: ইমরান হোসেন	০১৫৭১-১৮৫৭২০
২০	মেহেরপুর	মুহা. আব্দুস সালাম	০১৯৭৯-৯৩৭৪৯৪	মুহা. জাহিদ হাসান	০১৭১৭-০০৮৩৩৫
২১	ঝিনাইদহ	মুহা. সাবিত বিন রশিদ	০১৮৫১-০৯৬২০৪	আলি হাসান মুজাহিদ	০১৭৭৫-৫৭৫৪৪২
২২	সাতক্ষীরা	মো: শরীফ হুসাইন মাদানী	০১৭১৮-২৯৯৪৪৯	মো: ইমরান গাজী	০১৩১৬-৩৩৫৭৮৪
২৩	খুলনা	মুহা. তাজিবুল ইসলাম	০১৬৫০-১৬১০৭৩	মুহা: মাসউদুর রহমান	০১৯৪০-৫২৯৯৩

স্মরণিকা ১১তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৫

ক্র: নং-	জেলা/শি: প্র:	সভাপতি/আহবায়ক	মোবাইল	সেক্রেটারী/যুগ্ম আহবায়ক	মোবাইল
২৪	যশোর	মুহা: শাইখুল ইসলাম	০১৭৩১-৫৪৬১৪৮	মুহা. আব্দুল আহাদ	০১৭২৩-৬৭০০৪৬
২৫	বাগেরহাট	মুহা:শফিকুল ইসলাম	০১৯২৩-৯৭০৪০২	মুহা: রায়হান উদ্দীন	০১৯৯৩-৬৮৯৫৯০
২৬	কুষ্টিয়া ই: বি:	ইয়াসিন আলী	০১৮৯২-৩১৯৯৬৪	সুলাইমান চৌধুরী	০১৭৪২-৪৪৯৫২৪
২৭	কুষ্টিয়া	শেখ ওবাইদুল্লাহ সালাফী	০১৯০২-৭৭৭২৪৫	মো: আব্দুর রহমান	০১৫৯৫-৬৮২৬০২
২৮	নরসিংদী	তরিকুল ইসলাম মাদানী	০১৮৩৪-৪৯৮৮০০	মুহা: আব্দুল ওয়াদুদ গাজী	০১৯৮৬-৭৮৫৮৪৯
২৯	ঢাকা	মুহা: আফজাল হোসেন	০১৭১৮-৯৫৫৯৮৪	মো: সেলিম	০১৯৬২-৮৬৯১৯০
৩০	নারায়ণগঞ্জ ম.	মোঃ আবু তাহের মাদানী	০১৯৯৪-০৩৪৯৯৬	মো: জাহিদ হাসান ইমরান	০১৭৯৮-১৩৯২১২
৩১	নারায়ণগঞ্জ	আব্দুর রহমান মাদানী	০১৯২৫-০৬২০৫০	মো: রমজান মিয়া	০১৭৪২-৯৩৭০৪১
৩২	কুমিল্লা	হাফেয আব্দুস সবুর	০১৮১৯-৫০৭৮৫৪	সাখাওয়াত উল্লাহ	০১৭৪৯-৮৬৪৬৪৫
৩৩	ঢাকা মহানগর দক্ষিণ	আল আমিন মাদানী	০ ১৭৪১-৫৭৬৬৬৫	মুহাম্মদ রবিউল্লাহ	০১৮২৯-১৬৮৮৬৭
৩৪	ঢাকা মহানগর উত্তর	আব্দুল্লাহ বিন এরশাদ	০১৭৫৯-৭৫৪২৬৫	জাকির হোসেন	০১৭১৯-৩৬৭৩৫৭
৩৫	এম.এম আরাবীয়া	আব্দুল মোমিন	০১৭৭৩-৯৭৬৫১০		
৩৬	মাদরাসাদা:সু:	ইমাম হাসান মাদানী	০১৯২০-০৭৪৮০৪	আব্দুল্লাহ সাকিব	০১৮২৯-৬১৪১৭৩
৩৭	মাদরাসাতুল হা:	মুহা: রুহুল আমীন	০১৯৪৯-৫৬৩৭৩৫	কাউসার মাহমুদ	০১৮৭৫-৪৭৮৬০৯
৩৮	দোলেশ্বর মাদ:	ফরিদ সরকার	০১৮৮১-৯৬৩৩১৮	হাবিবুর রহমান	০১৭৮৭-৫৫৭২০০
৩৯	গাজীপুর জেলা	আমির হোসেন হেলালী	০১৭১৮-৪৭৩০৩০	খন্দকার আব্দুল বাতেন	০১৭১৮-৫২২৩৩৬
৪০	গাজীপুর মহানগর	মুহা: জামাল উদ্দিন	০১৯২৮-৪৮৬০৩২	আব্দুর রউফ	০১৭৪১-৩৭১৭৬৫
৪১	সিলেট	মুহা: গোলাম কিরিয়া	০১৭৪৭-০২৮৬০৫	সুলতান মাহমুদ	০১৭৩১-৫৬৫৭৫৭
৪২	শেরপুর	মুহা: হাসান জোবায়ের	০১৫৩৮-০২৩৩৩৮	মো: জিয়াউল হক	০১৭৮৯-১৭৮৯৯২
৪৩	কিশোরগঞ্জ	মো: আবুল হাশেম	০১৯১৫-১৪২৬২৫	মুহা: শামিম আহমেদ	০১৯৪৪-৯২৯০৬০
৪৪	বরিশাল	মো: আব্দুল গফুর	০১৭১১-৯৯৪০০১	মো: জহিরুল ইসালম খান	০১৬১০-১১৩৩২৬
৪৫	গোপালগঞ্জ	মো: ইবরাহীম শেখ	০১৭৮৭-১৮৭৭৯৩	মোখলেসুর রহমান	০১৭০৫-৩০৪৩৩০
৪৬	লালমনিরহাট	মুহা: হাসান আলী	০১৭৭৩-৬৫০৫৮২	আশরাফুল ইসলাম	০১৭২৫- ৬২১৯১৮
৪৭	নেত্রকোনা	মুহা: আকরাম	০১৯৩২-৭৭৩১৫২	ফকরুল ইসলাম	০১৭২৮-৫১৩০০৮
৪৮	ঢাকা বিশ্ব:বি	কামরুল হাসান	০১৮৯০-৩২৮৯৭৯	আহসান সাব্বির	০১৭৭৭-০১৩৪৫৭
৪৯	মাদারীপুর	মুহা: আব্দুর রহমান	০১৯১২- ০৪৫৫৪৬	মোঃ খালেদ হাসান	০১৯৪০-৮২৮৪৭২

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

মজলিসে আমের ১০ম সেশনের বিদায়ী তালিকা (২০২৩-২০২৫)

ক্রঃ নং-	নাম	স্থায়ী জেলা	মোবাইল নং
০১	জনাব মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক	রংপুর	০১৭১৪-৮৮১৩৬৯
০২	জনাব রায়হান উদ্দীন মাদানী	চুয়াডাঙ্গা	০১৯১৭-৯৬৪৩৭৮
০৩	জনাব মো: আকবর আলী	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	০১৭২৮-১৬১৭৮২
০৪	জনাব আব্দুল মতিন	দিনাজপুর	০১৯১৪-৫১৫৫০০
০৫	জনাব ইবরাহীম খলীল	ময়মনসিংহ	০১৭৮৭-৮৪৯৯৮৮
০৬	জনাব মো: আতিক চৌধরী	কুমিল্লা	০১৭৬২-২১১৪০৮
০৭	জনাব মো: ইসমাইল হোসেন	রাজশাহী	০১৭১৫-৪০৮৮৫৪
০৮	জনাব মামুন উর রশীদ	ঠাকুরগাঁও	০১৭১৩-৭৯১৪৯৩
০৯	জনাব মো: মাসউদুর রহমান	জামালপুর	০১৯২৪-৮৮২৭২৫
১০	জনাব জাহিদ হাসান মাদানী	বগুড়া	০১৯৪৭-১১২১০৭
১১	জনাব আনিসুর রহমান মাদানী	বগুড়া	০১৭৬৫-৮২২৯৮১
১২	জনাব রবিউল ইসলাম	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	০১৭২৩-৩০৬৮৮০
১৩	জনাব আব্দুল্লাহ মাসউদ মাদানী	ঠাকুরগাঁও	০১৭২০-৮৪৮১৮৮
১৪	জনাব রায়হান কবীর	টাঙ্গাইল	০১৯২০-৬০৯৬৮৫
১৫	জনাব ড. আহমাদুল্লাহ	রাজশাহী	০১৭২৩-২৮৬৩৬২
১৬	জনাব ড.মো: হাবিবুল্লাহ	নীলফামারী	০১৭৩৫-৯৫৯০৫৮
১৭	জনাব শাইখুল ইসলাম	যশোর	০১৭৩১-৫৪৬১৪৮
১৮	জনাব নাযীর আহমাদ সরকার	বগুড়া	০১৭২৫-২৬৯৭৬৩
১৯	জনাব ইমদাদুল হক	রংপুর	০১৩০৭-৩২৩০৯৬
২০	জনাব মুজিবুর রহমান	নারায়ণগঞ্জ	০১৯১৮-৫২০৩৭৫
২১	জনাব মো: নুরুল ইসলাম	নওগাঁ	০১৭৩৪-১৪০২৯৭
২২	জনাব আমীনুল ইসলাম	সিরাজগঞ্জ	০১৭২২-৭৯১৭৭৭
২৩	জনাব তৌহিদুজ্জামান	সাতক্ষীরা	০১৭৩৫-৪৯৪১৫০
২৪	জনাব মো: আতিকুর রহমান	নীলফামারী	০১৭২৪-৫০২৯৬৭
২৫	জনাব রবিউল ইসলাম রানা	বগুড়া	০১৭৩৮-১৯১৭৬২
২৬	জনাব ড. আব্দুল্লাহ আল মনছুর	টাঙ্গাইল	০১৭১০-৬৮৯৬৬৩
২৭	জনাব মেসবাহুল হক	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	০১৭৩৮-৬৭৭৯৮৭
২৮	জনাব হুমায়ন কবির মাদানী	নারায়ণগঞ্জ	০১৮৮৯-১৪১০৪০

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

সাংগঠনিক প্রতিবেদন

১০ম সেশন (আগস্ট ২০২৩-জুলাই ২০২৫)

ভূমিকা: জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর ১০ম সেশনের মজলিসে কারার তথা কার্যনির্বাহী পরিষদ গত ২৯ জুলাই ২০২৩ খ্রি. তারিখে গঠিত হয়। ১০ আগস্ট ২০২৩ খ্রি. তারিখে জমঈয়ত ভবনে শুব্বানের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিগত কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছ থেকে ২০২৩-২০২৫ সেশনের নির্বাচিত ১০ম মজলিসে কারার আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। অতঃপর দেশব্যাপী শুব্বানের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য পাঁচদফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আগস্ট ২০২৩ থেকে জুলাই ২০২৫ সেশনের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ-

১ম দফা কর্মসূচি: ইসলাহুল আক্বীদাহ বা আক্বীদাহ সংশোধন

ইসলাহুল আক্বীদাহ বিষয়ে দেশবরেণ্য ইসলামিক স্কলারদের মাধ্যমে শুব্বানের সালেহ পর্যায়ের কর্মীদের নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন, ৩য় স্তরের কর্মীদের নিয়ে সালেক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন, বিভিন্ন জেলায় জেলাভিত্তিক আরেফ কর্মশালা আয়োজন, দেশের বিভিন্ন স্থানে জুমুআর খুতবার জন্য দাঈ টিম প্রেরণ, সাপ্তাহিক ও মাসিক দাওয়াতী প্রোগ্রামগুলোতে আক্বীদাবিষয়ক আলোচনা, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আক্বীদাহবিষয়ক প্রচারণাসহ নানামুখী কর্মসূচি ইসলাহুল আক্বীদাহ বা আকীদাহ সংশোধন কর্মসূচিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এ ছাড়া শুব্বান রিসার্চ সেন্টার থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত 'আক্বীদাহ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল', 'আক্বীদাহবিষয়ক ১০০ প্রশোত্তর' সহ বিভিন্ন বই ও দাওয়াতী লিফলেট বিভিন্ন মহলে আক্বীদাহ বিশুদ্ধকরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

২য় দফা কর্মসূচি: আদ দা'ওয়াহ ওয়াত তাবলীগ বা আহ্বান ও প্রচার

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ বিগত ছয় বছর থেকে মাহে রমাযানে সারা দেশের বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে কুরআন শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। ১৪৪৫ হি./ ২০২৪ খ্রি. রমাযানে ৩৩ টি জেলায় ৫৫২ টি কেন্দ্রে সরাসরি কুরআন শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। এতে ১০,০০০ (প্রায়) শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে কুরআন শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। ১৪৪৬ হি./ ২০২৫ খ্রি. রমাযানে ২৬ টি জেলায় ৩৭০ টি কেন্দ্রে সরাসরি কুরআন শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। এখানেও সাত হাজার সাধারণ মানুষ কুরআন শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। উল্লেখ্য, এই কর্মসূচিতে বই ও সিলেবাস কেন্দ্রীয় শুব্বানের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের প্রদান করা হয় এবং কেন্দ্র ও জেলা শুব্বানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষকদেরকে সক্ষমতা অনুযায়ী সম্মানীও প্রদান করা হয়।

১. মাসিক আলোচনা সভা

জনসাধারণের মাঝে দ্বীন ইসলামের সঠিক শিক্ষা প্রচারের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে জমঈয়ত ভবনে আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী রাহিমাহুল্লাহ মিলনায়তনে মাসিক আলোচনা সভা ও প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়। জমঈয়ত ও শুব্বানে আহলে হাদীসের দায়িত্বশীলবৃন্দ এতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। এই সেশনে এ পর্যন্ত মোট ১০টি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বংশাল ও সুরিটোলায় ঢাকা দক্ষিণ জমঈয়তের সাপ্তাহিক প্রোগ্রামে কেন্দ্রীয় শুব্বানের ৫ জন দায়িত্বশীল আলোচনা পেশ করেন।

এছাড়াও মোট ১৫ টি সাপ্তাহিক ও তা'লীমী বৈঠক আয়োজনে কেন্দ্রীয় শুব্বান অংশগ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে। নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ, যশোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জামালপুর, রাজশাহী, দোলেশ্বর, কুমিল্লা, বগুড়াসহ কয়েকটি জেলায় মজলিসে আম ও কারার সদস্যদগণ এতে অংশগ্রহণ করেন।

২. অনলাইন আলোচনা

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথা ফেসবুক লাইভের মাধ্যমেও কেন্দ্রীয় শুব্বানের উদ্যোগে ধারাবাহিক আলোচনা প্রচারিত হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ৫০ টি অনলাইন আলোচনা প্রচারিত হয়। এতে দেশ বিদেশের অনেক বিজ্ঞ ও তরুণ আলোচক বিষয়ভিত্তিক আলোচনা পেশ করেন, যা পরবর্তীকালে অনলাইন আলোচনার চুম্বকাংশ শুব্বানের ইউটিউব চ্যানেল Shubban Dawah তে আপলোড করা হয়।

৩. কেন্দ্রীয় ইফতার মাহফিল

কেন্দ্রের উদ্যোগে মোট ২ টি ইফতার মাহফিল যথাক্রমে ১৪৪৫ হি./২০২৪ খ্রি. ও ১৪৪৬ হি./২০২৫ খ্রি. রমাযানে জমঈয়ত ভবনে কেন্দ্রীয় ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে জমঈয়ত ও শুব্বানের কর্মীরা ছাড়াও সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করেন। ইফতারের পূর্বে জমঈয়ত ও শুব্বানের ওলামায়ে কেরাম সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। জমঈয়ত, তা'লীমী বোর্ড ও জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ডের আয়োজিত ইফতার মাহফিলে ক্বারার সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন জেলা আয়োজিত ইফতার মাহফিলে কারার সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন।

৪. দাওয়াতী সফর/জুমুআর খুতবা

দাওয়াতী সফরের উদ্দেশ্যে ঢাকার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন আহলে হাদীস অঞ্চলে এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলায় কেন্দ্রীয় শুব্বানের উদ্যোগে দাওয়াতী সফরের আয়োজন করা হয়। বিশেষভাবে, জুমুআর খুতবা প্রদানের জন্য এই সেশনে ১৮টি টিম প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন জেলায়ও এই কর্মসূচি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়। এছাড়া ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, টাঙ্গাইল, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, যশোর, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, সিলেট, ও কুমিল্লায় দাওয়াতী সফর করা হয়।

৫. সেমিনার আয়োজন

অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে আমাদের করণীয় শীর্ষক সেমিনার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর.সি মজুমদার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, দেশের তরুণ স্কলার, শুব্বানের সাবেক ও বর্তমান দায়িত্বশীলবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৬. শুব্বান রিসার্চ সেন্টারের কার্যক্রমের উন্নয়ন

গবেষণাভিত্তিক বইপত্র প্রকাশ ও প্রচারের জন্য কেন্দ্রীয় শুব্বান রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে। ২০ অক্টোবর ২০২৩ খ্রি. তারিখে মজলিসে ক্বারারের মাধ্যমে কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এতে শুব্বানের সাবেক সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানীকে পরিচালক করে ৯ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ও ড. এম. এ. বারী রাহিমাহুল্লাহর লিখিত বইসমূহ প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। ২০২৩-২০২৫ সেশন পর্যন্ত প্রকাশনা ও দাওয়াতি

কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

প্রকাশিত ও বিতরণকৃত গ্রন্থসমূহ

১. উমাইয়া শাসনামল (অনূদিত) ৫০০ কপি (পুনঃপ্রকাশ), ২. আকীদাবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল- ৮,০০০ কপি (পুনঃপ্রকাশ), ৩. শিয়াদের অজানা ইতিহাস - ১,০০০ কপি, ৪. সচিত্র ওযু ও সালাত শিক্ষা - ৯,৫০০ কপি, ৫. বিদআত চেনার মূলনীতি ও উপায়- ৫,০০০ কপি, ৬. সিয়ামবিষয়ক কিছু জ্ঞাতব্য (লিফলেট) - ১৯,০০০ কপি, ৭. আকীদাহ ও তাওহীদ সম্পর্কে ১০০ প্রশ্নোত্তর - ৫,০০০ কপি।

প্রকাশিতব্য গ্রন্থসমূহ

আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ.) রচিত:

১. তিন তালাক প্রসঙ্গ ২. আল-ইসলাম বনাম কমিউনিজম ৩. তারাবীহ নামায: জামাআত ও রাকাআত ৪. আহলে হাদীস আন্দোলন ও উহার বৈশিষ্ট্য;

৫. ধর্ম, বিজ্ঞান ও প্রগতি - ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী;

৬. আল কুরআনের জীবন ঘনিষ্ট ৫০ টি মূলনীতি (অনুবাদ);

৬. হেদায়েত পাওয়ার উপায়;

৭. তাফসীরে জালালাইনের ভুলভ্রান্তি নিরসনে দুই চাঁদের আলোকবর্তিকা (অনুবাদ);

এছাড়া আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের বাণী সম্বলিত প্রায় ২০০টি অনলাইন পোস্টার ফেসবুকে ধারাবাহিকভাবে প্রচার ও শেয়ার করা হয়েছে- যা বিশুদ্ধ দ্বীনী বার্তা পৌঁছাতে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

৭. শেকড়ের কমিটি পুনর্গঠন

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রি. তারিখে মজলিসে কারারের সভায় শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ (শেসাস) এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। এতে শুব্বানের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক জনাব তানযীল আহমাদকে নির্বাহী পরিচালক করে ১৬ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

৮. বার্ষিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ

দাওয়াহ ও তাবলীগ বা আহ্বান ও প্রচারের অংশ হিসেবে ২০২৪ ও ২০২৫ সালে কেন্দ্রীয় শুব্বান মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ছবিসহ বার্ষিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করে সারাদেশে বিতরণ করে।

৯. রমাযানের তুহফা প্রকাশ

দাওয়াহ ও তাবলীগ বা আহ্বান ও প্রচারের অংশ হিসেবে ১৪৪৫ ও ১৪৪৬ হি. কেন্দ্রীয় শুব্বান রমাযানের আহ্বান, তুহফা ও লিফলেট প্রকাশ করে এবং তা সারাদেশে বিতরণ করে।

১০. জেলা দাওয়াহ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ

দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, দোলেশ্বর ইসলামিয়া মাদরাসা, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ মিরপুর, মাদরাসাতুল হাদীস নাজিরবাজার, মাদরাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ পাঁচরুখী ও আলহাজ্জ মো: ইফসুফ মেমোরিয়াল মাদরাসার ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শিক্ষা সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ যোগদান করেন। বংশাল মসজিদে আয়োজিত আশুরার আলোচনায় কারারের কয়েকজন দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন।

১১. খতমে বুখারী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যোগদান

এম. এম. আরাবীয়া, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ মিরপুর, মাদরাসাতুল হাদীস, দোলেশ্বর মাদরাসা ও দারুল হাদীস সালাফিয়া মাদরাসার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতি মহোদয়সহ কয়েকজন দায়িত্বশীল আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন। বিদায়ী ছাত্রদেরকে শুব্বানের পক্ষ থেকে মোট ৫০,২০০/- টাকার উপহার তুলে দেয়া হয়।

১২.অনলাইনে কর্মী সংগ্রহ

বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগ। শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে সর্বসাধারণের সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয়তা বেশি। এ বিষয়টি মাথায় রেখে অনলাইনে গুগল ফর্ম-এর মাধ্যমে শুব্বান কর্মী সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালানো হয় । যা ব্যাপক সাড়া ফেলে। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সালাফী মানহাজের শুভানুধ্যায়ীরা অনলাইনে গুগল ফর্ম পূরণ করে শুব্বানের কর্মী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন।

৩য় দফা কর্মসূচি: আত তানযীম বা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

১. বৈঠক/সভা:

১.১. মজলিসে কারারের বৈঠক

বিগত আগস্ট ২০২৩ খ্রি. থেকে জুলাই ২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত মোট ১২ টি পূর্ণাঙ্গ কারার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১.২. জরুরি বৈঠক

বিভিন্ন সময় তড়িৎ সিদ্ধান্তের জন্য জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রয়োজনে এ পর্যন্ত প্রায় ১টির অধিক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরমধ্যে বেশকিছু বৈঠক অনলাইন জুম প্লাটফরমে অনুষ্ঠিত হয়।

১.৩ মজলিসে আমের বৈঠক

বিগত আগস্ট ২০২৩ খ্রি. থেকে জুলাই ২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত ৩ টি মাজলিসে আমের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

২. জেলা কাউন্সিল/কমিটি গঠন

দেশের সাংগঠনিক জেলাগুলোর মধ্যে মোট ৩৩ টি জেলায় শুব্বানের জেলা কমিটি নবায়ন করা হয়। জেলাগুলো- মেহেরপুর, ঠাকুরগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, নওগাঁ পূর্ব, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, জামালপুর, রংপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, যশোর, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ মহানগর, কুমিল্লা, কুষ্টিয়া,ঢাকা মহানগর উত্তর, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মাদরাসাতুল হাদীস নাজিরবাজার, গাজীপুর, সিলেট, কিশোরগঞ্জ, বরিশাল, নরসিংদী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ।
এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়াস শাখা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আহ্বায়ক কমিটি গঠন এবং আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় শাখা গঠন করা হয়।

৩. সাংগঠনিক সফর

সারাদেশের বিভিন্ন জেলায় কমিটি গঠন ও নবায়ন, আরেফ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ এবং জেলা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে ৬৫ টিরও বেশি সাংগঠনিক সফর করা হয়। মজলিসে কারারের সদস্যগণ এসব সফরে অংশ নেন। মজলিসে আমের কিছু সদস্য এবং শুব্বানের সাবেক নিবেদিত ভাইয়েরাও এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন।

৪. কর্মী সম্মেলন

১৭ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি. কেন্দ্রীয় শুব্বানের উদ্যোগে কাকরাইলস্থ আইডিইবি ভবনে বিপুল আয়োজনে কর্মী

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে জমঈয়ত ও শুব্বানের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন জেলা থেকে নির্বাচিত সহস্রাধিক কর্মী এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। এতে গেস্ট অব অনার হিসেবে ভার্চুয়ালি অংশ নেন ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ শামছুল আলম। এছাড়া সারা দেশের বিভিন্ন জেলায় কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে কেন্দ্রীয় কারারের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত হন।

৫. শিক্ষাসফর

সাংগঠনিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এবং কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে ও তাদের মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শুব্বান কর্তৃক ২৯ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ ২০২৪ খ্রি. তারিখে সাজেক ভ্যালি ও রাঙ্গামাটি এবং ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি. তারিখে বান্দরবান ও কক্সবাজারে শিক্ষাসফর করা হয়। এতে কেন্দ্রীয় মজলিসে কারারের বিভিন্ন দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন।

৬. জমঈয়তের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ

কেন্দ্রীয় শুব্বান তাদের অভিভাবক সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের বিভিন্ন কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে মসজিদ উদ্বোধন, জানাযায় অংশগ্রহণ, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, ওয়ায মাহফিলে অংশগ্রহণ, সাংগঠনিক বিভিন্ন প্রোগ্রাম, কর্মশালা ও সুধীজনের সাথে সাক্ষাৎ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ে শুব্বান সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক নিয়মিত উপস্থিত থাকেন।

৭. মতবিনিময় সভা

সালেহ, সালেক, জোন প্রধান, জেলা দায়িত্বশীলদের নিয়ে এবং ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও টাঙ্গাইল জেলায় সকল স্তরের কর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভা (অনলাইন ও অফলাইন) অনুষ্ঠিত হয়। এবং অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে আমাদের করণীয় বিষয়ে সকল আহলে হাদীস ছাত্র ও যুবসংগঠনের দায়িত্বশীলদের নিয়ে হোটেল বেঙ্গল ক্যানারি পার্ক রেস্টুরেন্ট, গুলশান-১, ঢাকায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সকল আহলে হাদীস ছাত্র ও যুবসংগঠনের দায়িত্বশীল এবং তরুণ স্কলারগণ উপস্থিত হন।

৮. গঠনতন্ত্র সংশোধন

সাংগঠনিক কাজে গতিশীলতা আনয়নের জন্য গঠতন্ত্রের কিছু ধারা-উপধারায় সংশোধনী জরুরি হয়ে পড়ে এবং নতুন কিছু বিষয় সংযোজন করা সময়োপযোগী বিবেচিত হয়। মজলিসে আমের তিন চতুর্থাংশ সদস্যের ঐকমত্যের ভিত্তিতে জমঈয়তের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ে অনুমোদনের মাধ্যমে যুগোপযোগী গঠনতন্ত্র প্রকাশ করা হয়।

৯. রাগেব ও আরেফ সিলেবাস সহায়িকা পুস্তক প্রকাশ

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর কর্মীগণ যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনে বিশ্বাস করে। এজন্য সংগঠনের রাগেব ও আরেফ মানের কর্মীদের জ্ঞানগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে নির্ধারিত সিলেবাসের কুরআন, হাদীস, আকীদাহ, সীরাত ও অন্যান্য বিষয়ের সমন্বয়ে রাগেব ও আরেফ সিলেবাস সহায়িকা পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হয়। এটি কর্মীদের মানোন্নয়নে কার্যকর ও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ইন শা আল্লাহ।

১০. মাসিক জেলা দায়িত্বশীল রিপোর্টিং সভা আয়োজন

শুব্বানের ১০ম সেশনে জেলার কার্যক্রমের মনিটরিং ও কেন্দ্রীয় নির্দেশনাসমূহ তদারকির জন্য প্রতিমাসের নির্দিষ্ট তারিখে জেলার সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য দায়িত্বশীলদের নিয়ে নিয়মিত অনলাইন মিটিং

অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ জুন ২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত জেলা দায়িত্বশীল কর্মশালায় প্রতি তিন মাস পর পর সরাসরি বৈঠক অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বাকি দুইমাস অনলাইনে মিটিং অব্যাহত রাখবে।

৪র্থ দফা কর্মসূচি: আত-তাদরীব ওয়াত-তারবিয়াহ বা শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ

১. সালেহ কর্মশালা

শুব্বানের সর্বোচ্চ স্তর সালেহদের নিয়ে ৩ টি কর্মশালা যথাক্রমে ১৬ নভেম্বর ২০২৩, ২১ মার্চ ২০২৪ ও ১৭ মার্চ ২০২৫ খ্রি. তারিখে আয়োজন করা হয়। এরমধ্যে ১টি কর্মশালা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২. সালেক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা

শুব্বানের ৩য় স্তরের কর্মী সালেকদের নিয়ে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মোট ৪টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালাসমূহ যথাক্রমে, ২ ও ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১৫ ও ১৬ মে ২০২৫ এবং ১৭ জুলাই ২০২৫ খ্রি. তারিখে জমঈয়ত ভবনের আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী রহ, মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে, ১৩০ জন, ১১০ জন, ৯০ জন ও ৭০ জন। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত ও শুব্বানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, শুব্বানের সাবেক দায়িত্বশীল এবং বিশিষ্ট প্রশিক্ষকবৃন্দ।

৩. জেলা দায়িত্বশীল কর্মশালা

শুব্বানের ৪৩টি জেলার দায়িত্বশীলদের নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে ২টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালাসমূহ যথাক্রমে, ২৩ মে ২০২৪ এবং ২৬ জুন ২০২৫ খ্রি. তারিখে জমঈয়ত ভবনের আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী রহ, মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১২০ জন ও ৮০ জন। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত ও শুব্বানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, শুব্বানের সাবেক দায়িত্বশীল এবং বিশিষ্ট প্রশিক্ষকবৃন্দ।

৪. আরেফ কর্মশালা

মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর সাংগঠনিক জেলায় ৩টি, ঠাকুরগাঁওয়ে ২টি, বগুড়ায় ১টি, টাঙ্গাইলে ১টি, নীলফামারীতে ১টি, পঞ্চগড়ে ১টি, দিনাজপুরে ২টি, কুমিল্লায় ১টি, নারায়ণগঞ্জে ২টি, সিলেটে ১টিসহ মোট ১৫টি আরেফ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

৫. মানোন্নয়ন (সালেহ)

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ, সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা পর্যালোচনা ও সার্বিক পর্যবেক্ষণ শেষে মানোন্নয়ন বোর্ডের সুপারিশক্রমে এই সেশনে মোট ১৬ জনকে সালেহ মানে উন্নীত করা হয়। সালেহদের শপথবাক্য পাঠ করান জমঈয়তের শুব্বানবিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-মাদানী।

৬. অনলাইন বইপাঠ প্রতিযোগিতা

কেন্দ্রীয়ভাবে মোট ২ দফায় বইপাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় শুব্বানের উদ্যোগে

রমাযান ১৪৪৫হি/২০২৪ অনলাইন বইপাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ৩০ মার্চ পরীক্ষার মাধ্যমে ১ম, ২য়, ৩য়সহ মোট আটটি ক্যাটাগরিতে ৫০জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। ১৭ মে ২০২৪ শুক্রবার মাসিক আলোচনা সভায় অনলাইন বইপাঠ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ১ম পুরস্কার নগদ ১৫,০০০/- (পনেরো হাজার টাকা) ও তিন হাজার টাকার সমমূল্যের ইসলামিক বই, ২য় পুরস্কার নগদ ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা) ও দুই হাজার টাকার সমমূল্যের ইসলামিক বই, ৩য় পুরস্কার নগদ ৭,০০০/- (সাত হাজার টাকা) ও দুই হাজার টাকার সমমূল্যের ইসলামিক বই, ৪র্থ পুরস্কার নগদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) ও এক হাজার টাকার সমমূল্যের ইসলামিক বই, ৫ম পুরস্কার নগদ ৩,০০০/- (তিন হাজার টাকা) ও এক হাজার টাকার সমমূল্যের ইসলামিক বই। এবং ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম বিজয়ীকে নগদ ১,০০০/- (এক হাজার টাকা) ও এক হাজার টাকার সমমূল্যের ইসলামিক বই এবং বিশেষ পুরস্কার পরবর্তী ১১ থেকে ২০ পর্যন্ত আটশত টাকা সমমূল্যের ইসলামিক বই, ২১ থেকে ৫০পর্যন্ত পাঁচশত টাকা সমমূল্যের ইসলামিক বই প্রদান করা হয়।
কেন্দ্রীয় শুব্বানের উদ্যোগে ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে অনলাইন ও সরাসরি বইপাঠ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার মাধ্যমে ১ম, ২য়, ৩য়সহ মোট সাতটি ক্যাটাগরিতে ২৫ জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। ১ম পুরস্কার নগদ ১২,০০০/- (বারো হাজার টাকা) ও দুই হাজার টাকা সমমূল্যের ইসলামিক বই, ২য় পুরস্কার নগদ ৯,০০০/- (নয় হাজার টাকা) ও এক হাজার টাকা সমমূল্যের ইসলামিক বই, ৩য় পুরস্কার নগদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) ও এক হাজার টাকা সমমূল্যের ইসলামিক বই, ৪র্থ পুরস্কার নগদ ৩,০০০/- (তিন হাজার টাকা) ও এক হাজার টাকা সমমূল্যের ইসলামিক বই, ৫ম পুরস্কার নগদ ২,০০০/- (দুই হাজার টাকা) ও এক হাজার টাকা সমমূল্যের ইসলামিক বই। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম বিজয়ীকে নগদ ১,০০০/- (এক হাজার টাকা) ও পাঁচশত টাকা সমমূল্যের ইসলামিক বই এবং বিশেষ পুরস্কার পরবর্তী ১১ থেকে ২৫ পর্যন্ত পাঁচশত টাকা সমমূল্যের ইসলামিক বই প্রদান করা হয়।

৫ম দফা কর্মসূচি: ইসলাহুল মুজতামা বা সমাজ সংস্কার

১. ট্রাফিক সহায়তা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি

৫ আগস্ট পরবর্তী বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলার অবনতি হলে শুব্বান কর্মী ও দায়িত্বশীলগণ ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলার ব্যস্ততম শহরে ট্রাফিক শৃঙ্খলা সহায়তার কাজে অংশগ্রহণ করেন এবং শহরের রাস্তা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পালন করেন।

২. রমাযান ফুড প্যাকেজ বিতরণ

দরিদ্র অসহায়দের মাঝে মোট ২ দফায় ফুড প্যাকেজ বিতরণ করা হয়। ১৪৪৫ হি./২০২৪ খ্রি. রমাযানে সারা দেশের ১৩টি জেলায় গরীব দুঃস্থদের মাঝে ৪৫০,০০০/- (চারলক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র) টাকার রমাযান ফুড প্যাকেজ বিতরণ করা হয়। এর পর ১৪৪৬ হি./২০২৫ রমাযানে সারা দেশের ১৩টি জেলায় গরীব দুঃস্থদের মাঝে ২,২৫,০০০/- (দুইলক্ষ পঁচিশ হাজার মাত্র) টাকার রমাযান ফুড প্যাকেজ বিতরণ করা হয়। ১০ম সেশনে এই খাতে মোট ৬,৭৫,০০০/ – (ছয়লক্ষ পঁচাত্তুর হাজার মাত্র) টাকার রমাযান ফুড প্যাকেজ বিতরণ করা হয়। বিতরণ কাজে ছাত্র/সমাজ কল্যাণ ও দফতর সম্পাদক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। অর্থব্যবস্থাপনায় শুব্বানের সাবেক সভাপতি ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৩. ইয়াতীম ও বিধবা প্রকল্পে সহায়তা

মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতিমখানা, ঘর নির্মাণ, অসহায় ও দরিদ্র প্রকল্পের অধীনে মোট ২৫১,১০০/- (দুইলক্ষ একান্ন হাজার একশত টাকা মাত্র) সহায়তা প্রদান করা হয়।

৪. শিক্ষা বৃত্তি প্রদান

শুব্বান একটি ছাত্র ও যুব সংগঠন। শুব্বান সবসময় ছাত্রদের পাশে থাকে। অনেক মেধাবী শুব্বান কর্মী রয়েছে, যারা আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হিমশিম খাচ্ছে পাশাপাশি অনেকের পড়ালেখা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। অসহায় মেধাবী ছাত্রদের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে শুব্বান শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প চালু করে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে দুই লক্ষাধিক টাকার শিক্ষাবৃত্তি দরিদ্র-মেধাধী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে।

৫. শীতবস্ত্র বিতরণ

২০২৩-২০২৪ সালে দেশের মোট ১২টি জেলার অসহায় দুঃস্থদের মাঝে শীত ঋতুতে সর্বমোট ১,৮৩,৬১০/- (একলক্ষ তেরাশি হাজার ছয়শত দশ মাত্র) টাকার শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। ২০২৪-২০২৫ সালে ২য় ধাপে জমঈয়ত ও শুব্বানের যৌথ উদ্যোগে ৪০টি জেলায় মোট ১৬,০০,০০০/- (ষোল লক্ষ মাত্র) টাকার শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। বিতরণ কাজে ছাত্র/ সমাজ কল্যাণ ও দফতর সম্পাদক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

৭. ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার্তদের ত্রাণ বিতরণ

দেশের ৩টি জেলার ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয় এবং কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, লক্ষীপুর জেলায় ভয়াবহ বন্যায় বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বাবদ তিন ধাপে মোট ১২,০০,০০০/- (বারোলক্ষ মাত্র) টাকা বিতরণ করা হয়। বিতরণ কাজে জমঈয়ত ও শুব্বান সমন্বিত ভূমিকা পালন করেন।

৮. এককালীন অনুদান

বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অসুস্থ, দুঃস্থ ও নওমুসলিমকে ১,৮১,২৬০/- (এক লক্ষ একাশি হাজার দুইশত ষাট মাত্র) টাকা এককালীন প্রদান করা হয়। এছাড়াও আরাকানের মুহাজির মুসলিমদের ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার মাত্র) টাকা অনুদান দেয়া হয়।

৯. কুরবানি কর্মসূচি অনুষ্ঠান ও দুঃস্থ-অসহায়দের মাঝে গোশত বিতরণ

১৪৪৫হি./২০২৪ খ্রি. যিলহাজ্ব মাসে কুরবানির পশু ক্রয়ের জন্য গাইবান্ধা ও নীলফামারী জেলায় ২টি ছাগল ক্রয় বাবদ ২০,২০০/- (বিশ হাজার দুইশত মাত্র) টাকার আর্থিক সহযোগিতা করা হয়।
১৪৪৬ হি./২০২৫ খ্রি. যিলহাজ্ব মাসে কুরবানির পশু ক্রয়ের জন্য ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, কুমিল্লা ও রংপুর জেলায় ৫টি ছাগল ক্রয় বাবদ ৪৩,০০০/- (তেতাল্লিশ হাজার মাত্র) টাকার আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচিতে শুব্বানের সমাজকল্যাণ তহবিল থেকে সহযোগিতা ছিল উল্লেখযোগ্য।

১০. আশ-শিফা স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি

শুব্বানের সামাজিক সেবার অংশ হিসেবে কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, লক্ষীপুর জেলায় ভয়াবহ বন্যার সময় আশ-শিফা স্বাস্থ্যসেবার পক্ষ থেকে বন্যা কবলিত এলাকায় চিকিৎসা সেবা ও ওষুধপত্র প্রদান করা হয়। এবং বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের অনুষ্ঠিত মহাসম্মেলনে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধপত্র প্রদান করা হয়।

১১. কর্জে হাসানাহ ফান্ড গঠন

শুব্বানের বর্তমান কর্মী, সাবেক কর্মী ও ঋণগ্রস্থ মানুষের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য কর্জে হাসানাহ প্রকল্প

স্মরণিকা ১১তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৫

চালু করা হয়। প্রাথমিকভাবে মজলিসে কারার ও মজলিসে আম সদস্যদের নিকট হতে ন্যূনতম ৫০০ (পাঁচশত টাকা মাত্র) করে জমা নিয়ে এ ফান্ডের কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে এ ফান্ডে ২৫০,০০০/- টাকা রয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, সাবেক ও বর্তমান শুব্বান কর্মীকে এ ফান্ড হতে কর্জে হাসানা দেওয়া হয়েছে এবং অনেকের আবেদন বিবেচনাধীন রয়েছে। এ ফান্ড গঠন একটি সৃজনশীন উদ্যোগ, যা সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

১২. শুব্বান স্বাবলম্বী প্রজেক্ট

শুব্বানের সাবেক এবং বর্তমান কর্মীদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি সামনে রেখে স্বাবলম্বী প্রজেক্ট এর প্রস্তাবনা গৃহীত হয়, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে শুব্বানে কর্মী ও দরিদ্র সাধারণ মানুষকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ের মূলধন সরবরাহ বা যেকোনো ধরনের লাভজনক আর্থিক প্রকল্পে পরামর্শ ও এককালীন আর্থিক সহায়তা সেবা প্রদান করা। ইতোমধ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে ইন শা আল্লাহ।

১৩. শুব্বান স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্স চালু

দেশের যুব সমাজকে দক্ষ করে কর্মোপযোগী করার জন্য কারিগরী দক্ষতার কোন বিকল্প নেই। বেকার যুবকদের আলোর দিশা দিতে কেন্দ্রীয় শুব্বান প্রাথমিকভাবে **১** মাসব্যাপী ফ্রি মাইক্রোসফট লার্নিং কোর্স চালু করে। এতে ২২০ জন রেজিস্ট্রেশন করলেও প্রথম পর্যায়ে ৬০জন শিক্ষার্থীকে নিয়মিত লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সফলভাবে কোর্স সম্মন্নকারীদেরকে সনদ প্রদান করা হয়।

এই কর্মসূচির আওতায় পরবর্তীতে ভিডিও এডিটিং ও গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

১৪. পানি ও শরবত বিতরণ কর্মসূচি

১ মে ২০২৪ খ্রি. তারিখ থেকে সারাদেশে অতিরিক্ত তাপদাহের কারণে কেন্দ্রীয় শুব্বানের উদ্যোগে ঢাকার যাত্রাবাড়ি, মিরপুর, রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর ও টাঙ্গাইলে পথচারী সাধারণ মানুষের মধ্যে ঠান্ডা পানি ও শরবত বিতরণ কর্মসূচি পালিত হয়।

১০ম সেশনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন

১. ওয়েব সাইট ও শুব্বান অ্যাপস তৈরি

শুব্বানের পূর্বের ওয়েবসাইটি সচল না থাকায় নতুন করে শুব্বানের ওয়েব সাইট তৈরির প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। শুব্বান ওয়েব সাইটের উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। শুব্বান ওয়েবসাইটি পরিপূর্ণভাবে সচল হলে শুব্বানের কাজের বহুমাত্রিকতা বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া **শুব্বানের সকল স্তরের কর্মীদের জন্য একটি শুব্বান অ্যাপস** তৈরীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ওয়েব সাইট তৈরি সমাপ্ত হলে শুব্বান অ্যাপস তৈরী করা হবে ইন শা আল্লাহ।

২. শুব্বানের সাবেক ও বর্তমান দায়িত্বশীলদের অর্থায়নে শুব্বান অফিসের জন্য GREE ব্র্যান্ডের ২টি এসি ক্রয় করা হয়।

৩. অফিসের জন্য ল্যান্ড ফোন স্থাপন করা হয়।

প্রস্তুতকারক	**সহযোগিতায়**
মো: আকবর আলী	হেদায়েতুল্লাহ
সাংগঠনিক সম্পাদক	দফতর সম্পাদক

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর

১১ তম কেন্দ্রীয় সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবনাসমূহঃ

১. প্রথমেই এ সম্মেলন মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট মাইলেস্টোন কলেজে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত মুসলিম শিক্ষার্থীদের মাগফিরাত কামনা করছে এবং তাদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করছে। পাশাপাশি আহতদের জন্য দ্রুত সুস্থতা কামনা করছে এবং তাদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। এছাড়াও দেশে যেকোনো দুর্ঘটনা এড়াতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষকে পূর্ব পরিকল্পনা ও সতর্কতার সাথে কাজ করা এবং জনগণকে সচেতন হবার জোর আহ্বান করছে।

২. বিশ্বখ্যাত নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তবর্তী সরকারের জনবান্ধব কাজগুলোর জন্য যেমন প্রশংসা করছে তেমন নারী সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবসহ রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশীয়মূল্যবোধ ও ইসলাম বিরোধী যেকোনো কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকার জোর দাবি জানাচ্ছে।

৩. ৫ আগস্ট উত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশের সকল রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রচলিত ধারার নোংরা রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে পারস্পারিক ভ্রাতৃত্ববোধ রক্ষা করে দেশ ও জনগণের স্বার্থে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছে।

৪. বর্ষা বিপ্লব উত্তর দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সকল ধর্মীয় দলকে একই প্লাটফর্মে থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছে। এর পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে, মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ রক্ষা করে, বৃহত্তর সংহতি তৈরি করে ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াশ ও যুগোপযোগী তৎপরতা কামনা করছে।

৫. দেশের মুসলিমদের প্রতি যাবতীয় বস্তুবাদী ও রাজনৈতিক মতবাদ এবং দলীয় চিন্তাধারা বর্জন করে কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফে-সালেহীনের বুঝের আলোকে তাদের জীবন পরিচালনার আহবান জানাচ্ছে।

৬. সকল কওমী মাদরাসার দাওরায়ে হাদীসের মানকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির আওতায় এনে সরকারি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পথ উন্মুক্ত করে দেয়ার মাধ্যমে তাদের মেধা ও মননকে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগানোর উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে।

৭. নীতি-নৈতিকতাপূর্ণ সমাজ ও সুনাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে জেনারেল শিক্ষায় প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে জোর দাবি জানাচ্ছে।

৮. সর্বশেষ এ সম্মেলন গাজ্জায় দলখলদার ইসরাইলি বাহিনী যে হিংস্র ও বর্বর গণহত্যা চালাচ্ছে; তার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং দখলদার রেজিম ও গণহত্যায় যুক্ত সেনা সদস্যদের বিচার দাবী করছে। একই সাথে ১৯৬৭ সালের সীমানায় ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

শুব্বান রিসার্চ সেন্টার ও মাকতাবাতুশ শুব্বান
থেকে প্রকাশিত/পুনঃপ্রকাশিত বই

ক্র.নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
১	ঈদে কুরবান	আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী রহ.
২	সিয়ামে রামাযান	আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী রহ.
৩	ইসলামী অর্থনীতির ক খ	আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী রহ.
৪	ঐক্য সংহতি ও জমঈয়ত	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী রহ.
৫	ভারতীয় উপমহাদেশে আহলুল হাদীস-উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম
৬	সংগঠন জমঈয়তে আহলে হাদীস ইসলামী দৃষ্টিকোণ	অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
৭	ফাতাওয়া ও ইজতিহাদ	অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
৮	শুব্বানের পাঁচ দফা আমাদের পথ চলা	তানযীল আহমাদ
৯	মিন্দানাওয়ে স্বায়ত্তশাসন	তানযীল আহমাদ
১০	উমাইয়া শাসনামল	মাহমুদ শাকের
১১	প্রকৃত সালাফি হোন	প্রফেসর ড. আব্দুস সালাম আস-সুহাইনী
১২	প্রচলিত তাবলীগ জামাত	শাইখ হামুদ বিন আব্দুল্লাহ আত-তুয়াইজুরী রহ.
১৩	সফরের আদব	শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
১৪	আল্লাহর সকল সিফাত একই সূত্রে গাথা	শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
১৫	আক্বীদা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল	শুব্বান রিসার্চ টিম
১৬	শিয়াদের অজানা ইতিহাস	শাইখ আব্দুল মালেক আহমাদ মাদানী
১৭	কুরআনের শব্দ দিয়ে এসো কুরআন শিখি	মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী, আব্দুল মতিন
১৮	সচিত্র ওজূ ও সালাত শিক্ষা	শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান মাদানী
১৯	বিদআত চেনার মূলনীতি ও উপায়	শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান মাদানী
২০	আক্বীদা ও তাওহীদ ১০০ প্রশ্নোত্তর	শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ
جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش
JAMIYAT SHUBBANE AHL-AL HADITH BANGLADESH

ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার অফিস চালু

দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বে ও ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ জাতি মানবে না

জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনের অফিস রাজধানী ঢাকায় স্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্ত অন্তর্বর্তী সরকার নিয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয়, রাজনৈতিক সংগঠন, এমনকি বামপন্থী দলগুলোও এর প্রতিবাদ জানিয়েছে। মূলত জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশন বিভিন্ন দেশ এবং আঞ্চলে অফিস স্থাপন করে। স্থানীয় পর্যায়ের অফিসগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরি করে। কৌশলগত সহায়তা দেয়, সচেতনতার জন্য অ্যাডভোকেসি করে এবং মানবাধিকারকে স্থানীয়ভাবে আন্তর্জাতিক মানে নেয়ার চেষ্টাও করে।

স্থানীয়ভাবে লিঙ্গ, আবাসন, ভূমি ব্যবস্থাপনা, বৈষম্য, স্বাস্থ্যসেবা ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়াও জাতিসংঘের এই সংস্থার এজেন্ডার মধ্যে রয়েছে।

কিন্তু বাস্তব চিত্র হলো সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশ্বের ১৪ টি দেশের মধ্যে ফিলিস্তিনেও তাদের অফিস আছে। অথচ শতাব্দীর নিশৃংসতম হত্যাযজ্ঞ সেখানে সংঘঠিত হলেও জাতিসংঘ এবং মানবাধিকার হাইকমিশনের অফিস নির্মম নিরবতা পালন করেছে। উপরন্তু বোদ্ধা মহল তাদের অন্যান্য দেশের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে মনে করেন, এই অফিস তারা এখানে স্থাপন করলে সমকামিতা উৎসাহিত হবে। কাদিয়ানি, সংখ্যালঘু, পাহাড়ি, নানা ইস্যু তৈরি হবে। খ্রিস্টানদের প্রভাব বেড়ে যাবে। আর নারী স্বাধীনতার নামে তারা নারীদের ইসলামের বিধিবিধানের বাইরে নিয়ে যেতে কাজ করবে। এতে আমাদের মূল্যবোধ, দেশীয় সংস্কৃতিসহ আরো অনেক কিছু ক্ষতির মুখে পড়বে।

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এই কাজের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। সরকারের নিকট আবেদন জানায় যে, নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে এমন অফিস যেন কোনোভাবেই চালু না হয়। সেইসাথে দেশপ্রেমিক সকল মুসলিম নাগরিক ও সাধারণভাবে সকল দল মতের সকল স্তরের সচেতন দায়িত্বশীলের নিকটে আশাবাদ ব্যক্ত করে যে, এমন দূরভিসন্ধির বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার হই এবং দেশ ও ইসলাম বিরোধী এই চক্রান্তকে রুখে দেই।

তানযীল আহমাদ
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ
স্থাপিত-১৯৮৯
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪

info.shubbanbd@gmail.com
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪, মোবাইল: ০১৭৬৫ ৮১২২৬১
www.shubbanbd.org

সূচীপত্র ১

SHUBBAN RESEARCH CENTER DHAKA

শুব্বান রিসার্চ সেন্টার

কার্যক্রম

অনুবাদ ◘ গবেষণা ◘ বই প্রকাশ ◘ অনলাইন দাওয়াহ্

সত্যের পানে শেকড়ের সন্ধানে

শেকড়

শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ (শেসাস)

কার্যক্রম

কুরআন তেলাওয়াত ◆ হামদ-নাত ◆ ইসলামী সংগীত ◆ আবৃত্তি ◆ উপস্থাপনা

DARUSSALAM

দারুস সালাম পাবলিকেশন্স

মাকতাবাতুশ শুব্বান

যোগাযোগ: 01877-724200 (লাইব্রেরিয়ান)
01765-812261 (অফিস)

মাকতাবাতুশ শুব্বান maktabatusshubban@gmail.com

জমঈয়তের মুখপত্র সাপ্তাহিক আরাফাত নিয়মিত পড়ুন।

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহবায়ক

مجلة عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা- ১২০৪। ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭

জমঈয়ত প্রকাশিত ঐতিহ্যবাহী মাসিক তর্জুমানুল হাদীস নিয়মিত পড়ুন।

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

The Monthly Tarjumanul Hadeeth, Reg. DA. 142

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা- ১২০৪। ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

সু-খবর! সু-খবর!! সু-খবর!!!

হজ্জ ও ওমরাহ্ বুকিং চলছে-২৩-২৪-২৫-২৬

চলতি ওমরাহ্ প্যাকেজ-এ (১৫দিন)

সাশ্রয়ী মূল্যে : ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা (সম্ভাব্য)
মক্কার হোটেলের দুরত্ব : ৪০০-৫০০ মিটার
মদিনা হোটেলের দুরত্ব : ৩০০-৪০০ মিটার
তিন বেলা বাংলা খাবারের ব্যবস্থা থাকবে।
মক্কা-মদিনার দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারা।
বিমান যাতায়াত (সরাসরি) ঢাকা থেকে জেদ্দা।

চলতি ওমরাহ্ প্যাকেজ-বি (১৫দিন)

সাশ্রয়ী মূল্যে : ১,৩৫,০০০/- (এক লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার টাকা। (সম্ভাব্য)
মক্কার হোটেলের দুরত্ব : ৬০০-৭০০ মিটার
মদিনা হোটেলের দুরত্ব : ৪০০-৫০০ মিটার
তিন বেলা বাংলা খাবারের ব্যবস্থা থাকবে।
মক্কা-মদিনার দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারা।
বিমান যাতায়াত (ট্রানজিট)

বি: দ্র: রমাজান মাসের বিশেষ প্যাকেজ ওমরাসহ ইতেকাফের সু-ব্যবস্থা এছাড়াও মিশরসহ অন্যান্য দেশ ভ্রমণের সুযোগ (আলোচনা সাপেক্ষে)

➤ ২০২৪-২৫-২৬ ইং সালের জন্য ৩০৭৫২ টাকার মাধ্যমে হজ্জের প্রাক নিবন্ধন চলছে।

শাইখ আব্দুল গফুর আল-মাদানী স্বত্বাধিকারী-

আল-মাদানী হজ্জ ট্রাভেলস্ এন্ড ট্যুরস্

মুনাজ্জেম আহনাফ ট্রাভেলস্ এন্ড ট্যুরস-হজ্জ লাইসেন্স-৫৮৬

ও সেক্রেটারী বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস গোদাগাড়ী উপজেলা শাখা, রাজশাহী।

অফিসঃ ডাইংপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদ সংলগ্ন, আলাউদ্দীন মার্কেট (২য় তলা), গোদাগাড়ী পৌরসভা, রাজশাহী।
ঢাকা অফিসঃ বায়তুল খায়ের, লিপ্ট-১১, ৪৮/এ-বি পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
মোবাঃ ০১৭১২-৯৭৪৫৬২, ০১৯৭৭-৯৭৪৫৬২, E-mail: almadanihajj075@gmail.com

সূচীপত্র ১

بسم الله الرحمن الرحيم

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে সাভারে শুরু হলো

মাদরাসাতুল হাসানাহ

MADRASATUL HASANAH

আপনার সোনামণির আদর্শ শিক্ষার নতুন দুয়ার

ভর্তি চলছে

প্লে-৯ম শ্রেণি

মদীনার আরবি, Oxford English ও আলিয়া সিলেবাসে

- আবাসিক
- অনাবাসিক
- ডে-কেয়ার

বালক ও বালিকা
পৃথক ব্যবস্থা

- হিফজ বিভাগ
- ইসলামী শিক্ষা
- জেনারেল শিক্ষা

ক্যাম্পাস-১: ডি-২৮/১, ব্যাংক কলোনী,সাভার, ঢাকা, ক্যাম্পাস-২: ডি-১৬/২, ব্যাংক কলোনী, সাভার, ঢাকা

01894762337, 01973936173, 01901519430

/madrasatulhasanah https://madrasatulhasanah.com

ভর্তি চলছে

সালদহ জামিআ'তুস সুন্নাহ কমপ্লেক্স

স্থাপিত: ২০ ই জুন ২০১৯ ইং

মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে একটি আদর্শ ইসলামিক মাদ্রাসা

ভর্তি চলছে

বিভাগ সমূহঃ

কিতাব বিভাগ, তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত।

- নুরানি, প্লে থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত।
- তাহফিজুল কুরআন বিভাগ।
- কিতাব বিভাগ।
  - নাজেরা
  - হিফজ ও শুনানি।

আবাসিক

প্রতিটি রুম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

অনাবাসিক

সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা

ডে-কেয়ার

কোচিং এর ব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি

নুর মোহাম্মদ তালুকদার হাফিজাহুল্লাহ

যোগাযোগ ও পরামর্শ ঃ

সালদহ (তালুকদার বাড়ি) শোল্লা, ফরিদগঞ্জ উপজেলা, চাঁদপুর জেলা

অফিস: 01300722124, কিতাব বিভাগ: 01891962500, হিফজ বিভাগ 01313666183

সূচীপত্র ১

ভর্তি চলছে

[আলোকিত মানুষ ও প্রকৃত আলেম গড়ার লক্ষ্যে]

উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার বগুড়ায় অবস্থিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত

দি মেসেজ ফাউন্ডেশন (রেজিঃ নং-এস-১৩০৪২/২০১৮) এর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান

সরাসরি শাইখ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম খাঁন মাদানীর এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত

ভর্তি চলছে

مدرسة دار القرآن السلفية ببغورا

দারুল কুরআন সালাফিয়া মাদ্‌রাসা

- আবাসিক
- অনাবাসিক
- ডে-কেয়ার

আসন সংখ্যা সীমিত

সার্বক্ষণিক
সিসি ক্যামেরায় পর্যবেক্ষণ

বিভাগ সমূহঃ

- নূরানী বিভাগ
- নাজেরাহ বিভাগ
- হিফ্‌জ বিভাগ
- দাওর/রিভিশন বিভাগ
- কিতাব বিভাগ

ভর্তির জন্য যোগাযোগ :

অফিস ঃ ০১৭৪০-২৬২৬২৮
পরিচালক ঃ ০১৭৫০-১৬৪২৪৮

নাযীর আহমাদ সরকার
অধ্যক্ষ
দারুল কুরআন সালাফিয়া মাদ্‌রাসা
মোবাইলঃ ০১৭২৫-২৬৯৭৬৩

বেজোড়া, বগুড়া।

উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার বগুড়া শেরপুরে অবস্থিত

ইনসাফ ফাউন্ডেশন এর তত্ত্বাবধানে ও শায়খ সাইফুল ইসলাম খাঁন মাদানী কর্তৃক পরিচালিত

[আলোকিত মানুষ ও প্রকৃত আলেমা গড়ার লক্ষ্যে]

مدرسة دار التوحيد للبنات

দারুত তাওহীদ বালিকা মাদ্‌রাসা

ছাত্রী ভর্তি চলছে

- আবাসিক
- অনাবাসিক
- ডে-কেয়ার

বিভাগ সমূহ ঃ

- নূরানী বিভাগ
- নাজেরাহ বিভাগ
- হিফ্‌জ বিভাগ
- দাওর/রিভিশন বিভাগ
- কিতাব বিভাগ

যোগাযোগ ও পরামর্শ ঃ

নির্বাহী পরিচালক ঃ
bKash নগদ ০১৭৭১-৫৩৭৩২৪
bKash নগদ ০১৭৫০-১৬৪২৪৮

শেরপুর, বগুড়া।

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
সেক্রেটারী জেনারেল, ঢাকা মহানগর জমঈয়তে আহলে হাদীস বাংলাদেশ
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

HAS

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER
ATAB
MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ৭০ নয়াপল্টন (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০, ফোন: ৯৩৩৪২৮০, ৯৩৩৩৫৮৬, মোবা: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫
চাঁপাই নবাবগঞ্জ অফিস: বড় ইন্দারা মোড়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

ATAB MEMBER

Biman Approved

IATA Approved

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক,
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক,
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা,
লাকা ওয়াল মুলক, লা-শারীকা লাক।

হজ্জ ও ওমরাহ্ বুকিং চলিতেছে

প্রাক-নিবন্ধন করতে যা প্রয়োজন:

১। পাসপোর্ট/এন-আইডি (উভয় পাশের স্ক্যান কপি)।
২। পাসপোর্ট সাইজ ছবি (স্ক্যান কপি)।
৩। জন্মনিবন্ধন এর অন-লাইন কপি/পাস্ পোর্ট (নন-রেসিডেন্স বাংলাদেশীদের জন্য)।
৪। জন্মনিবন্ধন/পাসপোর্ট (১৮ বছরের নিচের বয়সীদের ক্ষেত্রে)।
৫। এজেন্সীর ব্যাংক একাউন্ট-এ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা জমা প্রদান করা।
৬। হজ্জযাত্রীর ব্যক্তিগত মোবাইল নাম্বার।

প্রোপ্রাইটরঃ আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন আল-মাদানী
(অনার্স-মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব)

F MAMUN AIR TRAVELS

এফ মামুন এয়ার ট্রাভেলস

বাংলাদেশ ও সৌদি সরকার অনুমোদিত হজ্জ, ওমরাহ ও ট্রাভেলস এজেন্ট - হজ্জ লাইসেন্স নং-১৪৭৫

ঢাকা অফিস: আঃ রাকিব উদ্দিন সরকার মার্কেট (২য় তলা), মৈনারটেক বাজার, উত্তরখান, ঢাকা-১২৩০। মোবাঃ ০১৯১১-৪৩৫৬২৮, ০১৬৪১-৩৮১৪০৬

E-mail: mamunmolla64@gmail.com, Web: fmamunairtravels.com